NIL DIGANTE TAKHAN MAGIC
Travelogue by
Tarapada Roy
Dey's Publishing
13, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700073
Rs. 40·00

মিনতি রায়

প্রকাশক :
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
সুধীর মৈত্র

ISBN-81-7079-338-6

মুদ্রাকর :
নিউ নিরালা প্রেস
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাগ
৪ কৈলাস মুখার্জি লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

দাম : চল্লিশ টাকা
Rupees Forty only

উৎসর্গ

ভিক্টোরিয়া ও ভাস্করকে

এক

নীল দিগন্ত

'...আকাশ চলিয়া গেছে কোথায় আকাশে
অপরাজিতার মত নীল হয়ে—
আরো নীল আরো নীল হয়ে...'

—জীবনানন্দ দাশ

আমার এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভ্রমণ কাহিনীর আরম্ভেই জীবনানন্দকে জড়িয়ে ফেললাম।

কিন্তু কবিতা আর ভ্রমণকাহিনী তো এক নয়।

ভ্রমণকাহিনীতে কল্পনার তেমন কোনও অবকাশ নেই। যা দেখছি বা যা দেখেছি, বড় জোর সামান্য একটু বাঁয়ে ডাইনে স্মৃতিবিস্মৃতির বিশ্বাসযোগ্য খাদ মেশানো যেতে পারে। কিন্তু কবিতা হল কল্পনালতা, অসম্ভবের অলীক বৃক্ষ থেকে আকাশকুসুম ঝরে যাওয়ার বেদনা, যত সে বাস্তবঘেঁষা হবে তার তত ক্ষতি।

এই যে ভ্রমণকাহিনী রচনা করতে গিয়ে কবিতায় এসে গেলাম, তার কিন্তু একটা বড় কারণ আছে। যে ভ্রমণের সূত্রে এই কাহিনী, সেই ভ্রমণ ছিল কবিতার জন্যে, নিতান্তই এক পদ্যকার হিসাবে আরও কারও কারও মতো আমি সেই ভ্রমণের আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম।

সেই আমন্ত্রণপ্রাপ্তির কাহিনী আমার মত চিরগৃহস্থ বঙ্গসন্তানের পক্ষে যথেষ্টই রোমাঞ্চকর কিন্তু তার আগে দুটো হালকা কথা বলি।

সেই গল্পটা তো আমিই লিখেছিলাম। মনে আছে গল্পটা আমার নিজস্ব ছিল না। যেমন অনেক সময়ে হয়েছে, কারও কাছ থেকে শুনে বোধহয় লিখেছিলাম। এবং এই রবিবাসরীয়র পাতাতেই হয়তো লিখেছিলাম।

তা হোক।

গল্পটা হল ভ্রমণলাল নামে এক বিমানযাত্রীর। যে কিনা সেই প্রথম প্লেনে উঠেছে। একদা যুদ্ধের দুর্দিনে, বোধহয় প্রথম ভারত-চীন যুদ্ধের বছর সেটা, উনিশশো একষট্টি-বাষট্টি, যুবক বাঙালি কবি লিখেছিলেন, 'জীবনে প্রথমবার প্লেনে চড়ে সীমান্তের দিকে চলে যাবো।' সেই বাসনার মধ্যে শুধু যুদ্ধে যাওয়ার রোমাঞ্চই ছিল না, সেই সঙ্গে ছিল জীবনে প্রথমবার প্লেনে চড়ার রোমাঞ্চ।

আমাদের এই কল্পিত বিমানযাত্রী, সেই ভ্রমণলাল, যার জীবনে এই প্রথম আকাশ ভ্রমণ, সে প্লেনে উঠে জানলার কাছে একটা সিট পেয়ে জানলার কাচ দিয়ে বহির্দৃশ্য দেখছিল।

বিমানে শেষ যাত্রী উঠে যাওয়ার পর সিঁড়ি সরিয়ে দরজা বন্ধ করা হয়।

আনাড়ি যাত্রীরা দরজা বন্ধ হলে পর ধরে নেন এখনই প্লেন ছাড়বে। কলকাতার পাতাল রেলে যেমন ঘোষিকার মধুর কণ্ঠে যে মুহূর্তে শোনা যায় 'দরজা বন্ধ হচ্ছে', সঙ্গে সঙ্গে মেট্রো গাড়ি ছুটতে থাকে।

কিন্তু এরোপ্লেনের ব্যাপারই আলাদা। বিমান অত সহজে ছাড়ে না। বিমান অত সহজে ওড়ে না।

বিমানের দরজা বন্ধ হওয়ার পরে বেশ কয়েকটি রুদ্ধশ্বাস মিনিট। বড় বড় খোলা দরজা দিয়ে এতক্ষণ আলো হাওয়া কিছুটা আসছিল। দরজা বন্ধের পরে সামান্য ক্ষীণছায়া আলো বিমানের অভ্যন্তরে, কিন্তু অসম্ভব গুমোট, প্রায় দমবন্ধ অবস্থা।

এরই মধ্যে এক আবছায়া প্রায়ান্ধকার পরিবেশে শুরু হল এক রহস্যজনক নাটক।

এ প্রান্তের গোলগাল, হাসিখুশি বিমান-বালিকাটি অত্যন্ত গম্ভীর ও কালো মুখে এদিকের প্যাসেজ ধরে ওদিকে চলে গেলেন। অত্যন্ত চিন্তাকুল-ভাবে।

আর ও প্রান্তের দিদিমণি কাঠি কাঠি, সেই যে বাংলা সিনেমার রসিকতা খ্যাংরাকাঠির মাথায় আলুর দম, ঠিক সেই মার্কা নয়, মোটামুটি গায়েগতরে যতটা হাড়মাংস থাকা উচিত তার থেকে একটু কম। আসলে বালিকাটি রূপলাবণ্যবতী, চোখের কোণে কালি, অবসন্ন চোয়াল তবু কাজের খাতিরে ঠোঁটে হাসি। সেই কাঠি কাঠি দিদিমণিও দ্রুতপদে মুখের হাসি বুজিয়ে ওদিকের প্যাসেজ ধরে এদিকে চলে এলেন।

মধ্যপথে দুই বিমান বালিকা সিটে বসা যাত্রীদের মাথার ওপর দিয়ে কী এক অস্ফুট ভাষায় ফিসফিস করে পরস্পর কী একটু আলোচনা করলেন। কেমন মনে হচ্ছে তাঁরা কোনও বিপদ আশঙ্কা করছেন। এদিকে যন্ত্রী, কুশলী এবং চালকেরাও কেমন যেন, তাঁদের মধ্যে একটা থমথমে ভাব। দরজা বন্ধ করার পর থেকে বিমান যাত্রীর উপরে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, নিঃশব্দে, কোনও নড়াচড়া নেই, সামান্য গুঞ্জন নেই। আনাড়ি যাত্রীর মনে নানা রকম ভীতি-জনক সন্দেহ দেখা দেবে, এতে আর আশ্চর্য কী?

বিমানের ভিতরে তখন অসহ্য গরম! লোকে দরদর করে ঘামছে, গ্রীষ্মকাল হলে তো কথাই নেই। ইতিমধ্যে অবশ্য বিমানটির প্রাণের স্পন্দন শুরু হয়েছে, আপাতত খুবই ক্ষীণভাবে, একটা একটা করে আলো জ্বলে উঠছে, 'ধূমপান থামাও', 'সিট বেল্ট বাঁধো', ইত্যাদি কড়া নির্দেশ ফুটে উঠছে।

নির্দেশ তো ঠিক আছে কিন্তু বিমানের নড়াচড়ার কোনও লক্ষণ নেই। অনেক পরে সেই আকাশপাখি ধীরে ধীরে গজরাতে লাগল। তার সেই ঘ্যানঘ্যানি কাঁদুনি শুনে মনে হতেই পারে যে তার একদম আকাশে ওড়ার ইচ্ছে নেই, তাকে কেউ জোর করে ওড়াচ্ছে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে।

পরবর্তী ঘটনাবলী অবশ্য তাই প্রমাণ করে। হিস্‌হিস্‌ করে, কাদার মধ্যে মজ্জিত হয়ে যাওয়া গোসাপের মতো, পরবর্তী কয়েক মিনিট মিনিটে এক ইঞ্চি

গতিতে অত্যন্ত নিরুৎসুক সেই আকাশপাখির যাত্রা শুরু হল।

কিন্তু তাকে শুরু হওয়া বলা যায় না।

দু ইঞ্চি এগোচ্ছে, তিন ইঞ্চি পেছোচ্ছে। একবার বাঁয়ে, একবার ডাইনে, একবার সামনে, একবার পিছনে। কেন, কোথায়, কোনদিকে যাবে যেন কিছুতেই মনঃস্থির করতে পারছে না।

অতঃপর বহুক্ষণ ধরে চলল সেই যাকে বলে পায়তারা কষা। অনেকক্ষণ থেমে একদম থমকে থেকে তারপরে হঠাৎ ছুটে পঞ্চাশ গজ গিয়ে আবার স্থির। এর পর ধীরে ধীরে বড় বড় দৌড়। আকাশে ওঠার ব্যাপার নেই, মাটির ওপরেই অকারণ দৌড়ঝাঁপ। এই রকম করতে করতে অবশেষে লম্বা এক দৌড়ে এয়ারপোর্টের এই কিনারা থেকে একেবারে ওই কিনারায়, বেশ দ্রুত গতির দৌড় সেটা। কিন্তু এই শেষ নয় এর পর মুখ ঘুরিয়ে আবার উলটো দিকে একটা একই রকম দৌড়।

তবু আকাশপাখি আকাশে ওঠে না। আর তার পেটের মধ্যে যে যাত্রী বসে রয়েছে, জীবনে যার এই প্রথম বিমানারোহণ, তার মনে যদি নানা রকম বিপজ্জনক সন্দেহ ও খটকা দেখা দেয়, সে তো নিরুপায়, নিজের বহু সাধের প্রাণটা সঁপে দিয়ে বসে আছে এই বিমানের গহ্বরে, তাকে মোটেই দোষ দেওয়া উচিত নয়।

অবশেষে কিন্তু বিমান উড়বে। যখন ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে আমাদের যাত্রীটি, যখন সে মনে মনে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এ প্লেনটার কোনও ত্রুটি আছে, এর পক্ষে আকাশে ওড়া সম্ভব নয় আর যদি উড়তে ওঠেও, তার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে, ঠিক তখনই প্রবল গড়িমসির পর বিমান পাখা মেলে আকাশে উড্ডীয়মান হল। তবুও তখনও বিমানের চূড়ান্ত মতিস্থির হয়নি, যেদিকে উড়ল সেদিকে না গিয়ে ভোঁ করে উলটো দিকে ঘুরে এল। একটা বিমানের এয়ার পোর্টের উঠোন থেকে আকাশচারী হওয়ার আগের প্রতিটি মুহূর্ত অতীব উত্তেজনাপূর্ণ এবং ভয়প্রদ।

এই দীর্ঘ সময়ের যে কোনও সময়ে ভ্রম হতে পারে যে বিমান এবার আকাশে উড়েছে। অবশ্য জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকালে এমন ভ্রম হওয়ার কথা মোটেই নয়।

কিন্তু আমাদের ভ্রমণলালের সত্যিই ভ্রম হয়েছিল। বিমানের জানলায় বসে বহুক্ষণ বিমানযন্ত্রের গজরানি, প্রথমে গোঁ গোঁ তারপর ঘড় ঘড় শুনে তার মনে হয়েছিল, প্লেন আকাশে উঠেছে।

এবং তখনই সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে নীচের বিমান বন্দরের মানুষগুলোকে একদম ছোট ছোট পিঁপড়ের মতো দেখাচ্ছে, ঠিক পিঁপড়ের মতোই নড়াচড়া করছে সেই লোকজনেরা।

ভ্রমণলালের জীবনে এ ধরনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। সে খুবই উত্তেজিত হয়ে পাশের সিটের সদ্য আলাপিতা সহযাত্রিনীকে কনুই দিয়ে খোঁচা দিয়ে বলল, 'দেখুন, দেখুন।'

যৌবন যায়-যায়-যায়-না প্রায় মধ্যবয়সিনী সেই সুডৌল মহিলা সুদূর ডালাস থেকে বহু বছর পরে পিত্রালয়ে ভবানীপুরে এসেছিলেন ভাইঝির বিয়েতে, একাই এসেছিলেন। একাই ফিরে যাচ্ছেন। তিনি পুরনো পাপী, বহুকালের পুরনো আকাশচারিণী।

ভদ্রমহিলা সহসা কনুইয়ের খোঁচায় বিহ্বল হয়ে ভ্রমণলালকে বললেন, 'কী দেখতে বলছেন, কী দেখব?'

ভ্রমণলাল জানলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, 'দেখুন, নীচের মানুষগুলোকে কেমন ছোট, কেমন পিঁপড়ের মত দেখাচ্ছে।'

প্রবাসিনী সামান্য একটু পর্যবেক্ষণ করে বেশ খিলখিল করে হেসে উঠলেন। তারপর মধুর কণ্ঠে বললেন, 'ভ্রমণলালবাবু ওগুলো মানুষ নয়, সত্যিই, সত্যি সত্যিই পিঁপড়ে।'

চমকিত ভ্রমণলাল বলল, 'পিঁপড়ে? সত্যিই পিঁপড়ে?'

প্রবাসিনী বললেন, 'পিঁপড়ে ছাড়া আর কী? প্লেন তো এখনও আকাশে ওড়েনি। এখনও মাটির ওপর গজরাচ্ছে। পিঁপড়েগুলো বহুদিন হল প্লেনের জানলায় বাসা বেঁধেছে। বিনা পাসপোর্টে, বিনা ভিসায়, বিনা বিদেশি মুদ্রায় সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

তখন আমরা থাকি দক্ষিণ কলকাতায়, পণ্ডিতিয়ায়। বাসাটা ছিল রাস্তার ওপরে বসানো, আমরা থাকতাম একতলায়। বাইরের ঘরের সদর দরজা খুললেই ফুটপাথ। চিঠিপত্র ডাকপিয়ন ওই সদর দরজার নীচ দিয়ে গলিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকিয়ে দিত। যদিও একটা ডাকবাক্স ছিল বাড়ির পিছনের দিকে সিঁড়ির নীচে প্যাসেজের মধ্যে।

আমরা বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়, সবাই মিলে একসঙ্গে বেরোলে, সদর দরজায় তালা দিয়ে যেতাম; যাতে যে কেউ বাইরে থেকেই বুঝতে পারে যে আমরা কেউ বাসায় নেই, যাতে অনর্থক কড়া নেড়ে বা কলিং-বেল বাজিয়ে আগতজনের হয়রানি না হয়।

এক শনিবার বিকেলে সদর দরজায় তালা দিয়ে আমরা সবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলাম। বোধহয় খুব দূরে যাইনি। কাছাকাছিই কোথাও আড্ডায় গিয়েছিলাম কিন্তু ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। আমাদের দরজার মুখে একাধিক আধাগৃহস্থ কুকুর তখন শুত। কোনও জায়গা থেকে ফিরতে যত দেরি হত, তারা তত আমাদের প্রীতি-আলিঙ্গনে অস্থির করে দিত। সেদিনও তাই হল। আমাদের দেখে কুকুরগুলো দু' পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোলাকুলি করার চেষ্টা করতে লাগল।

সেই সময়ে রাস্তার আলোয় নজরে পড়ল দরজার নীচে একটা খাম, ব্রাউন রঙের, সরকারি লেফাফা যেমন হয়। খামটার অর্ধেকের বেশি বাইরে বেরিয়ে আছে। একটা কুকুরের পিঠে চাপা পড়েছিল। কুকুরটার শরীরের ধুলো খামটার গায়ে লেগে আছে, একটু ঝেড়ে খামটা হাতে তুললাম।

বিকেলের ডাকেই নিশ্চয় চিঠিটা এসেছে। ডাকপিয়ন ভদ্রলোক কুকুর ডিঙিয়ে খামটা আর ঘরের মধ্যে গলিয়ে দিতে পারেননি। দরজার মুখেই ফেলে গেছেন।

দরজা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে খামটা টেবিলের ওপরে রাখলাম। চিঠিটাকে প্রথমে তেমন গুরুত্ব দিইনি। এ রকম সরকারি চিঠি কারণে অকারণে মাঝে মধ্যেই আসে।

কিন্তু খাম খুলে যা দেখলাম সে আমার পক্ষে রীতিমত আশাতীত ব্যাপার, যদিও খুব অপ্রত্যাশিত নয়।

খামের ভেতর পর পর দুটো চিঠি।

প্রথম চিঠিটি নয়াদিল্লির ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের।

বিদেশ মন্ত্রকের অবর সচিব অর্থাৎ আণ্ডার সেক্রেটারি জনৈক শ্রীযুক্ত কৌশিক চিঠিটি দিয়েছেন। তিনি সরকারি বয়ানে যা লিখেছেন তার সংক্ষিপ্ত-সার হল যে তিনি আমাকে ভারতস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের একটি আমন্ত্রণপত্র পাঠাচ্ছেন। আমন্ত্রণপত্রটি আমাকে দেওয়া হয়েছে একজন লেখক হিসাবে। আমি যদি আমন্ত্রণটি গ্রহণ করি তাহলে ভারত সরকারের সেই ব্যাপারে কোনও আপত্তি নেই।

মূল আমন্ত্রণপত্রটি যেটি শ্রীযুক্ত কৌশিকের পত্রের সঙ্গে ছিল সেটি দিয়েছিলেন সেই সময়কার আমেরিকার ভারতস্থিত রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত রবারট এফ গহিন।

রাষ্ট্রদূত আমাকে আমন্ত্রণটি সরাসরি না পাঠিয়ে সরকারি বিধি অনুযায়ী ভারত সরকারের নির্দিষ্ট মন্ত্রকে পাঠিয়েছিলেন, তারপর আমার কাছে নিমন্ত্রণ পৌঁছেছে বহির্বিষয়ক মন্ত্রক মারফত।

সে যা হোক, এ রকম একটা নিমন্ত্রণ যে আসতে পারে সে আভাস আমি কিছুদিন আগেই পেয়েছিলাম।

নিমন্ত্রণপত্রটি বিদেশ মন্ত্রণালয় মারফত আমার কাছে আসে নভেম্বরের মাঝামাঝি।

এর প্রায় মাসখানেক আগের কথা। সেবার পুজোর ছুটিতে আমাদের দেশ টাঙ্গাইল অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে আমার বাবা এসেছিলেন আমার কাছে।

আমার বাবার ছিল খুবই শীতের বাতিক। বৃদ্ধ বয়েসে বছরের দীর্ঘ সময় তিনি গরম জামাকাপড় পরে থাকতেন। বছরের প্রায় অর্ধেক সময় লেপ গায়ে দিয়ে শুতেন। আমাদের দেশে একটা সংস্কার ছিল যে কার্তিক মাসে লেপ বার করা চলবে না। কার্তিক পেরিয়ে অঘ্রাণে লেপ উঠবে বিছানায়। এই সংস্কারের বশে আমার বাবা প্রতিবার আশ্বিন মাসে বলতেন, 'দে, লেপটা একটু ছুঁয়ে রাখি। তা হলে কার্তিকে গায়ে দিতে হলে কোনও দোষ হবে না।'

সেটা ছিল একটা ছুটির দিন। বোধহয় বিজয়াদশমী থেকে লক্ষ্মীপুজোর মধ্যে কোনও একটা দিন। তার আগের দিন একটা ফোন পেয়েছিলাম আমার এক পরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে। এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, কী এক সাহিত্যঘটিত প্রয়োজনে, আমার যদি সময় হয় তবে পরদিন সকালের

দিকে তিনি ওই ভদ্রলোককে সঙ্গে করে আমাদের বাসায় আসবেন।

পরদিন সকালে আমার সেই পরিচিত ব্যক্তি অচেনা ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে করে আমার কাছে এলেন।

রীতিমত কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক, সুবেশ। আমার বিষয়ে যথেষ্ট কৌতূহলী। সেবার পুজোয় আমি কোন্ কোন্ কাগজে লিখেছি, আমার কটা বই আছে, আমার লেখাপড়া, চাকরি, নানা বিষয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনায় মত্ত হলেন।

আমার বাবাও বাইরের ঘরে জানলার পাশে বসেছিলেন। বাবার ডান পায়ে বাঁ পায়ের চেয়ে বেশি শীত করত, যদিও তখনও মোটেই ঠাণ্ডা পড়েনি, বাবা জানলার পাশে একটা মোড়ায় বসে রোদে ডান পা দিয়ে তাপ নিচ্ছিলেন।

বেশ নির্বিকারভাবেই বসেছিলেন বাবা, তিনি যে আমাদের কথাবার্তা শুনছেন তাও মনে হচ্ছিল না। কিন্তু কথায় কথায় ভদ্রলোক যখন বেশ সরলভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন, আমার বিদেশ যেতে ইচ্ছা করে কি না, আমি উত্তর দেওয়ার আগেই বাবা মোড়ার ওপরে ঘুরে বসে ভদ্রলোককে দুম করে বললেন, 'আপনি কী গোয়েন্দা।'

মফস্বলের উকিল আমার বাবা, তাঁর ষষ্ঠ অনুভূতিটা খুব প্রখর ছিল। বাবার প্রশ্নটা সঠিক হয়েছিল। তবে ভদ্রলোক কোনও জড়তা না রেখে বললেন, 'তারাপদবাবুর ওপর একটা রিপোর্ট দিতে হবে আমাকে। তাই একটু খোঁজখবর নিচ্ছিলাম।'

বাবা আবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'খোকনের কী কোথাও বাইরে যাওয়ার কথা হয়েছে?' বলা বাহুল্য, খোকন আমার ডাক নাম।

ভদ্রলোক বললেন, 'অনেকটা প্রায় তাই।'

তার মানে তখন বিদেশি নিমন্ত্রণ সরকারি দপ্তরে পৌঁছে গেছে। সরকার আমার বিষয়ে মামুলি খোঁজখবর নিচ্ছেন।

ভদ্রলোক এবং তাঁর সঙ্গী, আমার সেই পরিচিত ব্যক্তি যাঁর সঙ্গে তিনি এসেছিলেন, দুজনে দু' পেয়ালা চা খেয়ে চলে গেলেন। আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু নিমন্ত্রণটা এত তাড়াতাড়ি এসে যাবে সেটা তখনও ভাবিনি।

আমি জ্যোতিষে, হাত দেখায় বিশ্বাস করি না। তবু অনেকদিন আগে এক ঘরোয়া শৌখিন হস্তরেখাবিদ আমার হাত দেখে বলেছিলেন, আমার হাতে সমুদ্রযোগ নেই, মৎস্যপুচ্ছ নেই, আমার কোনওদিন বিদেশ ভ্রমণ হবে না।

বিদেশ ভ্রমণই বা বলি কেন, স্বদেশ ভ্রমণও তখন বিশেষ হয়নি। এদিকে শান্তিনিকেতন, আসানসোল, ওদিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল পর্যন্ত দৌড়।

সুতরাং সেই শনিবার অনেক রাতে বাড়ি ফিরে দরজার বাইরে নিমন্ত্রণপত্র দুটো কুড়িয়ে পাওয়ার পর আমাদের বাড়িতে রীতিমত শোরগোল পড়ে গেল।

কত লোকেই তো যায়, কিন্তু আমি নিজে কোনওদিন বিলেত-আমেরিকা যাব, সে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। সেই কোথায় কতদূরে, আকাশ চালিয়া গেছে কোথায় আকাশে, সেদিন রাতে ভাল করে ঘুম হল না।

দুই

যাত্রারম্ভ

'সুদূরে, বিপুল সুদূরে।
তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—
মোর ডানা নাই,
আছি এক ঠাঁই,
সে কথা যে যাই পাসরি।'...

—রবীন্দ্রনাথ

তখন আমার আর্থিক অবস্থা ভয়াবহ। সেই যাকে বলে, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তার থেকে কিছু অন্য রকম নয়।

যাতায়াত খরচ লাগবে না। খাওয়া-থাকার খরচাও লাগবে না। হাত-খরচাও যৎসামান্য পাওয়া যাবে। নিমন্ত্রণের কোনও ত্রুটি আছে, তা মোটেই বলা যাবে না।

কিন্তু কোথাও বেড়াতে গেলে কিছু ভাল জামাকাপড় তো দরকার। আর সে যা-তা জায়গা নয়, বড়লোক সাহেবদের দেশ, সেখানে আমার ছন্নছাড়া সুতির হাফশার্ট আর পুরনো ঢলো ঢলো ফুলপ্যান্ট পরে কি যাওয়া চলে?

আর শুধু প্যান্টশার্টই তো নয়। মোজা লাগবে, ফিতেওলা জুতো লাগবে, স্কুলের নটি বয় জুতো ছাড়ার পর, আমার পদদ্বয়ের আর সেই ফিতে বন্ধনের সৌভাগ্য হয়নি। তা ছাড়া সুটকেস লাগবে, শক্তসমর্থ বড়সড় সুটকেস, নিত্যদিনের চামড়ার রং করা পিচবোর্ডের ছোট সাইজের সুটকেস কোনও কাজে লাগবে না। সব জিনিসপত্র নিতে ওরকম পাঁচটা সুটকেস নিতে হবে, আর এরোপ্লেনের মালগুদামের জাঁতাকলে ভারী ওজনের শক্ত বাক্সের চাপে সেগুলো গন্তব্যস্থলে চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে, পিচবোর্ড ফেটে শতদীর্ণ হয়ে বেরোবে, তার অন্তর্নিহিত দ্রব্যাদি ছড়িয়ে পড়বে বিমান বন্দরের লাউঞ্জে।

এবং আরও বহু কিছু লাগবে।

আমার পুরনো সুহৃদেরা কেউ কেউ নিশ্চয় স্মরণ করতে পারবেন, লটবহর নিয়ে ঘুরতে আমি ভালবাসি। সেই প্রথম প্রথম যখন হাবরা থেকে কলকাতায় আসতাম, হাবরা মানে গুমো-হাবরা, যাতে কেউ শহর হাওড়ার সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলে তাই এই স্থানীয় নামকরণ, সেই সময়ের কথা বলি।

সেই গুমো-হাবরায় কল্যাণগড়, অশোকনগরে আমার নবীন যৌবনে, আমার পদস্খলনের দিনগুলিতে আমি দু বছর দশ মাস মাস্টারি করেছিলাম। সেই সময় প্রত্যেক শনিবার কলকাতায় কালীঘাটের খালি বাসায় ফিরতাম আর সোমবার সকালে ফিরে যেতাম। ছাতা, শতরঞ্জি, মশারি, টর্চলাইট সবই ছিল আমার ঠিক একটা করে, তাই এগুলো সর্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত।

এমনকি হাবরা থেকে সোজা কফিহাউসের আড্ডায় গেলেও এসব জিনিস সঙ্গে থাকত।

আসলে আমি বোধহয় একটু সাবধানী লোক। সদাসর্বদাই চেষ্টা করি ঝামেলা এড়াতে, কোনও অসুবিধেয় না পড়ি। সব সময়ে যে পারি তা নয়।

সুতরাং প্রবাসযাত্রার মানসিক প্রস্তুতি হিসেবে কী কী জিনিস অপরিহার্য তার একটা তালিকা বানাতে হল। জবাকুসুম তেল, মিঠেপাতা পান, এমনকি সর্ষেবাটা মাছের ঝোল ভাত এ কিছুই আমেরিকায় দুর্লভ হলেও অলভ্য নয়, কিন্তু দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরলেও এক বড়ি আমাশার ওষুধ পাওয়া যাবে না। পেটের ব্যথায় কাটা পাঁঠার মত ছটফট করলে হয়তো সাহেব ডাক্তার একটা পেট পরিষ্কার করার বাইকোলেটস জাতীয় কিছু দেবেন কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি আমাশার কিছু মিলবে না।

আমি অবশ্য অল্প অল্প করে সব রকম ওষুধ নিয়ে গিয়েছিলাম। জ্বর, মাথাধরা, আমাশা, পেটব্যথার সব রকম ট্যাবলেট, কাশির সিরাপ, ঘুমের বড়ি, জোয়ানের আরক, একটা খালি জুতোর বাক্স ভর্তি ওষুধ।

কিন্তু ওষুধপত্র আর কত পয়সা, সস্তার পেটেন্ট ওষুধ সব, ট্যাবলেট, মিক্সচার।

আসল সমস্যা হল পোশাক নিয়ে। সেটা আবার শীতের সময়। হিমশীতল বরফজমা উত্তর আমেরিকা, সেই ঠাণ্ডার সঙ্গে যুঝবার পরিচ্ছদ তো লাগবে।

পরম্পর জানা গেল, যে-সব হোটেলে উঠব সেখানে কম্বল, বিছানা দেবে, সেন্ট্রাল হিটিং থাকবে, সুতরাং সঙ্গে লেপ তোশক বহন করতে হচ্ছে না। অথচ সেই ছোটবেলা থেকে বেড়াতে যাওয়া জানতাম, কয়েকটা ভারী ট্রাঙ্ক, বিশাল গোলগাল শতরঞ্জি দিয়ে মোড়া পাটের দড়ি বাঁধা বিছানা-বালিশ, শীতকালে তৎসহ লেপ। ছাতা, লণ্ঠন এবং অন্তত এক হাঁড়ি মিষ্টি, চমচম হলে ভাল হয়, অন্যথায় পানতুয়া বা রসগোল্লা।

তা সে-সব পাড়াগেঁয়ে নৌকোভ্রমণের ফিরিস্তি এখানে মেলালে চলবে না।

আগে জামাকাপড়ের ব্যাপারটা সেরে ফেলি।

একটা হাফ-শোয়েটার, একটা সুতির গলাবন্ধ কোট, সেটা ছিল জ্যাঠামশায়ের, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, আর একটা মোটা খদ্দরের চাদর ; এতেই কলকাতার শীত আমার বেশ চলে যায়।

কিন্তু বরফের দেশে তো আর এই জামাকাপড়ে চলবে না, প্রথম দিনেই বুকে ঠাণ্ডা জমে নিউমোনিয়া হয়ে মরে যাব। গরম জামাকাপড় তো লাগবেই আর পোশাকগুলো একটু ভদ্রস্থ হওয়া চাই।

কোথায় যেন শুনলাম চাঁদনির বাজারে তুলোর গলাবন্ধ ফুলহাতা গেঞ্জি ও কোমর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা ড্রয়ার, যেগুলোর বাণিজ্যিক নাম উলিকট (Wooly Cot), তাই পাওয়া যায়। এই উলিকট পরিধান করলে শীত কাছে ঘেঁষতে পারবে না।

কথাটা সত্যি। যথাসময়ে চাঁদনিতে গিয়ে একজোড়া উলিকট এবং দুজোড়া গরম মোজা কিনেছিলাম। উলিকট প্রয়োজনীয় উষ্ণতা দেয়, শরীরের চামড়া পুরো ঢেকে রেখে সেটা ভেদ করে এক ফোঁটা হাওয়া-বাতাস ঢুকতে পারে না। চমরি গাই অথবা পাহাড়ি রামছাগলের শরীরের নিরাপদ আস্তরণের মতই প্রায় উলিকট।

কিন্তু চমরিগাই বা রামছাগল কোনও দিন কোনও কনফারেন্সে যায় না, পার্টিতে বা নিমন্ত্রণে যায় না। সেন্ট্রাল হিটিংয়ের দরজা জানলা বন্ধ আঁটোসাটো ঘরে তার কোনও কাজ নেই।

ওই তুলোর গেঞ্জি-পাজামা পরে আমেরিকা যাওয়ার পথেই লণ্ডনে আমি ঘোরতর বিপদে পড়েছিলাম। সন্ধ্যাবেলা নিমন্ত্রণ ছিল বন্ধুর বাড়িতে। সেই আমার প্রবাসে প্রথম সন্ধ্যা। জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ, লণ্ডনেও সে বছর খুব শীত। আমি ওই তুলোর পোশাকের ওপরে জামা প্যাণ্ট সোয়েটার কোট সব কিছুই ঠিকঠাক পরিধান করেছিলাম।

সঙ্গে অবশ্যই ওভারকোটও ছিল। সেটা নিমন্ত্রণ বাড়ির সদর ঘরের দরজার পাশের র‍্যাকে ঝুলিয়ে রেখে ঘরের ভিতরে ঢুকে আধ ঘণ্টাখানেক পরে প্রচণ্ড ঘামতে লাগলাম, কপালের শিরাগুলো কনকন করতে লাগল। প্রথমে বুঝতে পারিনি, ভাবলাম হার্ট অ্যাটাক হতে চলেছে, মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল, দম বন্ধ হয়ে এল। অবশেষে ধরতে পারলাম ওই তুলোর গেঞ্জির অন্তর্বাসই এই ভয়ংকর অস্বস্তির উৎস। বন্ধুকে একটু আলাদা করে আমার পরিস্থিতিটা বলতে সে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলল, 'বাথরুমে গিয়ে ও-সব খুলে ফ্যাল।' অতঃপর প্রাণরক্ষা হল, কিন্তু বেরোনোর সময় অসুবিধে হয়েছিল। তখন আমি আর তেমন ধাতস্থ নেই। ভূরিভোজ ইত্যাদির পরে আবার বাথরুমে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে উলিকট জোড়া পরতে সাধ যায়নি। ওভারকোটের দুই পকেটে দুটোকে গুঁজে যখন বেরিয়ে আসছি, অন্যান্য অভ্যাগতেরা কেউ কেউ আমার দিকে সন্দেহজনক চোখে তাকাচ্ছিলেন।

সে যা হোক মোজা, উলিকট ইত্যাদির মূল্য আমার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ছিল। কিন্তু সবচেয়ে যে জিনিসটা আমাকে দুর্ভাবনায় ফেলেছিল সেটা হল ওভারকোট। কলকাতার বাজারে সচরাচর ওভারকোট রেডিমেড অবস্থায় কিনতে পাওয়া যায় না। আর অর্ডার দিয়ে, তাও সাধারণ দর্জি পারবে না, বড় রাস্তার সাহেবপাড়ার দর্জিকে অর্ডার দিতে হবে—কাপড়, লাইনিং, মেকিং চার্জ, সব মিলিয়ে যা লাগবে তা দিয়ে আমার পরবর্তী দশ বছরের জামাকাপড়ের খরচা হয়ে যাবে। তা ছাড়া মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্যে জিনিসটা আমার দরকার। আবার কোনও কালে বিদেশে যাব সে ভরসা খুব করিনি। ফিরে এসে কলকাতায় ওই ওভারকোট আমার কোনও কাজে লাগবে না। তবে শুনেছিলাম, ওভারকোট আছে বলেই, ওভারকোটের ব্যবহার করার জন্যেই কোনও কোনও লোক ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে সিমলা-দার্জিলিংয়ে যায়।

কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম। ওভারকোট নিয়ে এত ভাবনার কিছু ছিল না। বহু লোকেরই আলনায়, বাক্সে, ওয়ার্ডরোবে বছরের পর বছর ওভারকোট অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকে। কবে একবার বিদেশে কেনা হয়েছিল, অথবা বিদেশ যাওয়ার সময় তৈরি করানো হয়েছিল, তারপর থেকে বিনা ব্যবহারে পড়ে আছে। লনড্রিতে কাচতে দিয়ে ওভারকোট আর ফেরত নেননি এমন গ্রাহকের সংখ্যাও কম নয়। ধৌতাগারের কর্তারা বহু সময়ই এ জাতীয় পোশাক যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করেন।

যা হোক, ইতিমধ্যে আমার বিদেশি নিমন্ত্রণের সংবাদটা বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়জনের মধ্যে বেশ প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। আসলে আমি নিজেই বহু লোককে বলেছি, আমার স্বভাবই তাই, সবই বলে ফেলি।

আর কিছু নয়, শুধু ওভারকোট বিষয়ে নানা দিক থেকে অযাচিত সব সাহায্য আসতে লাগল। প্রথম চিঠি পেলাম ঢাকা থেকে। আমার বাবার এক অগ্রজস্থানীয় সুহৃদ, আমরা বলতাম খন্দকার চাচা, মেয়ের কাছে ক্যানাডায় কিছুদিন ছিলেন। তিনি লিখলেন, তাঁর ওভারকোটটা পড়েই আছে। আমার গায়ে ভালই ফিট করবে, আমি যদি ঢাকায় এসে নিয়ে যাই।

আমার এক দূরসম্পর্কের কাকা যুদ্ধের সময় ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে বিলেতে কয়েক বছর আটকে পড়েছিলেন। একদিন তিনি স্বয়ং তাঁর উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের ওভারকোটটি খবরের কাগজে জড়িয়ে আমাদের বাসায় নিয়ে এলেন। দুঃখের বিষয় ওভারকোটটি বার করে ভাঁজ খোলামাত্র তার হাতা, পকেট, কলার ইত্যাদি সব ঝুরঝুর করে পড়ে গেল।

অবশ্য এর চেয়েও বনেদি একটি অতিকায় কালো ওভারকোট আমার মাতামহের ছিল। কী এক অজ্ঞাত কারণে ওই রকম ভারী পোশাক পরে ধলেশ্বরী তীরবর্তী তাঁর গ্রামের রাস্তায় তিনি শীতের দিনে ভ্রমণ করতেন। দুঃখের বিষয়, সেটি বড় ট্রাঙ্কে তালা দিয়ে রাখা ছিল। ওটার কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। এবার ওভারকোটের চিন্তা মাথায় আসার পরে ট্রাঙ্ক খুলে সেটা বার করতে গিয়ে দেখি, ওর আর অবশিষ্ট কিছু নেই, কয়েকটা ইঁদুরমাতা ওটাকে প্রসূতিসদন হিসেবে ব্যবহার করছে, বড় বড় পকেট থেকে বিভিন্ন আকারের ও আয়তনের একপাল ইঁদুরছানা বেরোল।

আমার অপিসের বড়বাবু অল্প বয়সে একবার বিলেত যাবেন বলে বাড়ি থেকে টাকা চুরি করে পালিয়েছিলেন। বিলেত আর যাওয়া হয়নি। বোম্বাই থেকে পুলিশ ধরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়ে দেয়। তবে বিলেত যাওয়ার জন্যে যে ওভারকোটটা বানিয়েছিলেন সেটা তখনও রয়ে গেছে। তাঁর খুব বাসনা আমি তাঁর ওই জিনিসটা নিই। আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু বাসায় আমার স্ত্রী বললেন, 'ওটা অমঙ্গুলে ওভারকোট। ওই কোট নিলে তোমারও বাইরে যাওয়া হবে না।'

কিন্তু এখানেই তো শেষ নয়। ডাকযোগে, টেলিফোনে, লোক মারফত কখনও কখনও ব্যক্তিগতভাবে ক্রমাগত ওভারকোটের সাহায্যের প্রস্তাব আসতে

লাগল। কেউ কেউ ধরে নিয়েছিলেন আমার স্ত্রী মিনতি এবং পুত্র তাতাইও সঙ্গে যাবে। তাঁরা মহিলা ওভারকোট এবং বালক ওভারকোটের সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিলেন।

সারাজীবন কত জিনিস আমাদের অজানা থেকে যায়। এই গরমের দেশে যে ঘরে ঘরে এত ওভারকোট ছিল, সে কথা কি আগে কখনও ভেবেছিলাম।

এ সব বারো-চৌদ্দ বছর আগের কথা। সেই উনিশশো আটাত্তরের শীত। শুধু স্মৃতি ও পুরনো অবিন্যস্ত কিছু কাগজপত্রের ওপর ভরসা করে খুব ধীরে ধীরে সাবধানে এগোতে হচ্ছে। কালক্রম তথা পর্যায়ক্রম রক্ষা করা বেশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে, বাজে গল্প ঢুকে পড়ছে আসল ঘটনার মধ্যে। গোলমাল যে দু চারটে করে ফেলব সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই।

সে যা হোক, ওভারকোটের সমস্যা শেষ পর্যন্ত কীভাবে সমাধান করেছিলাম অথবা বাচ্যান্তরে, কীভাবে সমাধান হয়েছিল তার বিস্তৃত এমনকি সংক্ষেপিত বর্ণনা ইয়ার্কি'র পর্যায়ে পড়ে যাবে।

মোট কথা শেষ পর্যন্ত আমি দুটো অতি চমৎকার ওভারকোট পেয়েছিলাম।

একটি দিয়েছিল পার্থ। শ্রীপার্থসারথি চৌধুরি। অনেক কালের পুরনো বন্ধু আমার। আমার বিদেশি আমন্ত্রণের কথা শুনে সে যে কী আহ্লাদিত হয়েছিল সে চিরদিন মনে থাকবে। দার্জিলিংয়ে কর্মরত থাকার সময় সে সম্ভবত ওই ওভারকোট বানিয়েছিল, খুবই মজবুত জিনিস সেটা।

আর দ্বিতীয় ওভারকোটটি দিয়েছিলেন সুপ্রিয়দা, শ্রীযুক্ত সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উৎসাহ এবং বদান্যতাতেই আমার বিদেশ যাত্রা সম্ভব হয়েছিল। এই দ্বিতীয় ওভারকোটটি বোধহয় খাঁটি বিলিতি জিনিস ছিল। যথেষ্ট উষ্ণ অথচ বেশ নরম, ওজনে যথেষ্ট হাল্কা আর তার কাটটাও ছিল বেশ মর্যাদাপূর্ণ।

বলা বাহুল্য, এবং যাঁরা আমাকে জানেন তাঁরা বুঝতেও পারছেন, দুটি ওভারকোট নিয়েই আমি বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলাম।

গায়ে একটা ওভারকোট, সুটকেসের মধ্যে একটা ওভারকোট, দিল্লি বিমান-বন্দর দিয়ে যখন দেশ ত্যাগ করি শুল্ক দপ্তরের লোকেরা ব্যাপারটা অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখেন। আমার পাসপোর্ট, কাগজপত্র সবই খুব খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন।

এতেও তাঁদের সন্দেহের নিরসন হয় না। ওভারকোট দুটো তাঁরা তন্ন তন্ন করে হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখলেন এবং শুধু ওভারকোটই নয় আমার অন্যান্য সব জিনিসপত্রও তাঁরা যথাসাধ্য ঘাঁটাঘাঁটি করলেন।

অবশেষে নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে যখন তাঁরা আমাকে মুক্তি দিলেন, তখনও তাঁদের দৃঢ় ধারণা কোথাও গোলমাল কিছু আছে, তাঁদের মুখে-চোখে যে ভাব ফুটে উঠল তা হল, 'এবারের মত ছাড়া পেয়ে গেলে, কিন্তু একদিন তোমাকে আমরা ধরবই ধরব।'

অতঃপর ফিতেওলা জুতোর ব্যাপারটা আসছে।

গরম মোজা কেনা হয়ে গেছে। জুতো তো লাগবেই। মনে মনে স্থির করলাম, সস্তায় চিনেপাড়া থেকে জুতো কিনব। আমার নবীন যৌবন কেটেছিল চিনেপাড়ার পেছনে ডেকার্স লেনে, যেখানে সপ্তাহে প্রতিদিন এখন খাদ্যের মেলা বসে। চপ-কাটলেট-ফিশফ্রাই, ওমলেট, দোসা—কী পাওয়া যায় না। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকের সেই ফাঁকা, নির্জন ডেকার্স লেন, এখন সেখানে নিত্যনৈমিত্তিক মুক্তবায়ু ভোজসভা।

চিনেপাড়ার দু একটা পুরনো দোকান তখনও আমার চেনা ছিল। তবে শিবরাম চক্রবর্তীর ভাষায় বলা যায় চিনা-অচিনায় চিনাদের কাছে কোনও সুবিধে হয় না। আমারও হয়নি।

এইত্তি লুপিজ মানে আশি টাকা থেকে দাম-দর করে পঞ্চাশ না পঞ্চান্ন টাকায় শেষ পর্যন্ত রফা হয়েছিল এক জোড়া ব্রাউন রঙের ফিতেওলা জুতোর বিনিময় মূল্য।

কিন্তু সে জুতো জোড়া আমাকে খুব ভুগিয়েছিল। প্রথমত ভাল ফিট করবে বলে এক সাইজ কম মাপের জুতো দিয়েছিল, তাছাড়া মোজা ছাড়া খালি পায়ে জুতো পরীক্ষা করেছিলাম। দোকানদার অবশ্য বলেছিল, নতুন চামড়া, এর পরে পায়ে দিতে দিতে ছাড়বে, তখন প্রকৃত ফিট হবে।

কিন্তু তা ছাড়েনি। ওই জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে সমস্ত প্রবাসকাল আমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটেছি। এখনও যে একটু কাত হয়ে চলি, আমার সন্দেহ হয়, সে ওই জুতো জোড়ারই অবদান।

তবে জুতো জোড়া নিয়ে অন্য একটা অকল্পিত ঝঞ্ঝাট হয়েছিল আমার।

আগেই বলেছি, আমি গিয়েছিলাম তুষারপাতের ঋতুতে, ভরা শীতে। যখন রাস্তায় বরফ পড়ে থাকত তার ওপর দিয়ে একটুক্ষণ হেঁটে গেলেই জুতোর ফাঁক দিয়ে জল ঢুকে যেত। জুতো, গরম মোজা সব ভিজে সে এক প্রাণান্তকর অবস্থা। বরফের দেশে ও জুতো চলে না। সেখানে লিক-প্রুফ, ওয়াটার-প্রুফ জুতো ব্যবহার করতে হয়।

কিন্তু সেরকম এক জোড়া জুতোর দাম মার্কিন দেশে অনেক, সে কিনবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

আমার অবস্থা দেখে এক শুভানুধ্যায়ী পরামর্শ দিলেন, 'একটা গালোশ কিনে নিন। সস্তাও হবে। কাজও চলে যাবে।'

গালোশ হল রবারের ওভার সু। জুতোর ওপরের জুতো। অনেকটা গামবুটের মত, তবে পাতলা রবারের। ওর মধ্যে জুতোসুদ্ধ পা গলিয়ে দিতে হয়। প্রথম প্রথম অনভ্যস্ত পায়ে বেশ অসুবিধে হত, মনে হত রণপায়ে চড়েছি। তবে গালোশের রবারে পা ঢাকা পড়ে যাওয়ায় রাস্তার ঠাণ্ডা জল আর আসল জুতো মোজায় প্রবেশ করতে পারত না। সেটাই যা স্বস্তি।

আর একটা কথা মনে পড়ছে, ওই গালোশ পায়ে দিয়ে আমার আপেক্ষিক উচ্চতা বেড়ে গিয়েছিল। প্রায় এক ইঞ্চি তো হবেই।

তবে গালোশ কিনতে বোধহয় বহুমূল্য পনেরো ডলার ব্যয় হয়েছিল

আমার। সেটা একরকম অপচয়ই বলা চলে।

আরও এই কারণে অপচয় যে ফেরার সময় গালোশ জোড়া ইচ্ছে করেই ফেলে এসেছিলাম। ওই ভারী জিনিস বহন করে আনার কোনও মানে হয় না, এদেশে ওটা কোনও কাজে লাগবে না।

তবু একবার ভেবেছিলাম পায়ে দিয়ে চলে আসব। ফেলে আসতে মায়া হচ্ছিল। কিন্তু শুকনো খটখটে বিমানবন্দরে পায়ে গালোশ পরে উপস্থিতি, দুটো ওভারকোটের সঙ্গে সেটা আরও বেশি সন্দেহজনক হয়ে যেত।

সুতরাং অনেক ভেবেচিন্তে গালোশ জোড়া ফেলেই এলাম।

তিন

এলেবেলে

'It is not wothwhile to go around the world to count the cats in Zanzibar.'

(জাঞ্জিবারে বেড়ালের সংখ্যা গোনার জন্যে বিশ্বের চারদিকে ঘুরতে যাওয়া কোনও কাজের কথা নয়।)

—Henry David Thorean

ঠিক ভ্রমণকাহিনীর মতো ব্যাপারটা হচ্ছে না। বারবার যত সব এলেবেলে গল্প মনে পড়ছে।

আপাতত আরেকটা গল্প বলি। বিমান ও নরখাদকের গল্প। আমার সব গল্পের মতই এ গল্পটাও ভারী পুরনো। প্রায় সবারই জানা, তবু গল্পের খাতিরে গল্প।

তা ছাড়া বড় একটা কারণ আছে। সারাজীবনে যত যতবার প্লেনে উঠেছি, প্রত্যেকবার প্লেনের ভিতরে ঢুকে যেই সিটে বসেছি অমনি গল্পটা মনে পড়েছে এবং শিহরিত হয়েছি।

গল্পটা একটু ছোট করে বলি।

কোনও এক গহন জঙ্গলের অভ্যন্তরে প্রাচীন উপজাতিদের গ্রাম। সমাজ-বিজ্ঞানীরা, রাজনীতিবিদেরা যাই বলুন এই উপজাতির মানুষেরা প্রচণ্ড নিষ্ঠুর, চূড়ান্ত নৃশংস এবং কিছুকাল আগেও নরখাদক বা ক্যানিবাল ছিল। এখনও তাই আছে কি না বলা কঠিন। তা এই ক্যানিবাল উপজাতিদের জঙ্গলীয় গ্রামের ওপরেও যথারীতি আকাশ আছে। থাকতেই হবে। সেই আকাশের ওপর দিয়ে কখনও কখনও প্লেন উড়ে যায়। হাঁটাপথে, সড়কপথে যাঁরা যাতায়াত করেন তাঁরা সচরাচর ক্যানিবালদের গ্রামের মত বিপজ্জনক এলাকা থেকে দূরে থাকেন।

কিন্তু আকাশপথে সে রকম হঠাৎ আক্রমণের আশঙ্কা নেই, অবশ্য বিমান যদি ভেঙে না পড়ে। আর ভেঙে যদি পড়েই বিমান, তাহলে নরখাদকদের এলাকাতেই পড়ুক অথবা জলে-স্থলে, অরণ্য-জনপদে, মেরুতে-মেরুতে সে যেখানেই হোক খুব কিছু তারতম্য হওয়ার কথা নয়।

এ সব বাহুল্যবাক্যের প্রয়োজন নেই। ছোট ঘটনাটা বলি।

একদা এক ক্যানিবাল বালক তার বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ির বাইরের উঠোনে নরকরোটি, মানে মানুষের মাথার খুলি নিয়ে ব্যাটবল খেলছিল।

অধিকাংশ খুলিই খুব শক্ত। ইস্পাত-দৃঢ় আওয়াব কাঠের দুই পড়তা ব্যাটের চুরচুর মারে, বিশেষ করে শক্তিশালী বন্যবালকদের শক্ত থাবার আঘাতে সেই নরমুণ্ডগুলি নিটোল অবস্থা থেকে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু মাত্র

দু-একটা ছাড়া অধিকাংশ মাথাই এই অনিবার্য আক্রমণ প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল, ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিল না। কিন্তু ঘটনা তা নয়। সেই ব্যাটবল খেলার সকালে একটি আন্তর্জাতিক বিমান সেই ক্যানিবাল পল্লীর উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল।

বনের চূড়ায় অকলঙ্কিত নীলতম আকাশ, শুভ্রতম রোদ—সেদিন সেই এয়ারবাসের দ্রুতগতি যাত্রা সেই অরণ্যপল্লীতে আর কারও চোখে না পড়ুক উপরোক্ত ব্যাটবল বালকটির চোখে পড়েছিল।

সে একটি নরমুণ্ড ক্ষিপ্রহস্তে ওভার বাউণ্ডারিতে পাঠিয়ে দিয়ে দৌড়ে এসে স্নেহশীলা জননীকে জিজ্ঞাসা করল, 'মা ?'

মা বললেন, 'কি ?'

'এইমাত্র আকাশ দিয়ে, জঙ্গলের ওপর দিয়ে যে জিনিসটা চলে গেল, ভোঁ ভোঁ করে উড়ে গেল সেটা কি ?' বন্যবালকটি তার মাকে জিজ্ঞাসা করল।

সেই ক্যানিবাল জননী বড় রক্ষণশীলা, বড় কনসারভেটিভ। অনেকক্ষণ থেমে থাকলেন, তারপর ভাবলেন নতুন যুগের বালককে সব কথা বলা ঠিক হবে না, তাই অনেক ভেবেচিন্তে, অনেক থেকে থেকে অনেক থেমে থেমে বললেন, 'বাছা, ঐ যে জিনিসটা একটু আগে আকাশ দিয়ে উড়ে গেল ওটা কোনও খারাপ জিনিস নয়, বেশ ভাল।' ক্যানিবাল খোকা বলল, 'মা, তুমি ভালো বলছ কেন ?'

ক্যানিবাল জননী বললেন, 'শুনে রাখ, ঐ আকাশে ওড়া জিনিসটা যাকে বিমান, এরোপ্লেন বা উড়োজাহাজ বলে ওটা অনেকটা চিংড়ি মাছ, কচ্ছপ কিংবা কাঁকড়ার মত। ওটার ভেতরে যা আছে খোসা ছাড়িয়ে খেতে হয়।'

ক্যানিবাল খোকার জিব দিয়ে জল পড়ছিল, সে জিজ্ঞাসা করল, 'খেতে ভাল মা ?'

মা বললেন, 'খুব ভাল,' মায়ের রসনাও চনমন করে উঠল।

এই অবান্তর গল্প বিমানে ওঠার পরেকার।

কিন্তু ওঠার আগের কিছু ঘটনা তো এখনও বলা বাকি রয়েছে।

প্রথমে ছাড়পত্রের কথা বলি। ভারত সরকারের অনুমতি তো নিমন্ত্রণ-পত্রের সঙ্গেই পেয়েছিলাম। আমি তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব পর্ষদে কাজ করছি। বিদেশে যাওয়ার জন্য ছুটি ও অনুমতিপত্রের আবেদন করে দিলাম অফিসে। সে সব পেতে কোনও অসুবিধেই হল না।

এর পর পাসপোর্ট এবং ভিসা।

সে আরও বহুকাল আগের পুরনো কথা। আমি কলকাতায় আমার ছোট মাসিমার কাছে থেকে তখন কলেজে পড়তাম। আমার মা-বাবা, বাড়ির লোকেরা থাকতেন সেই টাঙ্গাইলে, সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে। বছরে দুবার, পুজোর ছুটিতে আর গরমের ছুটিতে বাড়ি যেতাম।

ভারত ও পাকিস্তান, এই দুই দেশের মধ্যে অনেক দিন পর্যন্ত পাসপোর্ট

প্রথা চালু হয়নি। তাই প্রথম প্রথম যাতায়াতে কোনও অসুবিধে ছিল না। সীমান্ত ছিল খোলা তবে রেলপথে সীমান্ত স্টেশনগুলোতে এবং সড়কপথে সীমান্ত চৌকিতে কাস্টমসের লোকেরা পুলিশের লোকের সঙ্গে যোগসাজসে দুদিকেই বেশ অনাচার করত। হয়তো একজন একটা নতুন শাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, কি একটা কাঁসার গেলাস অথবা আধসের দেশের ঘি—বিনা অজুহাতেই কাস্টমসের লোকেরা সেগুলো আটকিয়ে দিত, ব্যাপারটা অনেক সময়েই প্রায় লুটপাটের পর্যায়ে পড়ত। কিন্তু মুখ ফুটে কেউ বিশেষ কোনও প্রতিবাদ করেছে কখনও এমন দেখিনি—কেউ সাহস করেনি, খণ্ডিত দেশের দুর্বল মানুষের সে স্পর্ধা ছিল না।

আমি যখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি, সেটা উনিশশো বাহান্ন সাল, সেই বছরের অক্টোবর মাসে অনেক বাদবিতণ্ডার পরে প্রায় হঠাৎই দু'দেশের মধ্যে যাতায়াতের জন্যে পাসপোর্ট চালু হল। শুধু পাসপোর্ট নয়, সেই সঙ্গে ভিসাও।

বাহান্ন সালে পুজোর ছুটি ফুরানোর আগেই তাড়াতাড়ি কলকাতা ফিরতে হল, শেষ পর্যন্ত দেখে দেখে পাসপোর্ট চালু হওয়ার ঠিক আগের দিন কলকাতায় ফিরলাম। ট্রেনে ভয়াবহ ভিড়, পাদানিতে হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়ানোর জায়গা পাওয়াই প্রায় অসম্ভব। রীতিমত জীবন বিপন্ন করে কলকাতায় এলাম।

মনে আছে, পাসপোর্ট প্রথা শুরু হওয়ার পরে প্রথম কয়েকদিন রেলগাড়িগুলোয় সীমান্ত পেরোনোর সময় কোনও যাত্রী ছিল না। খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় শূন্য রেলের কামরার ছবি ছাপা হয়েছিল। রসিকতা করে এপার থেকে একটা বস্তায় একটা বেড়াল ভরে খালি রেলকামরায় তুলে প্রথম পাসপোর্টহীন যাত্রী হিসেবে ওপারে চালান করা হয়েছিল। বিনিময়ে ওপার থেকে অনুরূপ কি যেন এ পারে পাঠানো হয়েছিল।

উনিশশো তিপ্পান্ন সালে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর এপ্রিল মাসে বাড়ি যাওয়ার আগে পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে হল। অবশ্য পুরো পাসপোর্ট সেটা ছিল না, আন্তর্জাতিক ছাড়পত্র নয়, নিতান্তই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যাতায়াতের জন্যে।

ওই পাসপোর্টটি এখনও আমার কাছে সযত্নে রাখা আছে। সেই সময়ে, হয়তো কলেজিয়ানার নিদর্শন সেটা, আমার চোখে চশমা উঠেছিল। সদাসর্বদা চশমা আমার এখনও দরকার পড়ে না। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গে পাসপোর্টে আমার ছবিটা চশমাপরা মুখের, এবং এখন পর্যন্ত চশমাচোখে আমার ফটো ঐ একটাই।

কলকাতার পাক দূতাবাস থেকে, এণ্টালি পদ্মপুকুরের কাছে সি আই টি রোডে ভিসার অফিস হয়েছিল, ভিসাও সংগ্রহ করতে হল।

পার্টিশনের পর মাত্র সাড়ে পাঁচ বৎসর হয়েছে তখন, বহু লোকের তখনও যাতায়াত চলছে দুদেশে, ফলে ভিসার কাউণ্টারে ভয়াবহ ভিড়, আগের দিন রাত থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে পরের দিন সকালে ভিসার দরখাস্ত জমা দিতে হত।

কয়েকদিন পরে একটা নির্দিষ্ট তারিখে মাইকে ভিসাপ্রাপকদের নাম একে একে ডেকে ছাড়পত্র হাতে তুলে দেওয়া হত। উত্তেজনা, ধাক্কাধাক্কি খুবই ছিল।

তবে ভিসার খুব কড়াকড়ি ছিল না। যতদূর মনে পড়ে আমার ছিল বি ক্যাটেগরি বা খ শ্রেণীর ভিসা। এক বছর মেয়াদ হত ঐ ভিসার, আর প্রতি বছরে আটবার যাতায়াত করা যেত।

কিন্তু সেদিনের সেই যাতায়াত আর এবারের ঐ ভূপর্যটন দুইয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ।

ভূপর্যটন শব্দটা প্রকৃত অর্থেই ব্যবহার করলাম। কারণ প্যানামে আমার জন্যে যে টিকেট বুক করা হয়েছিল সেটা ছিল রাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড। একদিক দিয়ে গিয়ে অন্যদিক দিয়ে আমেরিকা থেকে ফিরে আসা। যাবো তেহরান, লন্ডন হয়ে ফিরব টোকিও, হংকংয়ের পথে! মার্কিন দেশের পূর্ব উপকূলে নেমে ভ্রমণশেষে পশ্চিম উপকূল থেকে প্রস্থান।

তেহরান শুনে হয়তো খুব খটকা লাগতে পারে, কিন্তু আজকের এই তেহরান সেদিনের সেই তেহরান ছিল না। সেই তেহরান ছিল শাহের ইরানের রাজধানী, খোমেইনির ইরানের নয়।

শাহ ভাল না খোমেইনি ভাল অন্য অনেকের মত এ রকম বিস্ফোরক বিষয়ে আমার কোনও ধ্যানধারণা নেই, দুজনেই দু'প্রান্তে চরম। এক প্রান্তে বেলি ড্যান্স অন্য প্রান্তে আপাদমস্তক আবরু।

মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণে যেতে হলে তখন প্যানামের বিমানেই যেতে হত। বোধহয় এটাই নিয়ম ছিল। কিন্তু প্যানাম তো উঠেই গেছে, অতবড় অতিকায় হাওয়াই জাহাজের কোম্পানিটাও হাওয়াতেই মিশে গেছে।

একটা কথা এই সূত্রে স্মরণযোগ্য যে ভারতবর্ষের বিমান বন্দরের মানচিত্রে প্যানামের তালিকায় কলকাতা সর্বপ্রথম এসেছিল। এই তো কয়েক বছর আগে বেশ ধুমধাম করে ভারতে প্যানামের চল্লিশ বছর প্রতিপালিত হল। সেই চল্লিশ বছর, চার দশকের আরম্ভ হয়েছিল কলকাতা থেকে। তখন এই উপ-মহাদেশে কলকাতা অর্থাৎ দমদম সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু বিমানবন্দর।

দুঃখের বিষয় উনিশশো আটাত্তর সাল নাগাদ, আমি ঐ যে বছর বাইরে গেলাম, এই এত ইনিয়ে বিনিয়ে যে সময়কার ভ্রমণকাহিনী লিখছি, সে সময়ে দমদমের অবনতি চূড়ান্তের দিকে যাচ্ছে।

কলকাতা থেকে প্যানামের কোনও বিমান নেই, উঠতে হবে দিল্লি থেকে। তবে আন্তর্জাতিক বিমান কোম্পানিগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন দেশের ভিতরকার অন্তর্দেশীয় উড়োজাহাজবাহিনীর একটা সম্পর্ক বা চুক্তি থাকে। দেশের প্রধান বা সুবিধেজনক বিমান বন্দরে আন্তর্জাতিক বিমান যাত্রীদের নামিয়ে দেয়, অথবা সেখান থেকে তুলে নেয়। তারপর স্থানীয় বিমানের দায়িত্ব সেই যাত্রীদের যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেবার ও নিয়ে আসার।

আমার যাত্রাপথ এইরকম ছিল ; সাহেবরা যাকে বলেন ফার্স্ট লেগ বা প্রথম চরণ, সেটা ছিল ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের বিমানে কলকাতা থেকে দিল্লি।

দ্বিতীয় চরণ দিল্লি থেকে লণ্ডন, প্যানামের বিমানে। পথে পূর্বকথিত তেহরান, তাছাড়া ফ্র্যাঙ্কফুর্ট পড়বে। প্যানামের টিকিটের মধ্যে আমার দিল্লি এবং লণ্ডনে থাকা-খাওয়া আতিথ্যের সুবন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু তেহরান বা ফ্র্যাঙ্কফুর্টে যাত্রাভঙ্গ করতে গেলে সে নিজখরচে।

হায়, নিজখরচ।

পয়সা কোথায় যে খরচ করব। এখনও প্রায় সেই অবস্থাই চলছে, কিন্তু তখন ছোট সরকারি চাকরির সামান্য মাইনেতে বহু দায়দায়িত্বের উদ্বাস্তু সংসারে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করাই অতি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিদেশ ভ্রমণের রাহাখরচ, টিকেট ইত্যাদি বাদে অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচা সংগ্রহ করতে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল।

শুধু ভাল জামাজুতোর খরচ নয়, যে সময়টুকু বাইরে থাকব সে সময়ের বাসাখরচ রেখে যেতে হবে। আমি তো বিদেশে চপ-কাটলেট, পোলাও মাংস খাব। বাড়ির লোকেরা সে সময় কি খাবে? আর সাধারণ জামাকাপড় ও ওভারকোট ছাড়াও কিছু গরম জামাকাপড় তো লাগবে।

তবে সবই পেয়ে গেলাম, বেশ ভাল মতই পেয়ে গেলাম। মহালয়ার উষাকালে স্বর্গত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র কথিত আকাশবাণীর সুবিদিত অনুষ্ঠানে যেমন শোনা যেত, এখনও যায়, দেবতারা কিভাবে অসুরের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে শ্রীদুর্গাকে সাজালেন, শীতাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে আমারও তাই হল।

স্নেহশীলা মানসীদি (শ্রীমতী মানসী দাশগুপ্ত) আমাকে গরম দস্তানা আর মাফলার ধার দিলেন। এই মাফলার নিয়ে পরে নিউ ইয়র্কে বেশ গণ্ডগোল হয়েছিল সে কথা অন্যত্র আগেও লিখেছি, আবার এবারও অবশ্যই লিখতে হবে। সেটা নিউ ইয়র্ক অধ্যায়ে।

নবনীতা (দেবসেন) ওর নিজের গায়ের একটা ফুলহাতা সোয়েটার আমাকে দিল, ভারী গরম ছিল সেটা। উত্তর আমেরিকার চরম শীতে পরম উষ্ণতায় সেই সোয়েটার আমাকে রক্ষা করেছে।

আমার পরম শুভানুধ্যায়ী অকালমৃত গোপাল সামন্ত, যাঁর মতো সাহিত্যপাগল এ জন্মে আর দেখলাম না, আমাকে একজোড়া সাদাকালো স্ট্রাইপ সুট উপহার দিলেন, সে সুট এখনও আছে। এখনও সুযোগ জুটলে পরিধান করি।

তদুপরি একটা ভারী উলের গলাবন্ধ কোট আর সেই একই কাপড়ের ফুলপ্যাণ্ট বানিয়ে সুট করা হল। গড়িয়াহাট মোড়ের একটা দোকান থেকে পুরোটা ধারে বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন সুপ্রিয়দা, সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে ফিরে এসে কিস্তিবন্দি সেই ঋণ শোধ করেছিলাম।

তাছাড়া চেন লাগানো একটা খুবই হাল্কা কিন্তু শক্ত ও বিশাল আয়তন সুটকেসও ধার দিয়ে সাহায্য করেছিলেন সুপ্রিয়দা।

এই সব ঐহিক জিনিস ছাড়াও এই তিনজনাই আমাকে প্রচুর পরামর্শ ও

উপদেশ দিয়েছিলেন। মানসীদি, নবনীতা এবং সুপ্রিয়দা এই তিনজনেই ছিলেন আমার কাছে বিদেশ বিশেষজ্ঞ আর এ বিষয়ে আমার জ্ঞান ছিল শূন্য। তবে আমার রওনা হওয়ার অল্পদিন আগে টাঙ্গাইল থেকে বাবার একটা চিঠি পেয়েছিলাম, তাতে পরিষ্কার একটা উপদেশ ছিল।

বাবা লিখেছিলেন,

'স্বল্প দিনের মেয়াদে বিদেশে যাইয়া এমন কিছু অবশ্যই খাইবে না বা করিবে না যাহা দেশে ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বা করিতে পারিবে না।'

অফিসের প্রভিডেন্ট ফান্ডে সামান্য কিছু টাকা তলানি পড়ে ছিল। তার মধ্যে যতটা তোলা যায় তুলে নিয়ে এবং অল্প কিছু কিছু ব্যক্তিগত ঋণ নিয়ে সংসার খরচ এবং আমার খুচরো খরচের টাকা শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ হয়েছিল।

কিন্তু এ সব ছাড়াও আরও একটা বড় রকমের ব্যয়ের বোঝা এই ভ্রমণের কারণেই আমার ঘাড়ে চেপেছিল।

জন্মের মধ্যে কর্ম, সাতজন্মে এই একবার বিদেশ যাওয়া। সুতরাং আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিতজন, প্রাক্তন প্রতিবেশী, সহপাঠী বিদেশে বিলেত আমেরিকায় যে যেখানে আছেন বহু কষ্টে এদিক ওদিক ঘুরে তাঁদের প্রায় সকলের ঠিকানা সংগ্রহ করে চিঠি দিলাম, 'আমি আসছি'।

তাঁরা সকলেই যে আমার এই চিঠি পেয়ে খুব আহ্লাদিত হয়েছিলেন তা হয়তো নয়। তাঁদের বেশ অনেকেই আমার চিঠির উত্তরই দেননি।

কিন্তু আমার বহু অর্থব্যয় হয়েছিল। বিদেশি হাওয়াই ডাকে নীল চিঠি, সে যে কি ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, তার ওপরে একটা দুটো চিঠি নয়, গন্ডা-গন্ডা, ডজন-ডজন চিঠি, সে খরচ বহন করতে শুধু টাটা-বিড়লারাই পারেন।

তবে আমার অন্য একটা লাভ হল।

ঐ হাওয়াই চিঠি কেনার জন্য না হলেও নিতান্তই পয়সা বাঁচানোর জন্যে আমি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে ছিলাম।

বাবা লিখেছিলেন, 'দেশে যা খাইতে পারিবে না বিদেশে তাহা খাইবে না', বাবাকে চিঠির উত্তরে লিখলাম, 'দেশে যাহা খারাপ খাইতাম তাহাও ছাড়িয়া দিলাম।'

অবশ্য সেই সময় এক সুহৃদ আমাকে বলেছিলেন, 'সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিলে দৈনিক যতগুলো সিগারেট খেতে ঠিক তত কেজি ওজন বাড়বে তোমার।'

তা বেড়েছে। আগে প্লেনের সিটে বসলে কেমন প্রশস্ত মনে হত, এখন কেমন চাপাচাপা লাগে।

এই তো সেদিন, আমার আয়তনের জন্যেই নিশ্চয়, এক বিমানসেবিকা, তাঁর কাছে জল চেয়েছিলাম, তিনি এক গেলাস জল হাতে এনে দেখি 'শেঠজি, শেঠজি,' করে ডাকছেন। প্রথমে ভাবলাম অন্য কারও জল, তারপর বুঝলাম জলের গেলাসটা আমার জন্যেই এবং আমাকেই বিমানসুন্দরী 'শেঠজি' বলে সম্বোধন করছেন!

চার

পিছন পানে আকাশ

'কোথায় যেন তোমার ডাক
শুনতে পেয়ে এলাম গতকাল
আমায় কেন ডেকেছো তাই
বললে হেসে হেসে...
ক্ষেতের পরে ক্ষেত ফুরালো
খামার জঞ্জাল
এখন তোমার পিছনপানে আকাশ'...

—শক্তি চট্টোপাধ্যায়

তখন আমার সমুখপানে আকাশ।

যাওয়ার দিন ক্রমশ ঘনিয়ে আসতে লাগল।

আমার যাওয়ার দিন স্থির হয়েছিল ১৩ জানুয়ারি শুক্রবার। সবাই জানেন সাহেবি কুসংস্কারে তেরো তারিখ এবং সেই সঙ্গে শুক্রবার আমাদের ত্র্যহস্পর্শ, মঘা, অশ্লেষা ইত্যাদির চেয়েও মারাত্মক। ও রকম অমঙ্গলজনক দিন আর হয় না।

আমি কিন্তু মাথা ঘামাইনি এবং শেষ পর্যন্ত অমঙ্গলকর আমার ক্ষেত্রে কিছু হয়নি। সজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছিলাম।

বাইরে যাওয়ার সময়, সকলের যেমন হয় আমারও আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট পেতে বেশ দেরি হয়েছিল, প্রায় শেষ মুহূর্তে পেয়েছিলাম।

কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এরকম হওয়া উচিত ছিল না। এ কথা বলছি সেই কারণে যে আন্তর্জাতিক না হলেও একটা ভারত-পাক পাসপোর্ট আমার ছিল, যেটা পঁচিশ বছরেরও বেশি পুরনো। তা ছাড়া আমি সরকারি কর্মচারী এবং যে আমন্ত্রণে আমি বিদেশে যাচ্ছি সেটা পুরোপুরি সরকারি আমন্ত্রণ। সে যা হোক কিছু দৌড়োদৌড়ি, খোঁজখবর করার পর শেষে পাসপোর্ট হাতে এল। তখন রুদ্ধশ্বাস অবস্থা।

পাসপোর্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল পাসপোর্ট ফটো। এখন তো রঙিন ফটো চালু হয়েছে, কিন্তু আমি যখন যাই তখন পর্যন্ত সাদা-কালো ফটোই রীতি ছিল, এখনও যে পাসপোর্ট আমার আছে তাতে সাদা-কালো ফটোই রয়েছে।

সাদা-কালো, সম্প্রতি দূরদর্শনে হিন্দিতে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বোঝাতে শ্বেত-শ্যাম বলা হচ্ছে। কিন্তু শ্যাম আর কৃষ্ণ কি এক হল?

এ অবশ্য অবান্তর কথা। আসল কথা হল পাসপোর্ট ফটো নিয়ে আমার একটা গল্প আছে।

নিতান্ত তামাশার কাহিনী। কিন্তু ঠিক তামাশাও বলা চলে না, পুরোপুরি ঠাট্টা নয়। সত্যের কিঞ্চিৎ ছোঁয়া আছে গল্পটায়।

এই তামাশার গল্পটা কিন্তু আগেও লিখেছি, ইংরেজিতে আমার অনেক আগে অন্য একজন লিখেছিলেন।

গল্পটা নিজের ঘাড়ে চাপাচ্ছি না, তৃতীয় পুরুষে থার্ড পার্সনে লিখছি।

তিনি হিল্লি-দিল্লি, লণ্ডন-টণ্ডন, ইউরোপ-আমেরিকা ছয় সপ্তাহে বিশাল বিশ্ব পরিক্রমা সেরে দেশে ফিরলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত, মুখ চোখ বসে গেছে, মাথায় আতেলা এলোমেলো চুল, অক্ষি কোটরে কালিমা, ওজন কমেছে, কেমন খাপছাড়া দেখাচ্ছে তাঁকে।

বাড়ির সবাই বিমানবন্দরের লাউঞ্জে এসেছেন তাঁকে রিসিভ করতে। তিনি বেরিয়ে এলেন। তাঁর সেই ঝাপসা মুখের দিকে তাকিয়ে দেড় মাস অদর্শনের পর তাঁর আকুলা স্ত্রী বললেন, 'ওগো তোমাকে যে একদম তোমার পাসপোর্ট ফটোর মত দেখাচ্ছে।'

সত্যি, পাসপোর্ট ফটোগুলো অমন হয় কেন। যে লোকটার ছবি, ছবিটা অনেকটা তার মত কিন্তু পুরোটা তার মত নয়, কিছুটা ঝাপসা-ঝাপসা, কিছুটা কেমন যেন।

পাসপোর্টের পর ভিসার কথাও বলতে হয়।

যদিও পৃথিবী তখন আমার হাতের আমলকি, বিশ্ব জগতের চাকায় গোল হয়ে ঘুরে আসার রঙিন টিকিট আমার হাতে, তখন আমার নীল দিগন্তে ম্যাজিক কিন্তু অতি সাবধানীর মত আমি স্থির করেছিলাম, সামান্য সময়ের পরিসরে এত ঝামেলা, এত নামাওঠা, ধাক্কাধাক্কি আমার পোষাবে না। আমি জানি, আমি নেহাতই ঘরগেরস্থ লোক, একটু আড়ালে আবডালে একটু থিতু হয়ে আত্মরক্ষা করাই আমার নিয়তি।

সব ভেবে চিন্তে ঠিক করেছিলাম, যাওয়ার পথে লণ্ডনে নামব, ফেরার পথে হংকংয়ে।

প্যানামের টিকিটে কত জায়গার নাম লেখা ছিল, কিন্তু আমার চরিত্রের মহৎ দুর্বলতা হল আলস্য, সব জায়গায় নামাওঠা করা আমার পোষাবে না, নিজ ব্যয়ে সে আর্থিক সামর্থ্যও ছিল না।

বিমান টিকিটে আমার তিন জায়গায় ফ্রি হোটেলের এবং বিমানবন্দর থেকে সেই হোটেলে যাতায়াতের বন্দোবস্ত ছিল, এই তিনটি জায়গা হল যাওয়ার পথে দিল্লি ও লণ্ডন এবং ফেরার পথে হংকং।

হংকংয়ের কথা শেষ পর্যায়ে আসবে। সে এখন অনেক দূরে। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে হংকং যেতে ভারতীয়দের ভিসার প্রয়োজন নেই, এখন কি হয়েছে বলতে পারছি না, তবে তাতে অন্তত আমার একটা সমস্যা কমেছিল।

অবশ্য আমেরিকান ভিসা নিয়েও কোনও সমস্যা ছিল না। সেটা তো জানা কথাই, সেই সরকারের আমন্ত্রণেই এই যাত্রা, ভিজিটর এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের অন্তর্গত এই সফরসূচি।

তবু সেই ভিসা আনতে গিয়ে তিনটে অভিজ্ঞতা হয়েছিল যা এখানে বলা উচিত।

প্রথমে ওই খারাপ তারিখটার কথা বলি।

দূতাবাসের এক বাঙালি কর্মচারী আমার যাত্রার দিন ১৩ জানুয়ারি শুক্রবার স্থির হয়েছে জেনে, দিনটা যে যাত্রানাস্তি বা অযাত্রার দিন সাহেবি পাঁজিকার এই নিষেধটি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাকে রওনা হওয়ার তারিখ পালটাতে বললেন।

দ্বিতীয় যে কথাটা মনে আছে, ভিসা ফর্মে আমার গায়ের রঙ কেমন সেটা জানাতে হবে। আমাদের দেশে এবং অন্যত্রও শনাক্তকরণের প্রয়োজনে চুলের রঙ, চোখের রঙ ইত্যাদি ছাড়পত্রে লিপিবদ্ধ থাকে। কিন্তু যে কারণেই হোক এই ভিসায় গাত্রবর্ণের উল্লেখ করতে হবে।

আমি বেশ সমস্যায় পড়লাম। আমার গায়ের রঙ, আমার স্ত্রী বলেন রোদে পোড়া পিচের রাস্তার মত, আমার দিদিমা বলতেন পাকা জামরুলের (বাতাবি লেবুর) মত।

দুটোর কোনোটাই সত্যি নয়। আমার গায়ের রঙ বিবাহের বিজ্ঞাপনের ভাষায় শ্যামবর্ণ, আসলে হালকা কালো।

প্রশ্ন উঠতে পারে কালো আবার হালকা হয় কি করে, হালকা সবুজ হতে পারে, হালকা গোলাপি হতে পারে কিন্তু হালকা কালো ?

সে যা হোক ভিসা দরখাস্তের ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে আমি বর্ণসংকটে পড়ে দ্বিধাগ্রস্ত হলাম। যদি বিনয় করে প্রায় সত্য কথাই লিখি, মানে গায়ের রঙ কালো, ব্ল্যাক, তা হলে নিশ্চয় আমাকে কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো বোঝাবে। তাতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু তা আমি নই এবং পাসপোর্টের ভিসার এই বিবরণ আমার অস্তিত্বের সঙ্গে মিলবে না, বিদেশ-বিভুঁয়ে অনর্থক বেকায়দায় পড়ব।

আমার সমস্যার সমাধান করলেন ভিসা অফিসার স্বয়ং। আমি ইতস্তত করছিলাম ফেয়ার লিখব কিনা এই ভাবতে ভাবতে কারণ ফেয়ার বলতে যা বোঝায় তা তো আমি নই।

আর আমি তো বিয়ের কনে বা প্রেমপূজারি নই, সেই চল্লিশ পেরোনো প্রায় বিগত যৌবন নিজের চেহারা, মুখশ্রী, গায়ের রঙ, আমার এ সব নিয়ে চিন্তা, দুশ্চিন্তা বা মাথাব্যথা ছিল না।

আমার যৌবনের সোনালি দিনগুলো কেটে গেছে অন্নচিন্তা চমৎকারায়। নিজের গায়ের রঙ, মুখের ডিজাইন নিয়ে ভাববার সুযোগ ছিল না, শুধু একটাই ভাবনা ছিল সে ভাবনা গ্রাসাচ্ছাদনের।

ভিসা অফিসার মহোদয়ের এক দরিদ্র দেশের হতদরিদ্র পদ্যকারের মনের কথা জানা সম্ভব নয়।

কিন্তু ফর্ম পূরণে আমার দেরি হচ্ছে দেখে তিনি নিজে থেকেই এগিয়ে এলেন। বোঝা গেল এই জাতীয় সমস্যায় তাঁর যথেষ্টই অভিজ্ঞতা আছে। নির্দিষ্ট কলমে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে তিনি নিজেই আমার হাত থেকে ফর্মটা নিয়ে

প্রায় দেড়ফুট লম্বা একটা চকচকে ডটপেন দিয়ে গাত্রবর্ণের পাশের ফাঁকা জায়গায় আঙুল দেখিয়ে অন্য একটা কাগজে খসখস করে লিখে দিলেন হুইটিস। অর্থাৎ গমের মত। আমার দিকে তাকিয়ে মুখেও বললেন, 'হুইটিস'।

ইতিপূর্বে কোথায় যেন বিনীতভাবে স্বীকার করেছিলাম আমার এই ম্যাটমেটে গাত্রবর্ণের এই কাব্যময় বর্ণনায় আমি যথেষ্টই অভিভূত হয়ে পড়ি এবং বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা কালব্যয় না করে ওই হুইটিস শব্দটি নির্দিষ্ট স্থানে লিখে দিই।

ভিসা বিষয়ে আমার তৃতীয় অভিজ্ঞতাটি আত্মসম্মানজনিত। ভিসার জন্যে আমায় কোনও ফি দিতে হয়নি। যা সচরাচর দিতে হয়। কারণ ওই আমন্ত্রণ, কিন্তু যখন দেখলাম আমার পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পে বেশ বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে গ্র্যাটিস যাকে বলে একেবারে ব্লক লেটারে, বেশ একটা অস্বস্তি লেগেছিল।

বিনি পয়সার ভিসা গ্র্যাটিস তো বটেই কিন্তু গ্র্যাটিস শব্দটির মধ্যে কোথায় যেন একটা অনুকম্পা, দয়া দেখানোর ভাব আছে।

মার্কিন ভিসার পর লণ্ডন যাওয়ার আয়োজন করতে হল।

লণ্ডনে সে সময়ে আমার তিনজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, সে তিনজন এখনও লণ্ডনেই আছেন।

এঁরা হলেন শ্রীযুক্ত ভাস্কর দত্ত, ডক্টর ফ্র্যাঙ্ক টেলর এবং শ্রীযুক্ত নিমাই চট্টোপাধ্যায়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনীগুলির পাঠকদের কাছে ভাস্কর দত্ত একটি সুপরিচিত চরিত্র। ভাস্কর সুনীলের সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু, শ্যামবাজারে পদ্মনাথ লেনের দত্তবাড়ির ছেলে, টাউন স্কুলের ছাত্র।

এক সময়ে কৃত্তিবাস পত্রিকা পদ্মনাথ লেনের ভাস্করদের বাড়ির ঠিকানা থেকে বেরোত। ভাস্কর উদার, দিলখোলা মানুষ। আমার সঙ্গে তার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং এখনও আছে। তবে এই ঘনিষ্ঠতা আমার দিক থেকে বন্ধুত্বমূলক কিন্তু ভাস্করের মধ্যে কিছুটা গার্জিয়ানিও রয়েছে। চিরকালই সে আমাকে শাসনে এবং সদুপদেশে রেখেছে। 'যা, বাড়ি যা', 'আর খাসনে', 'খালি বাজে কথা', এই ধরনের আপ্তবাক্যে সে আমাকে পরিচালনা করার চেষ্টা করে। আগে করতও, এখনও করে, এই তো এবারই কলকাতায় এসে একই ভাবে শাসন করে গেল।

ডক্টর ফ্র্যাঙ্ক টেলার বহুকাল আগে কলকাতায় ব্রিটিশ কাউন্সিলে ছিলেন। সেই ষাটের দশকের মাঝামাঝি প্রায় তিরিশ বছর হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, খুবই গভীর সেই বন্ধুত্ব।

ফ্র্যাঙ্ক অবশ্য ছিল বিজ্ঞানের লোক। ভালো ছাত্র। অল্প বয়সেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানে ডক্টরেট পেয়েছিল, বোধহয় রসায়ন শাস্ত্রে। ডক্টরেট পাওয়ার পরেই সে ব্রিটিশ কাউন্সিলে ঢোকে, এখনও সেখানেই রয়েছে।

পৃথিবীর নানা জায়গায় ফ্র্যাঙ্ক ব্রিটিশ কাউন্সিলের অফিসে কাজ করে এখন আবার লণ্ডন হেড অফিসে। আমি সেবার যখন গিয়েছিলাম সেই সময়েও তার লণ্ডনে পোস্টিং ছিল।

ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল একটা আশ্চর্য কারণে। সে আমার সগোত্র, একটা পার্টিতে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সেখানে আমি তাকে কথার কথায় বলেছিলাম যে আমি একজন ক্রিস্টিয়ান, শ্রীমতী অগাথা ক্রিস্টির যা কিছু রহস্যগ্রন্থ পাওয়া যায় সবই আমি পড়েছি, এমনকি এরকিউল পায়রো, আগাথা ক্রিস্টির গোয়েন্দা নায়ককে জড়িয়ে আমি একটা পদ্যও লিখেছি।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলাতেই দেখি আমাদের জীর্ণ কালীঘাট বাড়ির সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে আসছে ফ্র্যাঙ্ক।

সেই থেকে শুরু। একটা নতুন ফোর্ড করটিনা গাড়ি কিনেছিল ফ্র্যাঙ্ক, সেই গাড়িতে আমি, মিনতি, তাতাই, আমার স্ত্রী-পুত্র, বহুবার ডায়মণ্ডহারবারে সুধেন্দুর ওখানে গেছি, তখন কবি সুধেন্দু মল্লিক ডায়মণ্ডহারবারে হাকিমি করেন। উদ্বাস্তু উপনগরী হাওড়া অশোকনগরে আমাদের পুরানো বাসায় গেছি। বাঁশবেড়িয়ায়, ফলতায় নুরপুরে কত জায়গায় ঘুরেছি ফ্র্যাঙ্কের গাড়িতে।

ফ্র্যাঙ্ক প্রায় আমারই সমবয়সী। আমার বন্ধুদের সঙ্গে বিশেষ করে শক্তি, সুনীল এবং সম্প্রতি ঢাকাবাসী বেলাল চৌধুরী এঁদের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

একবার মনে আছে ডায়মণ্ডহারবারে সুধেন্দুর বাড়িতে সুধেন্দুর পাচক, সাহেব বলেই বোধহয়, ফ্র্যাঙ্ককে দুটো পটল ভাজা আর আমাদের সকলকে একটা করে পটলভাজা দিয়েছিল। এই ঘটনায় শক্তির সে কি প্রতিবাদ, সে কি হল্লা। ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে শক্তি পাচককে মারতে ওঠে। সুখের বিষয়, কেন এই গণ্ডগোল ফ্র্যাঙ্ক কিছুই বুঝতে পারেনি।

ভাস্কর এবং ফ্র্যাঙ্ক ছাড়া, লণ্ডন যাওয়ার ব্যাপারে আমি আর যাঁকে চিঠি দিয়েছিলাম তিনি হলেন বি. বি. সি খ্যাত শ্রী নিমাই চট্টোপাধ্যায়। তিনি কলকাতা বেতারকেন্দ্রের শ্রী অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ এবং তাঁর মত সুরসিক সুহৃদ বিরল।

এই তিনজন ছাড়া আরও দুতিনজন আধা আত্মীয়, আধা পরিচিত জনকেও লণ্ডনে চিঠি দিয়েছিলাম। হয়তো ঠিকানা ভুল হয়েছিল, হয়তো তাঁরা আমাকে চিনতে পারেননি। হয়তো আমার চিঠির উত্তর দেওয়া তাঁরা প্রয়োজন বোধ করেননি। তাঁরা কেউ আমার চিঠির উত্তর দেননি।

ভাস্কর, ফ্র্যাঙ্ক এবং নিমাইয়ের চিঠির উত্তর এসেছিল।

নিমাই চট্টোপাধ্যায়ের চিঠিটি স্মরণীয়।

আমাদের পণ্ডিতিয়ার আবাস ছিল রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ঊনত্রিশ ডাকঘরের অন্তর্গত। নিমাই তাঁর এয়ার লেটারের ঠিকানার জায়গায়

ওপরে পরিষ্কার বাংলা হরফে লিখেছিলেন,

'মাননীয় রাসবিহারী এভিনিউ ডাকঘরের পোস্টমাস্টার মহোদয়,

দয়া করে দেখবেন এই বিশেষ জরুরি চিঠিটি যেন তারাপদবাবুর কাছে ১৩ জানুয়ারির আগে পৌঁছায়।'......

এই বিশেষ অনুরোধের কারণ ১৩ জানুয়ারি আমি রওনা হবো এবং সে সময়ে নিমাই লণ্ডনে থাকছে না। ইউরোপের অন্যত্র কোথাও সেই সময় তাঁর ভ্রমণ সূচিবদ্ধ।

তবে ভাস্কর আর ফ্র্যাঙ্ক দুজনেই জানিয়ে ছিল, তারা দুজনেই লণ্ডন বিমানবন্দরে আমাকে নিতে আসবে। এই সংবাদ আমার জন্যে যথেষ্ট স্বস্তির কারণ হয়েছিল।

বিলেতের ভিসার কথাটা এখানে সেরে ফেলি। ফ্র্যাঙ্ক ব্রিটিশ কাউন্সিলের লোক, তার চিঠি এসে গেছে। সেই চিঠি হাতে ব্রিটিশ দূতাবাসে ভিসার জন্যে গেলাম। তখন বিলেত যাওয়া নিয়ে খুব কড়াকড়ি। অনেক কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা, জেরার পর, মার্কিন ভিসা এবং বিমানের ফেরত আসার টিকেট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে দূতাবাস থেকে একটি প্রবেশপত্র পেলাম, ভিসা নয় এনট্রি সার্টিফিকেট।

এটাই তখন বিলেত বিধি, কমনওয়েলথের ঠাট রক্ষা করে যথাসম্ভব লোক আসা ঠেকানো। এই প্রবেশপত্র পেলাম ১১ জানুয়ারি, রওনা হওয়ার ঠিক দুদিন আগে।

অবশেষে আমার বিমান ভ্রমণ আরম্ভ হওয়ার মুখে সেই ভিতু বিমান যাত্রীর করুণ কাহিনীটি বলে রাখি।

স্বীকার করা উচিত এবং ইতিমধ্যেই আমার লেখায় সেটা নিশ্চয়ই প্রতিফলিত হয়েছে যে বিমান ভ্রমণে আমার ভয়ও কিছু কম নয়।

অসুখটা মানসিক, মনোবিজ্ঞানে একটা খটমট নাম আছে এই রোগের। রোগটা হল বন্ধ জায়গায় দম বন্ধ হয়ে মরে যাওয়ার আতঙ্ক। পুরনো আমলের কোলাপসিবল গেটের লিফটে কোনও অসুবিধা হত না আমার, কিন্তু আধুনিক নিশ্ছিদ্র লিফটের অভ্যন্তরে আমি ঘামতে থাকি। এয়ার কণ্ডিশন ঘর, সেণ্ট্রাল হিটিং বাড়ি, সিনেমা হলে, প্ল্যানেটোরিয়ামে এমন কি নিজের অফিস ঘরে যখনই খেয়াল হয় কোথাও কোনও জানলা খোলা নেই, কোনও রন্ধ্রপথে বাইরের হাওয়াবাতাস ঢুকছে না, চিন্তাটা আমার মাথায় ঢুকতেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, হাঁফ শুরু হয়, তবে কখনোই মারা যাই না। শুধু দরদর করে ঘামতে থাকি।

প্রতিবারই শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিয়েছি। দম বন্ধ হওয়ার দুশ্চিন্তাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করে রক্ষা পেয়েছি। বিমানে ওঠার পরে যেই বিমানের দরজা বন্ধ করা হয় তারপর থেকেই আমার আতঙ্ক শুরু হয়। পরে যখন দেখি মারা পড়ার তেমন সম্ভাবনা নেই তখন ধীরে ধীরে শান্ত হই।

যে সব পরিব্রাজকেরা পায়ে হেঁটে, সাইকেলে বা মোটর গাড়িতে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে যান তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ভ্রমণবিলাসী কিন্তু হয়তো বিমানে চড়ার আতঙ্কে এই কষ্টসাধ্য যাত্রা মেনে নেন।

আমাদের এই কাহিনীর বিমানভিতু ভদ্রলোকটি বিমানে উঠে সিটবেল্ট বেঁধে সেই যে মুখ কুঁচকিয়ে চোখ বুজে শক্ত হয়ে বসেছিলেন, বিমান আকাশে উড়ে গন্তব্যস্থলে অবতরণের পর তিনি আত্মস্থ হলেন।

সিটবেল্ট খুলে, সিঁড়ি দিয়ে নামার মুখে তিনি হাস্যময়ী বিমান সেবিকাকে বললেন, 'দিদিমণি, বড় ভয়ে ছিলাম। এই দুটি নিরাপদ যাত্রার জন্যে আপনাদের সকলকে বহু ধন্যবাদ।'

দিদিমণি বললেন, 'দুটি কোথায় ? আপনি তো এই একবার এলেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'একবার নয় দুবার। এই আমার প্রথম আর শেষ বিমানযাত্রা।'

আমার বেলায় কিন্তু তেমন হয়নি। সেবার জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে আমাকে বহু বহুবার বিমানে চড়তে হয়েছিল।

পাঁচ

হিল্লি দিল্লি

'When I was at home,
I was in a better place,
but travellers must be content'.
—Shakespeare, As you like it.

—শেক্সপিয়ার

'যখন বাড়ি ছিলাম, অনেক ভাল ছিলাম। কিন্তু
পর্যটকদের সন্তুষ্ট থাকতেই হবে।'...

আমার এই ভ্রমণকাহিনীর নাম দিতে চেয়েছিলাম ভ্রম্যকাহিনী।

বহু ভ্রমে ভরা এই ভ্রমণকাহিনীকে যদি কিঞ্চিৎ রম্য করা যায় তা হলে হয়তো দোষ কিছু নেই।

কিন্তু দেবাদিদেব শেক্সপিয়ার সাহেবকে কাঁধে তুলে ইয়ারকি করা আপাতত যাবে না।

ঠিক আছে ইয়ারকি করার বহু সময় পাওয়া যাবে। যতদূর মনে হচ্ছে এ লেখা, এই ভ্রম্যকাহিনী, ভ্রমণকাহিনী অথবা ভ্রমকাহিনী; আমার এই ভ্রমণ-ভ্রমের রম্য উপকথা সহজে শেষ হওয়ার নয়।

এই এতকাল পরে খাতা খুলে, কলম বাগিয়ে ভুলে ভরা, ভ্রমে ভরা স্মৃতিকথা ভ্রমণবহুল স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে নিজের অক্ষমতা টের পাচ্ছি।

সব ভ্রমণকাহিনীই আসলে কিছুটা আত্মজীবনী। হয়তো 'জীবনস্মৃতি' নয়, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নয়, অথবা 'আত্মকথা' নয় কিন্তু ভ্রমণকাহিনীর মধ্যেও আসল মানুষটিকে পাওয়া যায়। কখনও আড়ালে আবডালে, কখনও খোলামেলা ভ্রমণকাহিনীর সেই নায়কটি রেলের কামরায় ওঠার আগে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে কি ভেবেছিলেন, ভ্রমণকাহিনীর সেই নায়িকাটি প্লেনে ওঠার মুহূর্তে প্লেনের সিঁড়ির সর্বোত্তম ধাপে তাঁর গাঢ় নীল কামিজের ফিকে নীল ওড়না বুঝে কিংবা না বুঝে, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় কেন নীলদিগন্তের দিকে হাওয়ায় ওড়াচ্ছিলেন।

এবং সত্যি সত্যি সঙ্গে সঙ্গে সেই অতি প্রাচীন নীল দিগন্তে সেই জন্যে সেদিন কোনও তরঙ্গ উঠেছিল কিনা, এই রকম সব কাব্যময়, গূঢ় প্রশ্ন ভ্রমণ-কথার পক্ষে তেমন জরুরি নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় সরল তথ্য ও সরস ঘটনা, যার সমন্বয়ে পর্যটন বার্তা পরিণত হবে ভ্রমণকাহিনীতে।

লোকে বাইরে বেড়াতে বের হয় কেন? আপদে বিপদে, কাজে, প্রয়োজনে, যেতে হয়। উৎসবে, আমন্ত্রণে যায়, আবার এমনি এমনিই নিছক বেড়ানোর জন্যে বেড়াতে যায়।

কিন্তু এ কথাও তো মহামতি শেক্সপিয়ার থেকে আর সবাই জানেন, বাড়ির থেকে বাইরে অনেক কষ্ট। বাড়িতে ময়লা বিছানায় শুয়ে যে আরাম ও স্বস্তি, পাঁচতারা হোটেলের দুগ্ধফেননিভ ডানলোপিলোর ম্যাট্রেসে তা লভ্য নয়। কেনটাকি ফ্রয়েড চিকেন খুবই সুস্বাদু কিন্তু শালুক ফুল দিয়ে বাসি ইলিশের টক কিংবা সরষে বাটা সজনের ঝোলে রাঙা কুমড়ো তার কোনও তুলনা হয়!

এ সব অবশ্য খুবই খেলো, সস্তা কথা। যার যেমন রুচি, যার যেমন অভ্যাস, যে যেরকম পরিবেশ থেকে এসেছে তার আহার-বিহারে পছন্দে-অপছন্দে তারই প্রভাব থেকে যায়। প্রয়োজনে এর থেকে একটু ঊর্ধ্বে উঠতে হয়।

সে যা হোক, তত্ত্ব কথা হল, এবার আসল কথায় আসি। একদিন অবশেষে সত্যি সত্যি যাওয়ার দিন এসে গেল। সেই শুভাশুভ তেরো তারিখ, শুক্রবার।

কিন্তু তার আগের দুয়েকটা কথা ভ্রমণকাহিনীর অঙ্গ না হলেও সাদামাটা অলংকার হিসেবে স্মরণ করা উচিত।

বিদেশে যাচ্ছি, আপন পর বহু লোকজনের সঙ্গে দেখা হবে। তাদের জন্যে, অন্তত লৌকিকতার খাতিরে অবশ্যই কিছু উপহার নিয়ে যাওয়া উচিত। দামি উপহার কেনার সঙ্গতি আমার নেই। এখনই নেই, তখন তো ছিলই না। তবে কারও কাছে আতিথ্য গ্রহণ করব, অনেক নতুন পরিচয়, বন্ধুত্ব হবে তাদের জন্যে সামান্য যা হোক, তুচ্ছাতিতুচ্ছ যা হোক কিছু না নিয়ে গেলে খুবই খারাপ দেখাবে।

প্রথম চরণ লণ্ডনে। সেখানে দেখা হবে ভাস্কর আর ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে।

ভাস্কর আমার প্রাণের বন্ধু। তার সঙ্গে দেয়ানেয়া চলে না, নিমন্ত্রণপত্রের ভাষায় লৌকিকতার বিনিময়ে বন্ধুত্ব বাঞ্ছনীয়।

তবু ভাস্করের দুর্বলতার কথা মনে রেখে আমি ভাস্করের জন্যে এক বাক্স 'ডাবল হাতি' চুরুট কিনলাম। সেই মায়াবী চুরুটের কটু মধুর মাদকতাময় ধোঁয়ার গন্ধ বহুকাল পাইনি। হয়তো আজকাল কেউ সেই চুরুট খায় না, কিংবা সে চুরুট আর পাওয়া যায় না। উঠে গেছে। কত কিছুই তো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, হাতিজোড়াও গেছে। সুতরাং এই সুযোগে তার যদি একটু প্রশংসা করি হয়তো সেটা বিজ্ঞাপন হবে না।

অল্প বয়েসে নেশাগ্রস্ত হয়ে চুট্টি খেতে শিখেছিলাম। চুল্লি নয়, চুট্টি। চুট্টি মানে ছোট চুরুট। বিড়ির থেকে একটু বড়, খুব কড়া। একালের নব যুবকেরা কিশোরেরা বড় তাড়াতাড়ি চুল্লি বা ড্রাগের দিকে ঝোঁকে। চল্লিশ বছর আগে দিনকাল একটু অন্যরকম ছিল। তখনও অল্প বয়েসে সিগারেট লুকিয়ে খেতে হত।

নেশা করার ব্যাপারে আমাকে পাপপথে আনেন, আমার পরম শুভানুধ্যায়ী অগ্রজপ্রতিম কবি অরবিন্দ গুহ, ইন্দ্রমিত্র ছদ্মনামে যাঁর 'করুণাসাগর

বিদ্যাসাগর' গ্রন্থটি একালের একটি অমূল্য গবেষণা গ্রন্থ, মহৎ সম্পদ।

তিনি আমার বড় ক্ষতি করেছিলেন। সদানন্দ রোড আর কালীঘাটের মোড়ের একটু বাঁদিকে একটি রমরমা উৎকল দেশীয় তাম্বুল বিপণিতে বহুদিন ধরে তাঁর একটি ঠেক ছিল, এখনও আছে।

সেই ঠেকে আমাদের কালীঘাট পুরনো বাসাবাড়ি থেকে কিঞ্চিৎ আড্ডা দিয়ে বেরিয়ে তিনি যেতেন, আমাকেও প্রায়ই সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং সেখানেই আমি গুণ্ডিপান, তারিয়ে তারিয়ে খেতে শিখি। অরবিন্দের ভাষায় 'আখয়েরা গুণ্ডিমোহিনী ছোট এলাইচি' মানে হল খয়েরহীন এলাচি গুণ্ডি ও মোহিনী দেয়া পান। কঠিন দ্রব্য গুণ্ডি ; গুণ্ডি হল, ধনে, মৌরি, ভাজা তামাকপাতা ইত্যাদির শুকনো ককটেল, চুয়া সহযোগে সুচারু মিশ্রণ আর মোহিনী হল খাঁটি মাদক। সত্যিই মোহিনী, কাঁচের শিশিতে ছোট ছোট সরষে দানার চেয়ে একটু বড় কালো বল, তার যেমন উন্মাদনা, তেমনি উত্তাল গন্ধ।

ওই সদানন্দ রোডের মোড়ের দোকানেই আমি প্রথমে গুণ্ডিপান, তারপর চুট্টি খেতে শিখি। সে সময় এগুলো খুব সস্তা নেশা ছিল।

সেটা উনিশশো সাতান্ন আটান্ন সন, তিনটে চুট্টি এক আনা, দুটো গুণ্ডি পান এক আনা। আবার ওই এক আনাতেই ট্রামের খোলামেলা সেকেণ্ড ক্লাশের কাঠের হেলান দেওয়া বেঞ্চিতে বসে কালীঘাট থেকে ডালহৌসি যাওয়া যেত, এসপ্লানেড পর্যন্ত আরও কম, তিন পয়সা, কার্জন পার্কের লাট সাহেবের বাড়ির কোনায় নামলেই বাকি সামান্য পথটুকু হাঁটলে এক পয়সা বাঁচত।

কি লিখতে কোথায় চলে এলাম।

এখনও কলকাতা ছাড়িনি তবু পৌঁছে যাচ্ছিলাম লণ্ডনে। সেখানে ভাস্কর, ভাস্করের চুরুট, সেই সূত্রে নেশা, অরবিন্দ, গুণ্ডিপান, চুট্টি, তুলনা-মূলকভাবে তৎকালীন দ্রব্যমূল্য, এক আনা মানে ছয় নয়া পয়সায়, এখনকার ছয় পয়সায় ডালহৌসি গমন। এত বেশি অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার, নিতান্ত নির্বোধের মত স্মৃতিবিস্মৃতির কাঁটামনসার জঙ্গলে ঢুকে গেছি।

সন্তর্পণে, অতি সন্তর্পণে কাঁটা ছাড়িয়ে আবার ফিরে আসছি, ভাস্করের চুরুটে অগ্নিসংযোগ করছি।

সেটা বোধহয় উনিশশো ষাট সাল।

ভাস্কর কাজ করত ইণ্ডিয়ান অক্সিজেনে। আমি থাকি কালীঘাট বাড়িতে। মাঝেমধ্যে পড়াতে যাই হাবরায়। ভাস্কর কখনও কখনও বিকেলের দিকে তার তারাতলা অফিস থেকে বাড়ির পথে আমাদের কালীঘাট বাসা হয়ে যেত। সে তখন ডবল হাতি চুরুটের খুব ভক্ত। দামি চামড়ার কেস্ থেকে সেই চুরুট বার করে সে ঠুকে ঠুকে তারপর তার একদিকে একটা দেশলাই কাঠি গুঁজে উল্টোদিকে সেটা ধরাত।

ভাস্করের পোশাক ছিল ফিটফাট, কিঞ্চিৎ আধাসামরিক। সাদা হাফ শার্ট, মূল্যবান খাকি কাপড়ের ফুলপ্যাণ্ট। তার আবার আচরণে, বেশ ব্যক্তিত্ব,

কর্তৃত্বের একটা ছাপ স্পষ্ট ছিল। তাকে দেখলে মনে হত, এখনও হয়, সে হুকুম দিতেই জন্মেছে। হঠাৎ এমনও মনে হওয়া আশ্চর্য নয় যে সে সাদা পোশাকের পুলিশ কর্তা, বা বড় আমলা।

একদিন একটা ঘটনা ঘটল।

হাজরার মোড়ে কি এক কারণে দুই জুতো পালিশওয়ালার সাংঘাতিক হাতাহাতি খণ্ডযুদ্ধ শুরু হল, গ্রাহকদের যে জুতো তারা পালিশ করছিল সেই জুতো দিয়ে পরস্পরকে পেটাতে লাগল। এক সাহসী গ্রাহক তাঁর নিজের চপ্পলটা জুতো পালিশওলার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে এক ধাক্কায় ছিটকিয়ে পড়লেন।

নিরাপদ দূরত্বে থেকে আমি, ভাস্কর এবং অন্যান্য পথচারী এই লড়াই দেখছিলাম। এই অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন বেঙ্গল পুলিশের চোয়াল বসে যাওয়া, কুঁজো হয়ে যাওয়া সেই টিপিকাল অকালবৃদ্ধ দারোগাবাবু।

হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে ভাস্কর সেই দারোগাবাবুকে পিঠে একটা টোকা দিয়ে আদেশ করল, 'দাঁড়িয়ে কি দেখছেন। যান, গোলমাল থামান।'

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন, 'স্যার আমি বেঙ্গল পুলিশ। এটা ক্যালকাটা পুলিশের এরিয়া।' ভাস্কর বলল, 'পুলিশের আবার বেঙ্গল, ক্যালকাটা কি। টোয়েনটি ফোর আওয়ার্স ডিউটি।'

বৃদ্ধ দারোগাবাবু একটা স্যালুট করে তাঁর দেড়ফুটি লাঠি নিয়ে গোলমাল মেটাতে তৎপর হলেন।

ভাস্কর দেশলাইয়ের উল্টো পিঠে চুরুট ঠুকতে লাগল। এই ঘটনার কথা আমার মনে ছিল, সেটা স্মরণ করে ভাস্করের জন্যে তো চুরুট কিনলাম। এবার অন্যদের জন্যে।

ফ্র্যাংক নতুন বাড়ি করেছে। তার জন্যে ডিনার টেবিলের একটা পাটের ম্যাট কিনলাম!

আর কিনলাম কালীঘাট মন্দিরের সামনের বাজারে গিয়ে ছোট ছোট পেতলের মূর্তি লক্ষ্মী, সরস্বতী। গণেশ, হনুমান। সে সময় একেকটার দাম চার পাঁচ টাকার বেশি ছিল না, কিন্তু খুবই সুন্দর, বিশেষ করে গণেশ মূর্তিগুলো, যত ছোট তত সুন্দর, তত দাম কম।

তা ছাড়া ঐ কালীমন্দিরের ফুটপাথ থেকেই কয়েক বাণ্ডিল সুগন্ধে মাতোয়ারা ধূপকাঠি কিনলাম। একেকটার একেকরকম সৌরভ, হেনা, চামেলি, রজনীগন্ধা, গোলাপ আরও নানারকম চেনা অচেনা গন্ধ।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। মনে আছে, আমেরিকায় গিয়ে সেই ধূপকাঠিগুলো যাঁদের দিয়েছি তাঁরা কেউ কেউ আমার সামনেই সেই কাঠিগুলো জ্বালিয়েছিলেন কিন্তু সেই হেনা-চামেলি, বকুল-চাঁপার গন্ধ কোথায়, সব উবে গেছে, ভালো করে কাঠিগুলো জ্বলছেই না, আবার জ্বালবার আগেই ঝুরঝুর করে খসে পড়ে গেল কতকগুলো কাঠির মশলা।

সবচেয়ে দুঃখের কথা মার্কিন দেশে পৌঁছানোর পরেই এক সান্ধ্যবাসরে

ওই রকম এক বাণ্ডিল ধূপ হাতে গিয়েছিলাম এবং তার পরে যৎপরোনাস্তি অপদস্ত হয়েছিলাম।

আমি নিজের হাতে এক সঙ্গে আট দশটা ধূপ জ্বালিয়ে একটা ফুলদানির মধ্যে গুঁজে দিয়েছিলাম।

সর্বনাশ! সে কী তীব্র, কটু গন্ধ! সেই সেণ্ট্রাল হিটিংয়ের ঘরের জানলা দরজা খুলে, ধূপকাঠিগুলো নিবিয়ে তবে সেই খারাপ গন্ধের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেল।

তবে ওই ঘটনায় আমার বিদেশি নিমন্ত্রণ কর্তা, তাঁর পরিবার এবং অন্যান্য অভ্যাগতেরা কেমন হকচকিয়ে যান এবং সেদিন সারা সন্ধ্যা তাঁরা সকলে আমাকে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত তথা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখলেন। জনৈক লালচুল, নীলচোখ-দুঃসাহসিকা, সেই পূর্ণযৌবনা, আজও তাঁকে ভুলিনি, তিনি আলতো করে আমার চিবুক ধরে বললেন, 'টারা, টারা, এই কাঠিগুলো তুমি নিজে বানিয়েছো?'

প্রাতঃস্মরণীয় শিবরাম চক্রবর্তীর ভাষায় বলতে পারি এই কাঠিন্য আমার মোটেই ভাল লাগেনি, তার চেয়েও খারাপ লেগেছিল বড় ইঁদুরের বা ছুঁচোর মত সাইজের দুটো কুকুর সারা সন্ধ্যা আমাকে অন্তত একশো অথবা দুশোবার অত্যন্ত গোপনে শুঁকে শুঁকে প্রথমে লেজ নাড়া থেকে শুরু করে অবশেষে ঘেউ ঘেউ করে আমার সম্পর্কে তাদের প্রতিবাদ জানানোয়।

বহুবিধ ভণিতার পরে এবার যাত্রা শুরু করি।

শুক্রবার, তেরোই জানুয়ারি, উনিশশো আটাত্তর, সকাল বেলার ফ্লাইটে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে দিল্লি যাত্রা।

এর আগে দিল্লি আমি কয়েকবার গিয়েছি কিন্তু সবই রেলপথে, প্লেনে সেই প্রথম।

সকাল ছ'টায় প্লেন। তখন এয়ারপোর্টে হাঙ্গামা, কড়াকড়ি ছিল না, ঘণ্টা-খানেক আগেই রিপোর্ট করলে হত তার মানে তারও এক ঘণ্টা আগে আমাদের পণ্ডিতিয়া রোডের বাড়ি থেকে বেরোতে হবে। ভোর চারটেয়।

তখনও ই এম বি পি মানে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাই পাস হয়নি, সার্কুলার রোড ধরে মানিকতলা হয়ে বিমান বন্দরে যেতে হত।

১২ জানুয়ারি রাতে মোটেই ঘুম হল না। শুধু আমার ঘুম হল না তাই নয়, আমার ভাই, বউ, ছেলে, কুকুরদ্বয়, মার্জারত্রয়—এই শুই, এই উঠি, এই আলো জ্বালি, এই নেভাই—এই ভাবে রাত দুটোয় পৌঁছিয়ে তারপর অসহনীয় প্রস্তুতি।

ব্যাগ-বিছানা বিকেল থেকেই পরিপাটি বাঁধা ছিল। যা কিছু অসুবিধে হল কোট প্যাণ্ট, জুতো মোজা, আর ওভারকোট মাফলার ইত্যাদি আত্মস্থ করতে। আগেই বলেছি, দুটো ওভারকোটের একটা লাগেজে ঢুকিয়েছিলাম, আরেকটা কাঁধে চড়াতেই হল।

বিমানবন্দরে যথা সময়েই পৌঁছেছিলাম। পৌঁছে দেখি আমার জন্যে লোকে, লোকারণ্য। আমার বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব এমনকি পাড়াপ্রতিবেশীর এত উৎসাহ, যেন রাজ্য জয় করতে যাচ্ছি।

আমার কাস্টমস, পাসপোর্ট হবে দিল্লি বিমানবন্দরে। সুতরাং কলকাতা বিমানবন্দরে আন্তর্দেশীয় যাত্রায় কোনও ঝামেলা হল না।

ডাক পড়তে আমি সকলের কাছে বিদায় জানিয়ে বিমানের দিকে গুটি গুটি রওনা হলাম। একটু একটু ভয় ভয় করছিল, একটু উত্তেজনা। এরই মধ্যে আমার এক প্রবীণ আত্মীয় এসে আমার হাতে একটি ছাতা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "বিলেতে ছাতা ছাড়া চলবে না।" তিনি বছর চল্লিশেক আগে লণ্ডনে বছর দেড়েক ছিলেন, সুতরাং তাঁর আদেশ শিরোধার্য।

বাঁ কাঁধে ভাঁজ করা ওভারকোট, বাঁ হাতে অ্যাটাচি কেস, ডান হাতে ছাতা, শীতের কুয়াশা ভরা সকালে আমি গুটি গুটি আমার স্বপ্নের বিদেশ ভ্রমণের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান, প্যানামের টিকিটের মধ্যে কলকাতা-দিল্লির টিকিটের দাম ধরা ছিল, আর সেই সঙ্গে আয়োজন ছিল দিল্লির অশোকা হোটেলে একদিন রাত্রিবাসের, প্যানামেরই খরচে, সেই সঙ্গে এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে বিনা খরচে যাতায়াতের বন্দোবস্ত।

বিমানের দিকে এগোনোর আগে স্থির হল বিমানের সিঁড়ি দিয়ে উঠে শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে ওই নতুন ছাতাটা ঘুরিয়ে আমি বিদায় বার্তা জানাব যাতে সেটা সকলের নজরে আসে, এরপর প্লেনে ঢুকে যাব।

মিনতি, তাতাই, বিজন মানে আমার স্ত্রী, পুত্র, ভাই এবং আরও বহুজন যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা দর্শক গ্যালারিতে অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু প্লেনে উঠতে কেমন একটু দেরি হওয়ায় বিমানের সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছাতা ঘোরাতে গিয়ে কাউকেই দেখতে পেলাম না। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

পরে শুনেছিলাম সময়ের হিসেবে কি একটা গোলমালে ওই সময়ে ওরা চা খেতে গিয়েছিল।

যথাসময়ে দিল্লি এসে নামলাম। শীতের সকালের কনকনে ঠাণ্ডা, হুহু হাওয়া বইছে আর্যাবর্তের। ওভারকোটটা পরে নিলাম সিঁড়ি দিয়ে নামার মুখে, সেই প্রথম ওভারকোট পরিধান।

স্মৃতি সতত সুখের।

কিন্তু ভ্রমণ সতত সুখের একথা বলা উচিত হবে না, বিশেষ করে আমার এই রচনা পড়ার পরে হয়তো কেউ কেউ ভ্রমণ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবেন।

বহুকাল আগের এক ক্ষুদ্র ভ্রমণলীলা স্মরণ করছি। বিদেশে পৌঁছানোর আগের একটি স্বদেশি ভ্রমণকাহিনী।

জায়গাটা চিরপুরনো দার্জিলিং।

অক্টোবর শেষের দার্জিলিংয়ের কোনও তুলনা হয় না। আমি বিশ্বপরিক্রমার কাহিনী লিখতে বসেছি, তবু একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই শীত-শেষে এবং শীত-শুরুতে কাঞ্চনজঙ্ঘার জঙ্ঘাতলে হিম আভাসিত নীল কুয়াশা ও সতত সঞ্চরমান হালকা মেঘ আচ্ছাদিত সেই শৈলশহর, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

সবারই যেমন হয়, এক পরিচ্ছন্ন সকালবেলায় যথাস্থানে পৌঁছে আরও অনেকের সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘা অবলোকন করছিলাম। তখন সূর্যের সোনালি খেলা শেষ, তা হোক আমরা মুগ্ধ হয়ে শ্বেতশুভ্র তুষার মৌলির অনন্য সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম।

আমার পাশে ছিলেন এক মধ্যবয়সিনী ভদ্রমহিলা। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই সাদা জিনিসটা কী?'

আমি বললাম, 'বরফ। বরফ জমে ওরকম হয়েছে, ওরকম সাদা হয়েছে।'

আমার কথা শুনে মহিলা খুবই আশ্বস্ত হলেন, বললেন, 'তাই বলুন, বরফ। শুধু শুধু অন্য লোকগুলো এটাকে কাঞ্চনজঙ্ঘা বলছে।'

ছয়

লণ্ডন ভায়া দিল্লি

'Pussy cat, Pussy cat
Where have you been ?'
'I have been to London,
To look at the queen.'

'Pussy cat, Pussy cat,
What did you there ?'
'I frightened a little mouse
Under a chair.'

—*Nursery Rhyme*

'পুষি বেড়াল, পুষি বেড়াল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?'
'আমি গিয়েছিলাম লণ্ডনে রানি দেখতে।'
'পুষি বেড়াল, পুষি বেড়াল তুমি কি করলে সেখানে ?'
'আমি চেয়ারের নীচে একটা নেংটি ইঁদুরকে ভয় দেখিয়েছিলাম।'

লণ্ডন আরও একটু দূরে। এখন এক দিনের জন্যে দিল্লি।

প্লেন ছাড়তে ওই অল্প যেটুকু দেরি হয়েছিল, তা ছাড়া নির্বিঘ্নেই দিল্লি বিমানবন্দরে এসে নামলাম।

দিল্লি আমার চেনা শহর। সেখানে আমার যাওয়ার জায়গা অনেক। কিন্তু এবার বিমানটিকিটের দৌলতে আমার জন্যে রাজকীয় বন্দোবস্ত, এক দিনের জন্যে তারকা খচিত অশোকা হোটেলে।

কিন্তু অশোকা হোটেলে যাওয়ার আগে বাক্স, প্যাঁটরা-সমেত বিমানবন্দরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আমি একটা আশ্চর্য কাজ করেছিলাম, বোধহয় বিদেশ যাত্রার উত্তেজনার আতিশয্যে। একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম কলকাতার বাসার ঠিকানায়, যার বক্তব্য ছিল অ্যারাইভড্ সেফলি, অর্থাৎ 'নিরাপদে পৌঁছেছি'।

সেদিন দমদম বিমানবন্দর থেকে আমার বাড়ির লোকেরা সরাসরি পণ্ডিতিয়ার বাসায় ফেরেননি। তাঁরা মানিকতলায় আমার স্ত্রীর পিত্রালয়ে দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করে রাত্রে থেকে আমার শাশুড়ি ঠাকরুণকে সঙ্গে করে পরের দিন সকালে পণ্ডিতিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরে তাঁরা ওই তারবার্তাটি পান।

তারবার্তাটি পেয়েই সবাই বেশ বিস্মিত হয়ে যায়। কারণ সবাই ধরে নিয়েছিল ওই টেলিগ্রামটি আমি পাঠিয়েছি লণ্ডন কিংবা ওয়াশিংটন পৌঁছিয়ে।

দিল্লি থেকে মধ্যপথে নিরাপদে পৌঁছা-সংবাদ পাঠানোর কোনও মানে হয়

না। আবার এদিকে এত তাড়াতাড়ি আমেরিকা তো দূরস্থান লণ্ডন পেঁছনোর কথাও নয়।

আমার মূঢ়তার নিদর্শন স্বরূপ সেই টেলিগ্রামটি আমার স্ত্রী এখন পর্যন্ত সযত্নে রেখে দিয়েছেন। এই সেদিনও অন্যান্য কাগজপত্র ঘাটতে গিয়ে ওই নিরাপদ যাত্রাবার্তাটি চোখে পড়ল।

সে যা হোক, দিল্লি এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে চাণক্যপুরীতে অশোকা হোটেলে চলে এলাম। ট্যাক্সি ভাড়া আমাকে দিতে হল না, অশোকা হোটেলের কাউন্টার থেকে ট্যাক্সিওয়ালাকে একটা ভাউচার দিয়ে দিল, যেটা দেখিয়ে পরে ট্যাক্সিওয়ালা টাকা তুলে নেবে এবং সেই সঙ্গে ট্যাক্সিকে বলেও দেওয়া হল কখন এসে আমাকে হোটেল থেকে তুলে নিয়ে যেতে হবে। ব্যবস্থা চমৎকার। ট্যাক্সিচালকেরা এ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং ভাড়ার হার মিটার রেটের চেয়ে ঢের বেশি হওয়ায় তারা সানন্দেই এই কাজ করে।

মার্কিন যাত্রার আগে আমি সস্তার একটা কালো অ্যাটাচি কেস কিনেছিলাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরেছি সেই দমবন্ধ ভারী ওজনের বাক্স হাতে। ডান হাতের তালুতে কড়া পড়ে গিয়েছিল সেই বাক্স টেনে, হাতটা একটু লম্বাও হয়ে গেছে সেই থেকে। ফুল হাতা শার্ট বানাতে গেলে এরপর থেকে দরজিকে বলে দিই বাঁ হাতের চেয়ে ডান হাতের হাতা আধ ইঞ্চি বেশি লম্বা হবে। দরজি মহোদয়েরা কিন্তু অবাক বা বিচলিত হন না। ভারী ব্যাগ টেনে টেনে সেলস পার্সন, মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ, আন্তর্জাতিক পর্যটক, পরীক্ষক, অধ্যাপক অনেকেরই নাকি ডান হাত বাঁ হাতের চেয়ে লম্বা।

এই অ্যাটাচি কেসটার প্রসঙ্গ এই মুহূর্তে এল এই কারণে যে প্রবাস থেকে ফিরে আমি আর জীবনে এক দিনও ঐ বাক্সটি ব্যবহার করিনি।

যা কিছু কাগজপত্র, চিঠি, ফটো, পাসপোর্ট, টুরিস্ট লিটারেচার এমনকি বিমানটিকিটের কাউন্টার ফয়েল, হোটেলের ভাউচার, রেস্তোরাঁর বিল সব ওই কালো বাক্সের মধ্যে ভরে বন্ধ করে রেখেছিলাম। তার মধ্যে গোপনীয় ব্যক্তিগত কিছু কাগজপত্রও রয়েছে, তার অধিকাংশই চিঠি।

বাক্স খুলে এই মাত্র দেখতে পাচ্ছি একাধিকা মেম রমণীর রঙিন, সুবাসিত এয়ারোগ্রাম বা খামে ভরা চিঠি। এগুলি যে ঠিক প্রণয়পত্র তা নয়, কিন্তু বড় বেশি ব্যক্তিগত। তবে এরই পাশাপাশি রয়েছে পাপনাশক অনেকগুলি হৃদয় বারতা, যেগুলি আমার স্বরচিত এবং যার সবই প্রবাস থেকে আমার প্রাণাধিকা স্ত্রীকে, মিনতিকে লেখা।

চিঠির তাড়ার মধ্যে দিল্লি থেকে লেখা দুটো চিঠি পাচ্ছি। একটি মিনতিকে লেখা, আরেকটি ছেলে তাতাইকে লেখা, দুটোই সকালবেলায় লেখা এবং এই সূত্রে স্মরণীয় যে এর একটু আগে টেলিগ্রামও পাঠিয়েছি।

পত্রবাহিত দাম্পত্য আলাপের একটা ব্যক্তিগত মর্যাদা আছে, পবিত্রতা আছে, বুদ্ধদেব বসুর কবিতার ভাষায় 'শুধু তাই পবিত্র যা ব্যক্তিগত।'

দাম্পত্যপত্র প্রেমপত্রের মতো হয়তো রোমাঞ্চকর নয়। আমি সামান্য

ঘরগৃহস্থ। এ বিষয়ে কথা বলার আমার অধিকার নেই।

শুধু এইটুকু জানি যে দাম্পত্যপত্র সব সময় একই রকম হয়, অনুরাগের চেয়ে সেখানে কাজের কথা বেশি, প্রণয়ের চেয়ে তার মধ্যে অনেক বেশি থাকে সাদামাটা সংসারী আলাপ। টুকটাক ছোটখাট প্রয়োজন অপ্রয়োজনের কথা।

সে যা হোক, মাননীয়া স্ত্রীকে যে চিঠিটি দিয়েছিলাম সেটা এই মুহূর্তে খুব একটা কাজে লাগছে না।

বরং তাতাইকে লেখা পত্রটিতে অনেক তথ্য আছে এবং সেই সূত্রে যে সব কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম এখন মনে পড়ছে।

মনে পড়ছে ট্যাক্সিতে করে অশোকা হোটেলে যাওয়ার পথে বেশ দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত ছিলাম এই ভেবে যে সত্যিই ওই হোটেলে আমার থাকবার জায়গা আছে কি না। ট্যাক্সি ভাড়াও হোটেল থেকে দিয়ে দেওয়ার কথা, সেটা দেবে কি না।

কিন্তু হোটেলে পৌঁছে দেখতে পেলাম আমার আশঙ্কা অমূলক। সেখানে আমার নামে ঘর বুক করা আছে এবং ট্যাক্সি খরচের বন্দোবস্তও ঠিকমত করা আছে।

হোটেলের ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র রেখে একটু মুখ-টুখ ধুয়ে নিয়ে আরাম করে বিশাল বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম এবং তখনই দুশ্চিন্তার বোঝা সাময়িকভাবে লাঘব হওয়ায় বুঝতে পারলাম খিদে পেয়েছে। তখন আমি সদ্য স্থূলাকার ধারণ করতে শুরু করেছি, সোজা কথায় মোটা হচ্ছি। পেটের মধ্যে দিবানিশি রাবণের চিতা জ্বলছে। রাত সাড়ে দশটায় ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ার পর রাত তিনটেয় খিদের জ্বালায় ঘুম ভেঙে উঠে বসেছি এবং প্রবল মনের জোরে নিজেকে নিবৃত্ত করেছি সামনের তেপায়ার ওপর বসানো টিফিন বাক্সটি খুলে সাবাড় করার লোভ থেকে। ঐ টিফিন বাক্সটি আমার পুত্রের। অনতিদূর উষালগ্নে দিনরাতের আলো আঁধারিতে তার স্কুল বাস মোড়ে এসে হর্ন দেয়, তাই রাতে শোয়ার আগেই মিনতি বাক্সটি সাজিয়ে রাখে, এক টুকরো পাঁউরুটি, একটুকু রসগোল্লা, একটা কলা বা ডিম সেদ্ধ—তেমন লোভনীয় খাবার কিছু নয়। কিন্তু তখন আমার শুধু খাই-খাই।

এই সূত্রে একটা অপ্রাসঙ্গিক দৃশ্য মনে পড়ছে। কিন্তু তার আগে একটা জিনিস কবুল করে নিই। বুকে হাত দিয়ে বলছি, নিজের বুকে হাত দিয়ে বলছি, যতই লোভী হই, জিবের নোলা যতই সপসপ করুক, কোনও দিন ছেলের টিফিন চুরি করে খাইনি।

তবে পুনরায় ভ্রমণকাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করার আগে অপ্রাসঙ্গিক দৃশ্যটি একটু স্মরণ করি।

ব্যাপারাটা আর কিছুই নয়। নিতান্ত শিশুদের ব্যাপার।

সেই শেষ রাতের আলো-আঁধারিতে তাতাইকে স্কুলবাসে তুলতে যেতাম গলির মোড়ে।

সেই মোড় থেকে চারপাঁচটা রাস্তা বেরিয়েছে। সঙ্গে কিছু উপরাস্তা, উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমে এমনকি ঈশানে, নৈঋতে।

এই সমস্ত পথই পৌঁছে দিয়েছে কোনও-না-কোনও নামী বা দামি কিংবা উভয়ত নামী দামি বিদ্যামন্দিরে এবং সেই প্রায়সকালে বাসবাহী, অভিভাবকের সঙ্গে পদাতিক এই রকম অসংখ্য শিশুর পরেও বহু শিশু স্কুলে যেত রিক্সাবাহিত হয়ে।

প্রতিদিন দেখতাম রিক্সাগামী শিশুরা প্রায় অনেকেই স্কুলের পথে যেতে যেতে তাদের টিফিন বাক্স খুলে খাবার খেয়ে নিত স্কুলে যাওয়ার আগেই।

এ বিষয়ে কোনও কোনও রিক্সাওয়ালার ছিল ঘোর আপত্তি, সে জানাত ওই খাবারটা রিক্সায় চড়ে খাওয়ার জন্যে নয়। শিশুটি এই মাত্র বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছে, এখন তার খাওয়ার দরকার নেই, এ খাবার খেতে হবে স্কুলে পড়াশুনোর মাঝখানে, টিফিন নামক অলৌকিক সময়ে।

রিক্সাওয়ালা এত সব কঠিন ব্যাপার কি করে জানল, বুঝল, কে জানে? তার চৌদ্দ পুরুষে কেউ কোনও দিন স্কুলে যায়নি, টিফিন খায়নি।

কিন্তু বারবার বহুবার দেখেছি দেহাতি ওই রিক্সাচালক পেছন দিকে মাথা না ঘুরিয়ে টের পেয়ে গেছে তার শিশুসওয়ারি আগেভাগে, স্কুলে যাওয়ার আগেই টিফিন খেয়ে নিচ্ছে।

তখন তার কি তড়পানি, 'আভি মৎ খাও। স্কুলমে কেয়া খায়েগা। বেওকুব...' ইত্যাদি কলকাত্তাই হিন্দিতে সে শিশুটিকে খাদ্যাভ্যাস শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করত।

(সেই উনিশশো আটাত্তরের শিশুটি এখন পূর্ণযুবক, জানি না, সেই দেহাতি রিক্সাওয়ালার কথা তার মনে আছে কিনা?)

তখন আমার বয়েস একচল্লিশ। বেয়াল্লিশের দিকে ধীর পায়ে যাচ্ছি। খাদ্যাভ্যাস শিক্ষার বয়েস তখন আমি অতিক্রম করে গেছি।

কিন্তু খিদের হাত থেকে তো পরিত্রাণ নেই। মনে পড়ছে না, কিন্তু নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে দিল্লিগামী বিমানে ভালো ব্রেকফাস্ট দিয়েছিল।

এই তো সেদিনও খেলাম সকালের বিমানে। চমৎকার একটা ফ্রায়েড টমাটো (টমাটোও যে পোড়ানো যায়, কে জানত), আরও একটু সেদ্ধ হলেও হতে পারত এমন একটা গোল আলু। স্যাণ্ডউইচ যা খেলেই বোঝা যায় হিন্দিতে কেন একে বলা হয় 'বালুটা ডাকিনী' এবং সর্বোপরি একটি মিষ্টি। বিশাল, বিস্তৃত এক রঙদার কাগজের আবরণে আচ্ছাদিত সার্কাসের জোকারের নাকের নকল বলের মত সপ্রতিভ এবং ছোটো সেই মিঠাই।

এসব খেলেও পেট অনেকটা ভরে, ভালই ভরে। কিন্তু সেই উনিশশো আটাত্তরে আমার সে কি সর্বগ্রাসী খিদে।

অশোকা হোটেলে ঘরে ঢুকে আমার বেশ ভালো লেগেছিল। এর আগে আমি ইতস্তত সার্কিট হাউসে, ডাকবাংলোয় সরকারি কাজে থেকেছি। বড় হোটেলেও গিয়েছি দু চারবার কিন্তু কখনও থাকা হয়নি।

অশোকা হোটেলের ঘরে থাকব মাত্র চৌদ্দ ঘণ্টা তবুও বেশ পছন্দ হল বাসস্থান। দেয়াল থেকে দেয়াল কার্পেট, ঘরের মধ্যে ফ্রিজ রয়েছে, টেলিফোন,

বাথরুমে ঝকঝকে বাথটব, শাওয়ার, গরম ও ঠাণ্ডা জল, একটা বসার জায়গা সোফা সেট। ঘর সংলগ্ন, বাথরুমে ঢোকার মুখে ড্রেসিং টেবিল, এমনকি ঘরের মধ্যে লেখার টেবিল, চেয়ার। টেবিলের ওপর হোটেলের নামাঙ্কিত খাম-প্যাড, স্টেশনারি।

এ সব কেমন হাভাতের কথার মত শোনাচ্ছে। কিন্তু নিশ্চয় খুবই চমৎকৃত হয়েছিলাম সে সময়ে, কারণ আমার ছেলেকে লেখা চিঠিতে এই সব বর্ণনা পাচ্ছি।

সেই চিঠি পড়েই জানতে পারছি, ভীষণ খিদে পেয়েছিল। হোটেল থেকে খাবার বিনে পয়সায় দেবে কিনা জানি না। আবার ওই দামি হোটেলের খাবার কিনে খাওয়ার ক্ষমতাও আমার নেই।

কলকাতা থেকে সাকুল্যে দেড়শো টাকা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। তার মধ্যে চৌষট্টি টাকা রাস্তা খরচা বাবদ ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কিনি আট ডলারের জন্য ব্যয় করেছিলাম। অবশ্য ভ্রমণ খরচ বাবদ একটা চল্লিশ ডলারের ট্র্যাভেলারস চেকও ছিল। কিন্তু সেটা ভাঙাবার মত বুদ্ধি বা সাহস ছিল না।

হোটেল থেকে চিত্তরঞ্জন পার্কে মিহিরকে ফোন করি। মিহির মানে মিহির রায়চৌধুরী, তার স্ত্রী বনানী, এরা আমাদের নিজের লোক। দিল্লিতে আমাদের সবরকম দেখাশোনা, যত্নআত্তি করা এই দম্পতির সবচেয়ে পছন্দসই কাজের মধ্যে পড়ে। মিহিরের মত ধান্দাহীন, সরল ও সুনির্মল মানুষ খুব কম।

মিহিরকে আগেই জানানো ছিল, তাকে ফোন করে বললাম, খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে, আমার জন্যে কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে হোটেলে এত নম্বর ঘরে চলে এসো।

মিহির অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'হোটেলে খাবার নিয়ে যাব?'

এবং পনেরো মিনিটের মধ্যে মিহির এসে গিয়েছিল কোনও রকম খাবার না নিয়েই। এসেই বলল, 'খাবার আনতে হবে কেন? হোটেল থেকেই নিশ্চয় খাবার দেবে।' এই বলে আমার টিকিট নিয়ে উঠে হোটেলের রিসেপশনে চলে গেল। পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এল মুখে বিজয়ীর হাসি নিয়ে, 'ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার তিনটেই আপনি পাবেন। ব্রেকফাস্ট এখনই আসছে।'

অল্পক্ষণের মধ্যে সত্যি সত্যি বেশ দশাসই ব্রেকফাস্ট এল। আমি আর মিহির দুজনে দিল্লি চরতে বেরোলাম, সেই খাবার ভাগ করে খেয়ে।

এবারই দিল্লিতে একটা জিনিস লক্ষ করি এবং সেটা আমি তাতাইকে চিঠিতে লিখেছিলাম কারণ আমার কেমন একটু খটকা লেগেছিল, একটু অস্বাভাবিক। দিল্লির রাস্তায় সেই সময় ইস্কুলের ছেলে মেয়েরা হাত দেখিয়ে অচেনা গাড়ি থামিয়ে ইস্কুল যাতায়াতের পথে লিফট নিত। যে কোনও খালি গাড়ি যেতে দেখলেই হাত তুলত তাদের তুলে নেবার জন্যে। গাড়ি চালকেরা বোধহয় স্কুলের পোশাক দেখে বুঝত পারত বিদ্যালয়টি তাদের পথে পড়ছে কি না এবং অনেকে সানন্দেই ছেলেমেয়েদের গাড়িতে তুলে নিচ্ছে দেখলাম।

তখন তাতাইয়ের স্কুলে যেতে খুব হাঙ্গামা হত, তাতাইয়ের স্কুল ছিল বাড়ি থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে কিন্তু স্কুলবাসে উঠতে হত স্কুলের সময়ের দুঘণ্টা আগে।

দিল্লির ব্যাপারটা আমাকে চমৎকৃত করেছিল এবং তাতাইকে লিখেছিলাম 'মনে হচ্ছে দিল্লিতে ছেলেধরা নেই।'

কিন্তু এর কিছুকাল পরেই একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছিল। কারও-কারও হয়তো মনে থাকতে পারে সেই রঙ্গা-বিল্লার নৃশংস বৃত্তান্ত। যারা দুটি স্কুলযাত্রী ছেলেমেয়েকে, বোধহয় সে দুজনের নাম ছিল সঞ্জয় আর গীতা চোপরা, ভাইবোন, গাড়িতে তুলে নিয়ে খুন করে।

সারা দেশে খুব হইচই হয়েছিল ঘটনাটা নিয়ে। সঞ্জয়-গীতার বাবা উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী ছিলেন। এর পরেই দিল্লিতে ছাত্রছাত্রীদের ওইভাবে অচেনা গাড়িতে লিফট নেওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

কিছুকাল পরে রঙ্গা-বিল্লাও নাটকীয়ভাবে এক রেলগাড়ির কামরায় ধরা পড়ে। বিচারে তাদের উপযুক্ত সাজা হয়েছিল।

বিলেত আমেরিকায় হিচহাইকিং ব্যাপারটা যথেষ্টই প্রচলিত আছে। সেখানে কখনও কদাচিৎ এর বিপরীত ব্যাপারটা ঘটে। গাড়ির চালক ভদ্রতা করে হিচহাইকারকে গাড়িতে তুলে বিপদে পড়ে যান। হয়তো লোকটা মারাত্মক খুনে বা ডাকাত। ভদ্রতা করে গাড়িতে তুলে চালক সর্বস্বান্ত হয়েছেন, প্রাণও দিয়েছেন এমন উদাহবণ আছে।

গাড়ি নির্জন রাস্তায় পৌঁছালেই ছদ্মবেশী হিচহাইকার স্বমূর্তি ধারণ করে, ছোরা বা রিভলভার বার করে বসে, তখন আর পরিত্রাণ নেই।

অশোকা হোটেলে দুপুরে বিনিপয়সার লাঞ্চ খাওয়া হল না। সারাদিন দিল্লি শহরে ঘুরে ফিরে সন্ধেবেলায় বনানীর রান্না খেয়ে মিহিরের বাড়ি থেকে মিহিরকে সঙ্গে করে হোটেলে চলে এলাম।

প্যানামের বিমান ফ্লাইট নম্বর শূন্য শূন্য এক ভোর পাঁচটায় দিল্লি থেকে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করবে। আমি হোটেলের ঘর থেকে বেরোব রাত আড়াইটেয়। ততক্ষণ পর্যন্ত মিহির আমার সঙ্গে হোটেলে থাকবে। কিন্তু মিহিরের এই রাত্রিবাসের জন্যে অতিরিক্ত ঘরভাড়া দিতে হবে কিনা সেই ভয়ে দুজনে আগাগোড়া অস্বস্তিতে রইলাম।

ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তবু বারান্দায় সামান্য পায়ের শব্দ অথবা কণ্ঠস্বর শোনা গেলে মিহির ছুটে গিয়ে বাথরুমে দরজা বন্ধ করে আত্মগোপন করেছে।

মিহির আর আমি বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখি আমার জন্যে অনেক লোক সেখানে। চিত্তরঞ্জন পার্কের যে যুবকদের সঙ্গে সারাদুপুর আর সন্ধ্যায় আড্ডা দিয়েছি তারা দল বেঁধে এসেছে।

আমাকে বিদায় জানানোটা উপলক্ষমাত্র। আসলে এই ছলে একটু হইহল্লা করা।

হইহল্লা ভালই হল। তারপর ধীরে ধীরে বন্দরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম চেকিংয়ের জন্যে। কাস্টমস, পুলিশ। তখন সিকিউরিটির কোনও ঝামেলা ছিল না। ঝামেলা হয়েছিল আমার ওভারকোট ইত্যাদি নিয়ে, সে কথা আগেই লিখেছি।

মিহিররা রয়ে গেল। শেষবার কাঁচের আড়াল থেকে হাত নেড়ে আমি বিমানের দিকে এগিয়ে গেলাম।

বাস নেই। রানওয়ে দিয়ে হেঁটে গিয়ে প্লেনে চড়তে হবে। হঠাৎ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি সন্নিহিত সেই শেষ রাতে খোলা রানওয়েতে হুহু ঠাণ্ডা বাতাসে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বিমানে গিয়ে উঠলাম।

এর অল্পদিন পরেই কানাডা সীমান্তে তুষারাবৃত শহর বাটাভিয়ায় দুদিন থেকেছি, নিউ ইয়র্কে বরফ ঝড়ে পড়েছি। কিন্তু আর্যাবর্তের সেই হিমশীতল উত্তর বাতাসের মত শীত আর কখনও অনুভব করিনি। তার কারণ বোধহয় এই যে এজন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

প্লেন ঠিক সময়েই ছাড়ল। আর সাড়ে সাত ঘণ্টা পরে লণ্ডন।

সাত

বিলেত দেশটা মাটির

'...Unreal city,
Under the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge...'

—*T. S. Eliot*

'...অবাস্তব শহর,
এক শীতের ভোরবেলায় বাদামি কুয়াশার নীচে
জনতা উপচিয়ে পড়ল লণ্ডন ব্রিজের ওপরে...'

—টি এস এলিয়ট

ভোর ভোর শেষ রাতে দিল্লি ছেড়েছিলাম। লণ্ডন এসে পেঁছিলাম সকালবেলাতেই। ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের লণ্ডনের মত সেই শীতের সকালে, সৌভাগ্যের কথা, শহর বাদামি কুয়াশায় ঢাকা ছিল না।

বিমান বন্দরের ভিতরে অবশ্য বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু লণ্ডনে নামার সময়ে প্লেনের জানালা দিয়ে লক্ষ করছিলাম, সুন্দর রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন। প্রায় আমাদের শরৎকালের মতো আকাশে হালকা মেঘের চপলতা। মধ্য জানুয়ারির লণ্ডন শহরে এটা প্রায় অস্বাভাবিক ব্যাপার। বিমান চালক অবতরণকালীন তাঁর সৌজন্যবার্তায় এই কথা উল্লেখ করেছিলেন বলে মনে পড়ছে।

দিল্লি থেকে লণ্ডনের সময়, যেটা হল গ্রিনউইচ (মতান্তরে গ্রিনিচ) টাইম, সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পিছনে। সকালশেষে প্রায় দুপুরের আগেই এসে গেছি। পথে বিমান প্রথমে তেহরানে এবং পরে ফ্রাংকফুর্টে থেমেছিল, তার জন্যে ঘণ্টা দুয়েক সময় গেছে, না হলে আটটা-নটার মধ্যে এসে যেতাম।

এক সময়ে, এই শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত বলা হত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, ব্রিটিশ রাজার রাজত্বে সূর্যাস্ত হয় না।

তখন ইংরেজ রাজত্ব সারা পৃথিবীর আনাচে কানাচে শুধু ভারত-বর্মা-সিংহল নয়, উত্তর আমেরিকায়, মধ্য প্রাচ্যে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়, আফ্রিকায় এমন কি দক্ষিণ গোলার্ধে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। যখন ব্রিটিশদের শাসিত এক রাজ্যে সূর্য ডুবছে, অন্য জায়গায় সূর্য উঠছে। একখানে সূর্যাস্ত হচ্ছে, অন্যত্র সূর্যোদয়। তাই কথিত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত নেই।

কথাটার মধ্যে অবশ্য অন্য একটা উপনিবেশীয় তাৎপর্য ছিল, ব্রিটিশ মহিমার জয়গান ছিল।

আর সেই জন্যেই বোধহয় এক জার্মান ভদ্রলোক রসিকতা করে বলেছিলেন, যে এটা মানুষদের পক্ষে খুবই সুখবর যে ব্রিটিশ রাজত্বে সূর্যাস্ত হয় না,

কারণ ব্রিটিশদের মোটেই বিশ্বাস করা যায় না, সূর্যাস্তের পরে অন্ধকারের মধ্যে তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, সূর্যাস্ত হলে প্রজাদের জীবন, সম্পত্তি আর ইজ্জত নিরাপদে থাকবে না।

দিল্লির শেষ রাতে রানওয়ে দিয়ে হেঁটে বিমানের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় সেই টের পেয়েছিলাম ঠাণ্ডা কাকে বলে। ওভারকোট, গলাবন্ধ কোট, সোয়েটারে সারা শরীর ঢেকেও আর্যাবর্তের হুহু উত্তুরে বাতাসে সূচ্যগ্র ঠাণ্ডার তীক্ষ্ণ ফলা চোখে মুখে বিঁধে গিয়েছিল।

এর আগে পর্যন্ত ঠাণ্ডা, শীতের ঠাণ্ডা সম্পর্কে আমার কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। একবার বালক বয়েসে মাঘ মাসের মধ্য রাতে টাঙ্গাইল পার্ক থেকে যাত্রা দেখে ফিরছিলাম। সেই শীতের রাতে অকারণে ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল আর সেই সঙ্গে দূরের ধলেশ্বরীর ঝোড়ো বাতাস। বিন্দুবাসিনী স্কুলের পিছনের দিকে মড়াকাটা ঘরের পাশ দিয়ে রাস্তা, এমনিতেই ভূতের ভয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে, সঙ্গে অনেক লোকজন তবুও, তার ওপরে জমাট ঠাণ্ডার ধাক্কা, সেটাই ছিল আমার শীতলতম স্মৃতি। বহুদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী স্কুলের পিছনের এই পার্কেই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডা পড়ে।

দিল্লিতে সেই ভুল ভেঙেছিল। কিন্তু ঠাণ্ডা বিষয়ে ভুলভাঙার সেটাই শুরু। সেই শীতকালে তারপরে শূন্যের অনেক নীচে পারদ নেমে যাওয়া স্থান থেকে স্থানান্তরে ঝড়, বৃষ্টি, তুষারে ঠাণ্ডার ব্যাপারটা আমি ভালই টের পেয়েছিলাম।

স্মরণ থাকলে, লেখার সময় মনে পড়লে সে সব কথা যথাস্থানে বলা যাবে।

আপাতত দিল্লি থেকে প্যান অ্যামের বিমানে উঠেছি। বাইরের হিমশীতলতা থেকে বিমানের কবোষ্ণ গহ্বরে ঢুকে খুবই স্বস্তি হল।

এর আগে বিমানে সামান্যই চড়েছি, কলকাতা-ঢাকা, ঢাকা-যশোহর, একবার বাগডোগরায় আরেকবার বাংলা দেশ যুদ্ধের সময় আর্মির বিমানে আসাম সীমান্তে মেঘালয় ঘেঁষে ব্রহ্মপুত্রের তীরের এক অস্থায়ী ফৌজি বিমান-ঘাঁটিতে নেমেছিলাম বাংলাদেশ থেকে পলাতক আমার ভাই-মা-বাবা-মাতা-মহীদের নিয়ে আসার জন্যে।

কিন্তু সেগুলো সামান্য বাহন। প্যান আমে ঢুকে দেখলাম এলাহি ব্যাপার। দিল্লি বিমানবন্দরে আমার বেশ সময় লেগেছিল আইনরক্ষকদের বাড়াবাড়িতে, অনেকেই আমার আগে বিমানে উঠে গেছে। আমি উঠে দেখি, কথায় বার্তায় গমগম করছে একটা অতিকায় হলঘরের মতো বিমানের অভ্যন্তর। বিয়েবাড়ি বা পার্টিতে যেররকম হয় সুবেশ, সুসজ্জিত পুরুষনারীতে, সাহেব-মেমসাহেব, উচ্চকোটির নোটিভে, আতর-পারফিউমের গন্ধে ভরপুর সেই ছোট পৃথিবীতে সারা বিশ্বের নানা চেহারার, আরও নানা জাতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা।

বিমানে উঠে অবশ্য আমি একটু নিরাশ হয়েছিলাম, অন্য এক কারণে, আমাকে জানলার পাশে সিট দেওয়া হয়নি। বিমানবন্দরে প্লেন কোম্পানির কাউণ্টারে টিকিট দিয়ে যদি জানলার সিটের কথা বলতাম তা হলে হয়তো পেতাম, কিন্তু তা তো বলা হয়নি। জিনিসটা ভাবিইনি।

সে যা হোক, ঐ কাউণ্টারেই জানতে চেয়েছিল স্মোকিং না নন-স্মোকিং জোন। সেই সময়েই ধূমপানের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সব বিমানের মধ্যে ধূমপায়ীদের জন্যে আলাদা এলাকা করা হয়েছে ; এ নিয়ে কাগজপত্রে অল্পবিস্তর লেখালেখিও হয়েছে।

আজ দশ-পনেরো বছর আমি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কখনও শখ করে বা মনের ভুলেও, অনুরোধে উপরোধেও একটা সিগারেট খাই না। অথচ এক সময় আমি দৈনিক তিন চার প্যাকেট চারমিনার সিগারেট খেতাম, আর সে কি খাওয়া, তর্জনী ও মধ্যমার মধ্যে সিগারেটটা আঁকড়িয়ে ধরে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে গাঁজার কলকের মতো চড়া টানে সিগারেট ভস্মীভূত করতাম, কড়া তামাকের ঘন ধোঁয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে, তালুতে, কণ্ঠনালিতে, ফুসফুসে একসঙ্গে ধাক্কা দিত।

আগেই লিখেছি, একদিন হঠাৎই সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিই। এখন আর শত প্রলোভনেও সিগারেট খেতে ইচ্ছে হয় না। আমার ছেলে তাতাই বিদেশ থেকে আসার সময় বাক্স বাক্স বিলিতি সিগারেট নিয়ে আসে, যেগুলো এক সময়ে স্বপ্নের ব্যাপার ছিল। কিন্তু এখন তার একটাও স্পর্শ করি না।

সে যা হোক, তখন আমি চরম ধূমপায়ী। কলকাতা থেকে বিশ প্যাকেট সিগারেট হাত বাক্সে ভরে নিয়েছিলাম। তার প্যাকেট পাঁচেক দিল্লিতেই খরচ হয়েছিল। একা মিহির দু' প্যাকেট খেয়ে নেয়। তখনও পনেরো প্যাকেট আছে। ধূমপায়ীদের এলাকায় বসে প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে দেখি বিদ্যুৎ সঙ্কেত জ্বলে উঠেছে, 'সিগারেট নেবাও', 'সিট বেল্ট বাঁধো' ইত্যাদি।

অর্থাৎ এখনই বিমান ছাড়বে। অনুরূপ ঘোষণা বিমানের মাইকেও প্রচারিত হল।

প্যান আমের বিমানে উঠে যে দুটো জিনিস আমাকে আকৃষ্ট করেছিল তার একটা হল বিখ্যাত সব পানীয়ের ছোট ছোট মিনিয়েচার দুই আউন্সের শিশি। প্রত্যেকটার দাম পঞ্চাশ সেণ্ট, আধ ডলার। কিন্তু সে জিনিস কেনার ডলার সেণ্টের মুদ্রা আমার মানিব্যাগে ছিল। তাতাই তখন নানা দেশের কয়েন জমাত, কার কাছ থেকে যেন ও দুটো চেয়েচিন্তে এনেছিল, আসার আগে আধুলি দুটো তাতাইয়ের কয়েন বাক্স থেকে চুরি করে নিয়ে এসেছিলাম, তবে মনে মনে ঠিক করেছিলাম ফিরে আসার সময় অন্তত তিনটি মার্কিন আধুলি নিয়ে আসব, সুদ সমেত ফেরত দেব।

সেই আধুলি দুটো দিয়ে দুটো ভ্যাট সিক্সটি নাইন খেলনা বোতল কিনলাম। সেই মিনিয়েচার শিশিদুটো আমার হাত ব্যাগে আমার সঙ্গে সারা

পৃথিবী ঘুরেছিল। যদি চুরি না গিয়ে থাকে তবে আমাদের বাসায় কোথাও কোনও আলমারিতে, ড্রয়ারে এখনও নিশ্চয় ভ্যাট সিক্সটি নাইনের নমুনা শিশি দুটো আছে।

এই সূত্রে একটা পুরনো রসিকতা মনে পড়ছে।

'নীল দিগন্তে তখন ম্যাজিকে'র বুদ্ধিমান পাঠক এবং কল্যাণীয়া পাঠিকারা ইতিমধ্যে নিশ্চয় বুঝে গিয়েছেন এটা নিছক ভ্রমণকাহিনী নয়। আমার পল্লবগ্রাহী তরল স্বভাবের দোষে অনেক গল্পগুজব এর ভিতরে প্রবেশ করেছে।

ভ্যাট সিক্সটি নাইনের গল্পটাও বলে ফেলি।

একদা এক মদ্যপান নিবারণী চিকিৎসক দাবি করেছিলেন যে তিনি তাঁর রোগীদের শুধু মদ খাওয়া ছাড়িয়েছেন তা নয়, তিনি তাঁদের চিন্তাধারাও আমূল পালটে দিয়েছেন।

সাংবাদিকদের যেমন স্বভাব, সব কিছুই যাচাই করতে চান, তাঁরা সেই চিকিৎসক সাহেবকে বললেন, 'প্রমাণ চাই। প্রমাণ দিতে হবে।'

অবশেষে ডাক্তারবাবুর 'সুরা নিপাতন স্নেহ নিকেতন' নামক শহরতলির নার্সিংহোমে একদা প্রভাতকালে মাননীয় সাংবাদিক মহোদয়দের তিনি আহ্বান করলেন।

কিন্তু সাংবাদিক মহোদয়েরা সকালের দিকে কোথাও যাওয়া পছন্দ করেন না।

সেদিন মাত্র চারজন সাংবাদিক এসেছিলেন। সামান্য এক পেয়ালা কালো কফি খেয়ে তাঁরা সেই আশ্চর্য সকালে যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন, সেই বাক্যালাপ ঃ

ডাক্তার পি. কে আয়া : আমার সামনে যাকে দেখছেন তিনি মিস্টার পি. কে. থা ; এক সময় বোতলের পর বোতল ওড়াতেন। এখন মদ কাকে বলে জানেন না।

জনৈক সাংবাদিক : প্রমাণ কি ?

ডাক্তার পি. কে. আয়া : প্রমাণ ? এখনই দেখাচ্ছি। (এই বলে ডাক্তার পি কে আয়া একটা ভ্যাট সিক্সটি নাইনের শূন্য বোতল হাতে তুললেন)

জনৈক সাংবাদিক : ওটা আবার কি ? ফাঁকা বোতল দেখছি।

ডাক্তার পি. কে. আয়া : তা হোক, এতেই প্রমাণ হবে। মিস্টার পি. কে. থা, আপনি বলুন দেখি এই বোতলের গায়ে কি লেখা আছে ?

পি. কে. থা : ভ্যাট সিক্সটি নাইন।

ডঃ পি. কে. আয়া : ভ্যাট সিক্সটি নাইন মানে কি ?

পি কে থা : (একটু চিন্তা করে) ভ্যাটিকান থেকে ভ্যাট। ভ্যাট সিক্সটি নাইন, ওটা খুব সম্ভব সদামান্য পোপের টেলিফোন নম্বর।

সাংবাদিকরা সমস্বরে হেসে উঠলেন।

ডাঃ পি. কে. আয়া : হাসবেন না। হাসার ব্যাপার নয়। দেখলেন তো

আমার রোগী জিনিসটা যে মদ তা পর্যন্ত ভুলে গেছে।

নিতান্ত বাজে গল্পে অনেকটা জায়গা নষ্ট হল, এবার আবার ভ্রমণে প্রবেশ করি।

প্যান অ্যামের বিমানের কথা প্রসঙ্গে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিলাম। এখন বিমানের ভিতরের কথায় যাই।

ওই বিমানে দ্বিতীয় যে জিনিসটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেটা হল ভিডিও সিনেমা। এর আগে টিভি একটু আধটু দেখেছি কিন্তু ভিডিও মোটেই দেখিনি। এর পরেও যে খুব দেখেছি তাও নয়।

ভিডিওতে কি কি চলচ্চিত্র দেখা যেতে পারে তার একটা তালিকা দেয়া ছিল, তাই নিয়েই গোলমাল বাধল। একজন যাত্রী যদি বলেন এ বইটা দেখাতে হবে দুজন যাত্রী দাবি করেন অন্যটা এবং তৃতীয় একদল যাত্রী চান আবার অন্যটা।

যতদূর মনে পড়ে ওই তালিকায় উডি অ্যালেনের একটা ছবি ছিল সম্ভবত 'প্লে ইট এগেইন স্যাম', যাতে উডি অ্যালেন এবং ডায়ানা কিটন দুজনেই অভিনয় করেছেন। বোধ হয় উডি অ্যালেনের বইয়ে ডায়না কিটনের সেই প্রথম প্রবেশ।

আমার ইচ্ছে ছিল ওই ছবিটা দেখতে চাই। কিন্তু গোলমাল, বচসা দেখে ভয় পেয়ে কিছু বলতে পারলাম না। তবে একটু পরে আবিষ্কার করলাম উডি অ্যালেনের ছবি দেখালেও আমার কোনও লাভ হত না। কারণ কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। খবর নিয়ে জানলাম শব্দ শুনতে গেলে ইয়ার ফোন নিতে হবে। ফোন বিমান সেবিকার কাছে পাওয়া যাবে, তার জন্য মাত্র পাঁচ ডলার লাগবে। কিন্তু পাঁচ ডলার দিয়ে এই বিলাসিতা করার ক্ষমতা আমার নেই।

শেষ পর্যন্ত কি একটা হালকা হাসির কথোপকথন বহুল ছবি দিয়ে শো শুরু হয়েছিল। সে ছবি দেখা হল, কিন্তু শোনা হল না। আড়াই ঘণ্টা ধরে আমার দু পাশের দুই সহযাত্রী তাঁদের দুই দুই চার কানে চারটি ইয়ার ফোন লাগিয়ে হো-হো করে হেসে গেলেন, মধ্যে দরিদ্র ও হতভাগ্য আমি নির্বোধের মত গম্ভীর মুখে বসে রইলাম।

একটু পরে হাত ব্যাগ খুলে সিগারেট বের করে ধরালাম। তখন নিষেধাজ্ঞা মুছে গেছে, বিমান মধ্য গগনে তেহরানমুখী, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারতের আকাশ সীমানা অতিক্রম করবে।

মধ্যের সিটে বসে জানালা দিয়ে আমি শুধু আকাশ দেখতে পাচ্ছি। পাশের সহযাত্রীর ঘাড়ের পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম বেশ কয়েক মাইল নীচে পুরনো পৃথিবীটাকে কেমন যেন ভূগোলের রিলিফ ম্যাপের মত দেখাচ্ছে।

বিমানযাত্রা বিষয়ে কিছু লিখতে গেলে বিমানে পরিবেশিত খাদ্যের কথাও লিখতে হয়। বিমানযাত্রার বড় আকর্ষণ হল সুখাদ্য। বার বার, প্রচুর পরিমাণে অতি ভাল খাবার, খিদে পাবার আগেই পরিবেশন করা হয়, প্রত্যেক

সিটের সামনে ছোট ফোলডিং টেবিল, যাতে তার উপরে খাবারের প্লেট রেখে খাওয়া যায়।

কোনও কোনও বিমানে বিশেষত উচ্চশ্রেণীতে বিনা মূল্যে পানীয় পরিবেশন করা হয়। সাদা এবং লাল মদিরা, স্কচ হুইস্কি, সব মহার্ঘ পানীয়ই দেওয়া হয়।

আমার ওই যাত্রায় পানীয় অবশ্য বিনামূল্যে বিতরিত হতে দেখিনি তবে খাবার খুব ভালো ছিল।

সাহেবি খাদ্যের স্বাদ সেই আমি প্রথম পেলাম। তেল এবং রান্নার গুণে সিমসেদ্ধ যে এত সুস্বাদু হতে পারে, অত নরম চিকেন ফ্রাই, অত ঘন মেয়নিজ সস, ওরকম সোনালি সবুজ স্যালাড পাতা—বিলিত খাবারের সঙ্গে আমার সেই প্রথম পরিচয়, তার মুগ্ধতাও স্মরণীয়।

তবু একটা দুঃখের কথা বলি। এয়ার হস্টেস, যিনি আমাদের দায়িত্বে ছিলেন, আমাদের খাদ্য পরিবেশন করলেন, তিনি খুব রুক্ষ স্বভাবের ছিলেন। কোনও কারণে তাঁর সন্দেহ হচ্ছিল আমি ঐ বিমান চড়ার যোগ্য নই, ফোকটে যাচ্ছি।

তাঁর সন্দেহটা হয়তো অমূলক নয় কিন্তু তিনি আরও ধরে নিয়েছিলেন আমি ইংরেজি বুঝি না। তিনি যখন খাবার দিচ্ছিলেন, আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। তিনি একটা সিট ডিঙিয়ে কনুই দিয়ে খোঁচা দিয়ে খাবারের ট্রে আমার হাতে তুলে দিলেন। সবাইকে জল দিচ্ছিলেন, আমি জল চাইতে দূরে জলের জায়গা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

সুখাদ্যে আহ্লাদিত, অন্যদিকে বিমানবালার ব্যবহারে মর্মাহত আমি অবশেষে লণ্ডনের ভুবনবিদিত হিথ্রো বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলাম।

বিমানের সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাসে উঠে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে বিমানবন্দরের বিশাল কাঁচের ঘরে ঢুকে পড়লাম। তার আগে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে রানওয়ের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পায়ের নীচের মাটিটা কেমন বুঝবার জন্যে। ভারত ভূখণ্ডের বাইরে সেই আমার আদ্য পদপাত।

বিলেত দেশটা মাটির, শুধু মাটির নয়, খাঁটি সাহেবদের—অন্তত একসময় তাই ছিল।

সেই সময়ে, সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডাঃ স্যামুয়েল জনসন লণ্ডন সম্পর্কে অনেকগুলো খারাপ কথা বলেছিলেন। এই পর্ব আরম্ভ করেছিলাম কবিকুল চূড়ামণি এলিয়ট সাহেবকে দিয়ে, শেষ করা যাক চূড়ান্ত গদ্যকার সুপ্রাচীন জনসন সাহেবকে উদ্ধৃত করে।

একই পর্বের আগে-পিছে দুটি ইংরেজি কোটেশন, বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু লণ্ডনে আসব, চিরদিনের স্বপ্নের লণ্ডন শহরে, আর ইংরেজি বিদ্যার খই ফুটবে না আমার অসংস্কৃত বাংলা বালির তপ্ত খোলায়, তা কি হতে পারে।

সুতরাং স্যামুয়েল জনসন সাহেবের সেই অষ্টাদশ শতকীয় লণ্ডন বর্ণনায় যাই, সে বর্ণনায় লণ্ডন শহরের চেহারা খুব খারাপ, খুবই খারাপ,

·· Here malice. rapine, accident conspire
And now a rabble rages.
now a fire'···

লাইন দুটো লিখে ফেলার পর দেখতে পাচ্ছি এই সামান্য দুই পংক্তির মধ্যে অনেকগুলো কঠিন কঠিন শব্দ আছে, আমি আর বঙ্গানুবাদে যাচ্ছি না, কারও অসুবিধে হলে অভিধান খুলে অর্থগুলো দেখে নিতে পারেন।

আমি বরং এক অর্ধখ্যাত, বলা উচিত প্রায় অখ্যাত কবির লণ্ডন বন্দনা নিজের ভাষায় নিবেদন করি, ছন্দ-মিলটা খুব ভাল হল না, তা হোক ?

'লণ্ডন খুব সুন্দর পুরী
খুব খ্যাতনামা নগরী
সব পথ তার সোনায় মোড়ানো
সব বালিকাই সুন্দরী।'

আট

লণ্ডন-টণ্ডন

'কেণ্ট সেণ্ট,
গো ওয়েণ্ট।...
...গো ওয়েণ্ট গন।
লণ্ডন-টণ্ডন।
গো ওয়েণ্ট গন গো,
লণ্ডন-টণ্ডন-প্লাসগো।'

—অজ্ঞাতনামা

অজ্ঞাতপরিচয় এবং অপটু এক স্কুলবালকীয় ছড়াকারের এই হাস্যকর মিল ও ছন্দের কয়েক পংক্তি বিলাত ভ্রমণের উপাখ্যানে বড়ই বেমানান।

কিন্তু লাইনগুলো মনে পড়ল, হঠাৎই মনে পড়ে গেল অন্য কারণে। আমাদের পাটপ্রধান জেলায় পাটের সাহেবেরা মরশুমের শেষে শীতের মাঝামাঝি তাদের বাংলোগুলি খালি করে দিয়ে চলে যেত। তারা অধিকাংশই সম্ভবত ছিল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, চলে আসত কলকাতায়, কিন্তু আমাদের অঞ্চলে সাহেবরা যখন থাকত না তাদের প্রসঙ্গ উঠলেই বলা হত 'গো ওয়েণ্ট গন; লণ্ডন-টণ্ডন।'

সরস্বতী পুজোর আগের শেষ রাতে সাহেবদের বাংলোর বাগান থেকে আমরা ফুল চুরি করে আনতাম, ডালিয়া, জিনিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, বড় বড় রক্তগাঁদা। বছরের অন্য সময় সাহেবদের বাগান থেকে ফুল চুরি করা দুঃসাহসের কাজ ছিল; সাহেবদের বন্দুক আছে, বিলিতি কুকুর আছে। কিন্তু সরস্বতী-পুজোর সময় সাহেবরা গো-ওয়েণ্ট-গন, একেবারে কুকুরসমেত। বাংলো পাহারার দারোয়ান অবশ্য থাকত, বাগানের মালি থাকত, কিন্তু দিশি মালি বা দারোয়ানকে কে ভয় পায়।

সাহেবদের সেই লণ্ডন-টণ্ডনে অবশেষে এই আমি, আমিও এসে পৌঁছলাম।

যাত্রার এই অংশটুকু প্রায় নির্বিঘ্নেই পাড়ি দিয়েছি। কিন্তু লণ্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে বিস্তর ঝামেলা।

প্রথমত আমি নিতান্ত আনাড়ি বাঙাল। আমার আচার-আচরণ, কথা-বার্তায় অনিবার্য গ্রাম্যতা পরিষ্কার ফুটে ওঠে। তার ওপরে হিথ্রোর মত অতিকায় বিমানবন্দর, বাঁয়ে ডাইনে, সামনে পিছনে গেটের পরে গেট, গলির পর গলি। কোন গেট দিয়ে কোথায় পৌঁছাতে হবে মোটামুটি বৈদ্যুতিক আলোর অক্ষরে সে সবই লেখা আছে। কিন্তু সেই সব নির্দেশাবলীর পাঠোদ্ধার করে হৃদয়ঙ্গম করে তদনুযায়ী পরিচালিত হতে গেলে যে বুদ্ধি ও

অভিজ্ঞতা প্রয়োজন সে আমার কোথায় ?

যা হোক শুল্ক আধিকারিকেরা খুব বেশি অত্যাচার করলেন না। দুটো ওভারকোট বা জোয়ানের আরকের বোতল নিয়েও খুব কৌতূহল দেখালেন না।

শুধু বিমান বন্দরে অবতরণের সময় বিলাতি ঠাণ্ডার ভয়ে মানসীদির দেয়া পশমের দস্তানা দুটো হাতে পরে নিয়েছিলাম, সেটা দেখে কাস্টমসের সাহেবরা একটু সন্দেহ করেছিলেন। বিমানবন্দরে ঢুকে দস্তানা জোড়া হাত থেকে খোলা হয়নি, সেটা ভুল হয়েছিল, সেই সঙ্গে হাতে দস্তানা পরা অভ্যেস নেই বলে তাড়াতাড়িতে ডানহাতের দুটো আঙুল বোধ হয় অনামিকা ও কনিষ্ঠা, একই ফোকরে ঢুকে গিয়েছিল, ফলে কনিষ্ঠার ফোকরটা ঝুলছিল।

দস্তানাপরা হাতে ওভারকোটের পকেট হাতড়িয়ে চাবি বার করে সুটকেসটা যখন খুলে দেখাতে গেলাম শুল্ক আধিকারিকেরা আমাকে হাতের দস্তানা দুটো খুলতে নির্দেশ দিলেন। দস্তানা খোলার পর যখন আমার দুটো শূন্য হাত মাত্র বেরিয়ে এল, ভদ্রলোকরা বেশ দুঃখিত হলেন বলে মনে হল এবং আমাকে জবাব দিয়ে দিলেন।

শুল্ক দফতরের কথাটাই আগে লিখে ফেললাম। এখন মনে পড়ছে না, শুল্ক দপ্তরে নাকি অভিবাসন দপ্তরে আগে হাজিরা দিতে হয়েছিল। বোধ হয়, এমনও হতে পারে দুটো শাখাই পাশাপাশি ছিল। তবে বেরোনোর পথে অভিবাসন দপ্তরেই আগে যেতে হয়। তা শুল্ক আধিকারিকদের কাছ থেকে বেশ তাড়াতাড়িই অব্যাহতি পেয়েছিলাম, আর না পাওয়ার কারণও নেই, এই হতদরিদ্র ভারতীয়ের বাক্স-প্যাটরায় এমন কোনও বহুমূল্য অথবা নিষিদ্ধ সামগ্রী থাকা সম্ভব নয় যা কাস্টমসের সাহেবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

কিন্তু অভিবাসনের কাউন্টারের সাহেবরা আমার সঙ্গে যথেষ্টই ছিচকেমি করেছিলেন।

ব্রিটেনে ঢোকার তখন খুব কড়াকড়ি। এর বছর দশেক আগে পর্যন্ত কলকাতা থেকে আমাদের চেনা-পরিচিত, আত্মীয়-বন্ধুরা, সহকর্মী-সহপাঠীরা দল বেঁধে, সপরিবারে বিলেত গিয়েছে, ডাক্তারি করতে, চাকরি করতে, ব্যবসা করতে, দোকানদারি করতে। পড়তে, পড়াতে এমনকি ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরিয়ে পার হওয়ার জন্যেও হেদো, গোলদিঘি থেকে সাঁতারুরা বিনা বাধায় লন্ডন গিয়েছে।

কিন্তু সত্তর দশকের শেষ দিকে ব্রিটেনের বড় কাহিল অবস্থা, বাইরের লোক আসা বন্ধ না করলে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের প্রকৃত অধিবাসীদের ভূমিপুত্রদের গ্রাসাচ্ছাদন নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে, প্রায় এই রকম হাল।

ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ব্রিটিশদেরই রচনা, সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পরেও উপনিবেশের সুখস্মৃতি জিইয়ে রাখার একটা চেষ্টা। সেই ব্রিটিশ কমনওয়েলথও আর শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ রইল না, শুধু কমনওয়েলথ, নিরলঙ্কার কমনওয়েলথ।

তবুও বহুদিন পর্যন্ত কমনওয়েলথভুক্ত সাবেকি ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির

ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশের অধিবাসীদের বিলেত যেতে কোনও ভিসা লাগত না। প্রাক্তন প্রজাদের জন্যে ব্রিটিশ সিংহ তার গুহার দরজা অনেকদিন খোলা রেখেছিল।

আর সেটার প্রয়োজনও ছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর ইউরোপে বিশেষ করে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে কর্মক্ষম মানুষের, পুরুষ মানুষের খুব অভাব দেখা দিয়েছিল, যুদ্ধে সব সাফ হয়ে গিয়েছিল। সেই অভাব অনেকদিন ধরে চলেছিল এবং প্রাক্তন উপনিবেশগুলির নাগরিকেরা জীবিকার তাড়নায় সেই অভাব পূরণ করতে সাহায্য করেছিল।

কিংবদন্তীর সিংহের গুহায় যেমন শুধু প্রবেশের পদচিহ্ন ছিল, বেরিয়ে আসার উলটো দিকের পায়ের ছাপ দেখা যায়নি, ব্রিটেনে সে সময়ে কাজে অকাজে যারা গিয়েছিল তাদের অধিকাংশেরই আর ফিরে আসা হয়নি। চেনা-জানার মধ্যে একমাত্র উৎপলরা, কবি উৎপলকুমার বসু এবং সান্ত্বনা (ও কাটু) ওঁদেরই পাকাপাকি ভাবে বিলেত ছেড়ে ফিরে আসতে দেখলাম।

কিন্তু আটাত্তর সাল নাগাদ আমি যখন ভায়া বিলেত আমেরিকা যাচ্ছি তখন ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রবেশদুয়ার প্রায় রুদ্ধ, টাঁকশালে কিংবা অন্যের হারামে প্রবেশ করার চেয়ে বিলেতে প্রবেশ করা অনেক বেশি কঠিন।

আমার সঙ্গে বিমানের রাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড, ভুবনফেরতা টিকিট, মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণপত্র, ব্রিটিশ কাউন্সিলের ডক্টর টেলরের ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণ-লিপি, সর্বোপরি কলকাতাস্থিত ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনের ছাড়পত্র, তবু ইমিগ্রেশন মালিকেরা সন্তুষ্ট নয়।

ব্রিটিশ হাই কমিশনের ছাড়পত্র সম্পর্কে বলি, কমনওয়েলথের, পুরনো উপনিবেশগুলির অতিথি-অভ্যাগতদের জন্যে তখনও ইংরেজদের কিঞ্চিৎ লোকদেখানো চক্ষুলজ্জা ছিল, তারা প্রবেশপত্রটির বেলায় অসম্পর্কিত দেশের ক্ষেত্রে যেমন ভিসা দেওয়া হয়, সেটাকে ভিসা বলে অভিহিত না করে সেটাকে সার্টিফিকেট পদবি দিয়েছিল, সরলভাবে সেই ছাড়পত্রের নামকরণ হয়েছিল 'এনট্রি সার্টিফিকেট'। ব্যাপারটা কিন্তু তত সরল ছিল না।

একটু দূরেই কাচের দেয়ালের ওপারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ব্রিটিশ কাউন্সিলের ডাঃ ফ্র্যাঙ্ক টেলরকে। ফ্র্যাঙ্ক আমার পুরনো বন্ধু, তাঁরই আমন্ত্রণের ভরসায় আমি বিলেতের এনট্রি পারমিট পেয়েছি ও নিয়েছি।

আমার দুর্দশার ছায়া পড়েছে ফ্র্যাঙ্কের ব্যথিত মুখে। স্বদেশ ও স্বজাতির ভবিতব্যের সঙ্গে তার নিজের জীবনও জড়িত কিন্তু সে একজন ভদ্রলোক, একজন অতিথির এ ধরনের অবমাননা নিশ্চয়ই তার পছন্দ নয়।

কিন্তু এই ব্যাপারটা যার সবচেয়ে বেশি অপছন্দ সেই ভাস্করকে দেখতে পাচ্ছি, কাচের বেড়ার ওপাশে ক্রুদ্ধ পদচারণা করছে, হঠাৎ মুখ তুলে তার সঙ্গে চোখাচোখি হতে সে তর্জনী তুলে আমাকে কি একটা কড়া নির্দেশ দিল, আমি ঠিক ধরতে পারলাম না।

কিন্তু ততক্ষণে আমি মুক্তি পেয়েছি। ইমিগ্রেশনের সাহেব দয়াপরবশ হয়ে

আমাকে বিলেতে ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা থাকার অনুমতি দিয়েছেন।

চব্বিশ ঘণ্টা মানে চব্বিশ ঘণ্টা। এক দিন নয়, পরিষ্কার স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা 'টোয়েনটি ফোর আওয়ারস্'।

শুধু তাই নয় সেই সঙ্গে রাবার স্ট্যাম্পের সিল দিয়ে আমাদের রাইটার্স বিলডিংস-সম্মত ঢালাও ইংরেজিতে নির্দেশ মুদ্রিত হল আমার পাসপোর্টের মূল্যবান পৃষ্ঠায় যার সরল বঙ্গানুবাদ হল 'চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে তোমাকে এদেশে প্রবেশ করতে অনুমতি দেওয়া হল এই শর্তে যে, তুমি এই সময়ে বৈতনিক অথবা অবৈতনিক কোনও চাকরি নিতে পারবে না এবং কোনও রকম ব্যবসায় বা বৃত্তিতে যোগদান করতে পারবে না।'

বিধাতাপুরুষ, যদি কেউ থেকে থাকেন তিনি জানেন, তিনি না জানলেও আমি জানি, আমার নিজের মানুষজনেরা জানে যে-কোনও নতুন জায়গায়, সে টাঙ্গাইল থেকে ঢাকা হোক, কিংবা কলকাতা থেকে আসানসোল প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা আমার হাই তুলতে, ঘুমাতে এবং তারপরে আড়মোড়া ভাঙতে কেটে যায়।

সেই সামান্য চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ব্রিটিশ অভিবাসন অনুশাসন অমান্য করে আমার মত অলস এবং নিরুদ্যম এক নিতান্ত ভেতো বাঙাল সাহেবদের দেশে চাকরি, ব্যবসা বা বৃত্তি সংগ্রহ করে ফেলব, অসম্ভব!

হায় তারাপদ, অসম্ভব! তুমি তো নিজেই জানো যে, তুমি তোমার সারা জীবনে একটার বেশি চাকরি সংগ্রহ করতে পারোনি, সেই একটা চাকরি ভরসা করে তুমি আজও আছ।

চব্বিশ ঘণ্টার অনুমতি দেয়ার আগে আমাকে যথেষ্ট জেরা করা হয়েছিল। আমি কেন মার্কিন দেশে যাচ্ছি, লণ্ডনে প্রবেশ করার উদ্দেশ্য আমার কি, আমার পাসপোর্টে জীবিকা লেখা আছে সরকারি চাকুরি অথচ নিমন্ত্রণ পেয়েছি কবি হিসেবে—এ সব সংশয়াকুল প্রশ্ন তো ছিলই এমনকি আমাকে আমার কবিতা শোনাতে প্রায় জবরদস্তি করা হয়েছিল।

যখন আমি বললাম, 'আমি ইংরেজিতে কবিতা লিখি না, মাতৃভাষায় বাংলায় আমার নিতান্ত পদ্যরচনা', বেঁটে মোটা টাকওয়ালা একটা সাহেব, সেই বোধহয় সেদিন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত বড়বাবু, অবাক হয়ে বলল, 'তা হলে আমেরিকানরা তোমাকে নিমন্ত্রণ করল কেন, বাংলা কবিতা তারা কি বুঝবে?'

এত কথা ওই চালাকদের আমি বোঝাতে গেলাম না, শুধু ম্লান, মৃদু ধরাপড়া প্রতারকের মত হাসলাম।

অবশ্য আমার সঙ্গে সুটকেসে শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম লাল এবং শ্রীমতী শ্যামশ্রী লাল অনুবাদিত আমার 'কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু?' কবিতার বইয়ের রাইটার্স ওয়ার্কশপের ইংরেজি সংস্করণ 'হোয়ার টু তারাপদবাবু' বইটির এক কপি ছিল। তা ছাড়াও ছিল পুরুষোত্তমের স্বপ্নসম্ভব মন্দ্রকণ্ঠে আমার কবিতার ইংরেজি অনুবাদের এবং আমার 'ভূতের রাজা দিলো বর' গোছের গলায় স্বরচিত কবিতার আবৃত্তির একটা ক্যাসেট, যেটা ওয়েলেসলি স্ট্রিটে বিখ্যাত 'চিত্রবাণী' স্টুডিওতে স্বয়ং পুরুষোত্তম অতি যত্নে যন্ত্রস্থ করেছিলেন।

কিন্তু ছোটবেলায় আমার সর্বংসহা, মহীয়সী পিতামহী আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে এটাও শিখিয়েছিলেন যে, 'চোরাকে না শোনাও ধর্মের কাহিনী'।

অনেক পরে কারা যেন বলেছিল কথাটা অন্যরকম হবে। কথাটা নাকি আমি উলটো করে ফেলেছি।

তা হোক, উলটো-সোজা জানি না, সেই ম্লেচ্ছদেশে প্রবেশ তোরণে ঠাকুমার উপদেশ স্মরণে রেখে ইংরেজি বই, ইংরেজি ক্যাসেটের ব্যাপারটা পুরোপুরি চেপে গেলাম।

কিছুই বললাম না শুধু ঠোঁটে ছিমছাম হাসি ভাসিয়ে বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তাতেই কাজ হল, চব্বিশ ঘণ্টার মেয়াদে আমাকে এয়ারপোর্টের কাচের দরজা পেরোনোর অনুমতি দেয়া হল।

মনে একটু আশঙ্কা ছিল, সত্যিই অব্যাহতি পেলাম কিনা। কিন্তু না, ওরা আর পিছু ডাকল না।

কাচের দরজার ওপারে ভাস্কর এবং ফ্র্যাঙ্ক, দুজনেই তখন খুবই অস্থির হয়ে পড়েছে। আমাকে বেরোতে দেখে তারা স্বস্তি পেল।

এই দুজনের সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু ভাস্কর সম্পর্কে হয়তো আরও একটু বিস্তারিত করে বললে ভাল হবে।

ভাস্কর মানে ভাস্কর দত্ত। উত্তর কলকাতার পদ্মনাথ লেনের। সুনীলের, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী। আমাদের প্রথম যৌবনের পরম সুহৃদ।

ভাস্করের কথা সবাই লিখেছে। এখন ইউরোপে আমেরিকায় যেতে গেলে লণ্ডনে ভাস্করকে ছুঁয়ে যাওয়া প্রত্যেকের স্বভাধের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। এই তো গত মাসে আমার ছেলে কৃত্তিবাস লণ্ডনে ভাস্করের ওখানে হয়ে বাড়ি এল, সামনের মাসে ফেরার পথেও তাই করবে।

আধুনিক বাংলা ভ্রমণকাহিনী নিয়ে যদি কোনও সুযোগ্য পরিচালক কখনও এক অভিনব চলচ্চিত্রের পরিকল্পনা করেন সেই কাহিনীর অবিসম্বাদী নায়ক হবে ভাস্কর, সুদর্শন, অভিজাত, হৃদয়বান শ্রীযুক্ত ভাস্কর দত্ত।

মনে আছে, ভাস্কর সাহেবদের অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গদের দু চোখে দেখতে পারত না। তার মত বর্ণবিদ্বেষী জীবনে খুব কম দেখেছি, তার সাহেব দেখলেই মাথায় রক্ত উঠে যেত, হাতিবাগানি বাংলায় বলত, 'যত সব মেলেচ্ছো।'

সেই ম্লেচ্ছদের দেশেই ভাস্কর জীবনের প্রায় অর্ধেক দিন কাটিয়ে দিল। আরও কতদিন থাকতে হবে সে নিজেও জানে না।

ভাস্কর এবং সাহেব প্রসঙ্গে মহামহিম কমলকুমার মজুমদারের কথা মনে পড়ছে।

অবশ্য তার একটা অন্য বড় যোগসূত্রও আছে।

আমাদের কৃত্তিবাস ছিল পদ্যের কাগজ 'তরুণতম' এবং পরে 'তরুণ

কবিদের মুখপত্র'। সেই কৃত্তিবাস থেকে গল্পের কাগজ বেরোল, সম্পাদক শক্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশিত হল ভাস্করদের পদ্মনাথ লেনের বাড়ি থেকে, সেটাই তখন কৃত্তিবাসের ঠিকানা ও আড্ডা। আমি সাধারণত আমার তদানীন্তন কর্মস্থল হাবরা-কল্যাণগড় থেকে সরাসরি সেখানে যেতাম। ব্যাগের বোঝা কমাবার জন্যে এবং সম্ভবত একটু চমক দেওয়ার জন্যেও পাজামার ওপরে ফুলপ্যান্ট পরে আসতাম ভাস্করদের বাড়িতে, এসে প্যান্টের যাতে ক্রিজ নষ্ট না হয়, তাই খুলে ফেলতাম। মনে রাখতে হবে সেটা বিশুদ্ধ সুতির প্যান্টের যুগ এবং একটা প্যান্ট ইস্তিরি করতে ধোপা নিত পাকা দু আনা, সেই উনিশশো আটান্ন-উনষাট সালে, যখন দু আনায় এক প্যাকেট কড়া সিগারেট পাওয়া যেত। সে যাক, আমি প্যান্টটা খুলে ভাঁজ করে একটা চেয়ারের ওপরে রেখে পাজামা পরা অবস্থায় ভাস্করদের দামি সোফার হেলান দিয়ে আরাম করে বসতাম। গরম থাকলে গায়ের শার্টটাও খুলে ফেলতাম। আমাদের সে আড্ডা নারীবর্জিত হলেও, এখন বুঝি, সকলের সামনে, তা তারা যতই বন্ধু, সহকর্মী হোক ওভাবে ঘরে প্রবেশ করেই অতর্কিতে জামা কাপড় ছেড়ে ফেলা মোটেই শোভন ছিল না, আমার একান্ত গ্রাম্যতার পরিচয় ছিল সেটা। সুনীল লিখিতভাবে এবং অন্যান্য বন্ধুরা মৌখিকভাবে আমার এবম্বিধ আচরণের বহুবার উল্লেখ করেছে এবং এখনও করে, অবশ্য কৌতুকের সঙ্গে।

সাহেব সূত্রে কমলদার কথা বলতে গিয়ে নিজের গোলমেলে কথা বলে ফেললাম।

ভাস্করদের পদ্মনাথ লেনের বাড়ি থেকে যে 'কৃত্তিবাস' গল্পপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রথম গল্পলেখক ছিলেন কমলকুমার মজুমদার, আর সে কি আশ্চর্য গল্প, 'ফৌজ-ই বন্দুক', বাংলা গদ্য রচনার তৎকালীন গয়ংগচ্ছ ভঙ্গির এক দুরন্ত প্রতিবাদ।

ভাস্করের প্রসঙ্গে কমলদার প্রসঙ্গ, আর লণ্ডনে যখন এসেই গেছি কমলদার প্রসঙ্গে সাহেব জুড়ে দিচ্ছি।

গল্পটা মোটেই আমার নয়। গল্পটা আড্ডাচার্য শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ গুপ্তের, তিনি এ গল্প মৌখিকভাবে বহুবার এবং লিখিতভাবে বেশ কয়েকবার বলেছেন।

গল্পটা আড্ডার, কিন্তু আড্ডার হলেও মোটামুটিভাবে সত্যি, অন্তত কমলদার সঙ্গে খুব মেলে। তা ছাড়া গল্পটার সত্যতা সম্পর্কে নাকি সত্যজিৎ রায়ের সার্টিফিকেট ছিল। চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের কফি হাউসের কিংবদন্তী-খ্যাত হাউস অফ লর্ডসের মধ্যাহ্নকালীন আড্ডায় একদা সত্যজিৎ রায়, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, কমলকুমার মজুমদার এবং আরও অনেক খ্যাতনামা ভদ্রলোক, সাংবাদিক, আমলা, ভবঘুরে সমবেত হতেন। গল্পগুজব, কথাবার্তা হত।

ওই আড্ডায় মাঝে মাঝে স্টেটসম্যান কাগজের এক ইংরেজ সাংবাদিক আসতেন। কমলকুমার মোটেই দেখতে পারতেন না সাহেবটিকে। সাহেবটি

যখন আড্ডায় উপস্থিত থাকতেন না কমলকুমার তাঁকে নাম ধরে বা সাহেব বলে উল্লেখ না করে বলতেন 'ওই ফরসা ভদ্রলোকটি'।

অবশেষে এখন আমি ওই ফরসা ভদ্রলোকদের দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছি বিমান বন্দরের জেলখানা পেরিয়ে।

ভাস্কর কলকাতা থেকে লণ্ডন চলে এসেছিল ঠিক ষাটের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ, ফ্র্যাঙ্কও ওই একই রকম সময়ে লণ্ডন থেকে কলকাতায় এসেছিল ব্রিটিশ কাউন্সিলের চাকরিতে।

বোধ হয় কলকাতায় ভাস্করের ও ফ্র্যাঙ্কের মধ্যে দেখা হয়নি। আর দেখা হয়ে থাকলেও সে নামমাত্র। আজ এয়ারপোর্টে দুজনে দুজনকে চিনতে পারেনি, আর দুজনেই যে আমাকে নিতে এসেছে সেটা তাদের দুজনের কেউ বুঝতে পারেনি।

আমাকে বেরোতে দেখে দুজনেই এগিয়ে এল। আমি সামান্য কুশল বিনিময় করতেই বুঝতে পারলাম ভাস্কর ও ফ্র্যাঙ্কের মধ্যে কোনও পরিচয় নেই। দুজনের পরিচয় করিয়ে দিতে যথারীতি তারা 'হ্যালো', 'গুড মরনিং' ইত্যাদি করল। কিন্তু ভাস্করের মুখ দেখে বুঝতে পারলাম ফ্র্যাঙ্ককে দেখে সে মোটেই খুশি হয়নি। ও থাকতে তবুও এই সাহেবটা কেন আমাকে নিতে এসেছে, ভাস্কর বেশ চটেই গেছে মনে হল।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরোনোর মুখে একটু আলাদা হতেই ভাস্কর ভুরু কুঁচকিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এই সাহেবটা কে?'

আমি বললাম, 'ডাঃ ফ্র্যাঙ্ক টেলার। ব্রিটিশ কাউন্সিলে মস্ত বড় চাকরি করে।'

একথা শুনে ভাস্কর বলল, 'জানিস, ব্রিটিশ কাউন্সিল আমি বন্ধ করে দিতে পারি।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কি করে?'

ভাস্কর যা বলল সে খুবই সাংঘাতিক কথা, ভাস্করের কোম্পানি ব্রিটিশ কাউন্সিলের কাগজ, পেন্সিল, স্টেশনারি সরবরাহ করে। সরবরাহ বন্ধ করে দিলেই ব্রিটিশ কাউন্সিল বন্ধ হয়ে যাবে।

কথায় কথায় বাইরে বেরিয়ে এসেছি।

বিমান থেকে নামার সময় যে রকম রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন দেখেছিলাম এখন এক ঘণ্টার ব্যবধানে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মেঘ আকাশে, কেমন ছায়া-ছায়া ঘোলাটে দুপুর।

সাহেবরা আমাদের দেশে যাকে হোম ওয়েদার বলতেন ঠিক তাই।

নয়

আবার দেখা হবে

...'Next time to stay !
Next time the things to see
By Ear unheard.
Unscrutinised by Eye.'

—*Emily Dickinson*

পরের বার থাকলে।
পরের বার সব দেখাশোনা হবে,
চোখ দিয়ে না দেখে,
কান দিয়ে না শুনে।

—এমিলি ডিকিনসন

আমার লণ্ডন-ভ্রমণের কথা লিখতে আমি এখন কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করছি।

আসলে আমি লণ্ডন গিয়েছিলাম বটে, সেখানে রাত্রিবাসও করেছিলাম, কিন্তু লণ্ডনে আমি কিছুই দেখিনি।

আমি বোধহয় সেই অতি সামান্য সংখ্যক পর্যটনকারীদের একজন যে লণ্ডন বেড়াতে গেছে কিন্তু হাইড পার্কে যায়নি, বাকিংহাম প্রাসাদ দেখেনি, ডাউনিং স্ট্রিটে গিয়ে দশ নম্বর বাড়ির খোঁজ করেনি, এমনকি ভরসন্ধ্যায় সোহোর প্রমোদ সরণির আশেপাশে উঁকিঝুঁকি দেয়নি।

শুধু লণ্ডন নয়; নিউ ইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলেসেও একই ব্যাপার ঘটেছে। নিউ ইয়র্কে সেই ভুবনবিদিত মুক্তি মূর্তি স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখিনি, শৈশব স্মৃতি বিজড়িত এম্পায়ার স্টেট বিলডিংস দেখতে যাইনি। লস অ্যাঞ্জেলেসে আমি বেভারলি হিলসে নেমন্তন্ন খেয়েছি কিন্তু ছায়ানগরী হলিউডের স্টুডিয়োতে প্রবেশ করিনি।

এসব কথা যথাস্থানে সবিস্তারে বলা যাবে, আপাতত লণ্ডন শহরে প্রবেশ করি।

হিথ্রো বিমানবন্দরের খুব কাছেই লণ্ডন যাওয়ার বড় সড়কের পাশে একটা টাটকা পাঁচতারা হোটেলে প্যান অ্যাম বিমানের তরফ থেকে তাদের লোক দিল্লির মতই আমার জন্যে একদিনের জন্যে ঘর রেখেছিল। রাউণ্ড দা ওয়ারলড টিকিটের মধ্যেই এসব সুযোগসুবিধা।

এখন মনে পড়ছে না, যে হোটেলে থাকিনি, জীবনে আর কোনও দিন থাকতেও পাব না, সে হোটেলের নাম কে-ই বা মনে রাখতে পারে।

তবুও বহুকাল মধ্যবিত্ত হ্যাংলামিবশত আমি লোকজনকে বলেছি লণ্ডন

শহরে পাঁচতারা হোটেলে আমি ইচ্ছে করে থাকিনি। হোটেলের নামটা আগে ঠিকই বলতাম, আজ দশ-বারো বছর পরে এই কাহিনী লেখার সময়ে দেখছি ভুলে গেছি। তবু অনুমানে বলছি, সেই হোটেলটার নাম ছিল স্কাইলাইন অথবা স্কাইটাইম। সমাসবদ্ধ শব্দটির পরের পদটি সম্পর্কে আমি অনিশ্চিত কিন্তু প্রথম পদটি অবশ্যই ছিল স্কাই।

কিন্তু সেই আকাশকক্ষে আমার থাকা হয়নি।

আমি লন্ডন পৌঁছেছিলাম শনিবার দুপুরে। সেদিন ছুটি। পরের দিন রবিবারও ছুটি। ভাস্কর আর ফ্র্যাংক দুজনেরই অফিস নেই। তারা আমাকে হোটেলে থাকতে দেবে কেন? তারা তো আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছে। আমার সামান্য চব্বিশ ঘণ্টার মেয়াদ সরাসরি ভাগ হয়ে গেল কলকাতার কুলীন কায়স্থবাবু আর লন্ডনের কুলীন অ্যাংলো স্যাক্সন সাহেবের মধ্যে। ইতিমধ্যেই ভাস্কর তার বর্ণবিদ্বেষ সাময়িক মুলতুবি রেখে ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে।

ভাস্করের সঙ্গে গাড়ি আছে। ফ্র্যাঙ্কের কোনও গাড়ি নেই। লন্ডন নগরীর একজন প্রাচীন বাসিন্দা হিসেবে সে সরকারি বাস এবং মেট্রোর ওপর নির্ভরশীল। অবশ্য জানি না, অফিসের কাজের জন্যে অফিসের গাড়ি পায় কি না।

ভাস্কর থাকে হ্যারোর শহরতলিতে। এলাকার নাম মিডলসেক্স। চমৎকার ছিমছাম পাড়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মহানগরীর আবিলতা নেই, ধুলো-ধোঁয়া নেই, কিন্তু পা বাড়ালেই লন্ডন, ডাউনটাউন লন্ডন গাড়িতে সামান্যই দূরে। তিরিশ-চল্লিশ মিনিটের পথ।

বাড়িটা ভাস্করের নিজের। কিনেছিল সেই উনিশশো বাহাত্তর সালে। দাম পড়েছিল পাঁচ নাকি দশ হাজার পাউন্ড। আমার ছেলে এবার লন্ডন থেকে এসে বলছে, ও বাড়ির এখন বাজারদর দেড় লক্ষ থেকে দু লক্ষ পাউন্ড। বাড়ি ছাড়াও বাড়ির সঙ্গে রয়েছে বাগান করার মত খোলা জমি। বাড়ি বেচে দেশে ফিরে এলে শুধু বাড়ি বাবদই ভাস্কর অন্তত পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সঙ্গে নিয়ে ফিরতে পারবে।

কিন্তু তবু কি ফেরা যায়? কিন্তু কেন ফেরা যায় না, কে জানে। ভাস্করের এক ছেলে অর্ণব এবং এক মেয়ে অনিতা, স্ত্রীর নাম ভিক্টোরিয়া হলেও পুরোপুরি ষোল আনা বাঙালি, বাঙালিনি।

ভাস্করের এই বাড়ির ব্যাপারে একটা মজার অথচ দুঃখের গল্প আছে।

ভাস্কর বাড়িটা কেনার আগে, যেমন হয়, বাড়িটা কিছুদিন অব্যবহৃত ছিল। ভাস্কর যখন বাড়িটা কেনে, বাড়িটার উঠোনে ঝোপঝাড়, আগাছা।

লন্ডনে, শুধু লন্ডনে কেন, বিলেত আমেরিকায় যে কোনও জায়গায় এ সব পরিষ্কার করা, এমনকি চুনকাম, ইলেকট্রিক, জলের কল মেরামতির টুকটাক কাজ নিজেকেই করতে হয়। জনমজুর বা মিস্ত্রি লাগিয়ে এসব করাতে যাওয়া খুবই খরচের, খুবই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। সাধারণত লোকেরা

ছুটির দিনে, অবসরে এসব কাজ নিজেরাই করে থাকে। আর ঘণ্টাখানেক পরিশ্রম করলেই যদি দশ-বিশ পাউণ্ড বেঁচে যায়, অনেক কষ্টের, পরিশ্রমের উপার্জনের অতগুলো টাকা, সেটা কম কথা নয়!

ভাস্কর যে বাড়িটা কিনেছে সে বাড়িটার উঠোনে একটা কাচঘরের মত ছিল, শীতের দিনে ঠাণ্ডা হাওয়া বাঁচিয়ে রোদ্দুরে সে ঘরে বসা যায়, সন্ধ্যাবেলা আলো জ্বালিয়ে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যায়, গল্পগুজব করা যায়, চমৎকার সেই কাচঘর।

কিন্তু সেই কাচঘরের চারপাশ তখন আগাছায় লতা-জঙ্গলে ভর্তি, সেই সঙ্গে সাপখোপ না থাক পোকামাকড়ের উৎপাতও নিশ্চয় আছে।

কিন্তু ভাস্কর আমুদে, আড্ডাবাজ লোক। ছেলেমেয়েরাও তখন বড় হয়নি। সেই কাচঘরটা যারাই বাড়িতে আসে তাদের ভাস্কর দেখায়, এটা নিয়ে তার একটু অহঙ্কারও আছে, কিন্তু সেটা আরও পরিষ্কার করে ব্যবহারের যোগ্য করে তোলা হয় না।

এই সময়ে একটা সুবর্ণ সুযোগ এল। একটা দৈত্যের মত দেহ, প্রচণ্ড শক্তিশালী কালো চামড়ার মানুষ, অসম্ভব সেই লোকটির খাটবার ক্ষমতা, ভাস্কর তাকে পেয়ে গেল পাড়ার মধ্যে। এখানে ওখানে ফাই-ফরমাস খেটে বেড়াচ্ছে। লোকটা বোধহয় সম্পূর্ণ নিরক্ষর, ইংরেজি মোটেই বোঝে না। অল্প কিছু টাকায় দশজনের কাজ একাই একদিনে শেষ করে।

কথাবার্তা বলে ভাস্কর লোকটাকে কাজে লাগাল। অফিস যাওয়ার সময় ভাস্কর লোকটাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল এই সব ঝোপজঙ্গল কেটে সাফ করতে হবে।

ভাস্কর ভালোভাবে নির্দেশ দিয়ে অফিসে চলে গেল, ভিক্টোরিয়াও কাজে গেল। ছেলেমেয়ে স্কুলে, বাড়ি ফাঁকা। সেই কালো দৈত্য একটা কাটারি হাতে জঙ্গল পরিষ্কার করতে লাগল।

বিকেলে বাসায় ফিরে এসে ভাস্করের মাথায় হাত। সব কিছু পরিষ্কার করে লোকটা হাসিমুখে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভাস্করের জন্য অপেক্ষা করছে।

ভিতরে ঢুকে ভাস্কর দেখে সর্বনাশ, কোথাও একফোঁটা জঙ্গল লতাপাতা নেই সেটা ঠিক, কিন্তু সেই সঙ্গে তার অত সাধের কাচঘরটাও লোকটা সাফ করে দিয়েছে। একেবারে উড়িয়ে দিয়েছে।

কাচঘরটার চিহ্ন পর্যন্ত নেই, কাচের টুকরোগুলো পর্যন্ত বেমালুম পরিষ্কার করে বাইরে ফেলে দিয়েছে। একদম ফাঁকা সব শূন্য।

ভাস্কর যত চিৎকার করে কালো দৈত্যটার ওপরে রাগারাগি করে, লোকটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, সে বুঝতে পারে না সে কি অন্যায় করেছে।

এই গল্পটা নিশ্চয়ই সত্যি। কিন্তু গল্পটার দায়িত্ব আমার নয়। গল্পটা আমাদের বলেছিল উৎপলকুমার বসু। সেও প্রায় পনেরো বছর আগে।

এতকাল গল্পটা কী করে মনে ছিল, এখন লিখে নিয়ে তাই ভাবছি।

এয়ারপোর্ট থেকে আমি যখন মালপত্র নিয়ে বেরোচ্ছি ফ্র্যাংক বলল, একদিনের জন্যে লন্ডনে এত লটবহর নিয়ে ঢুকে লাভ নেই। তার চেয়ে জিনিসপত্রগুলো বিমানবন্দরের লাগেজরুমে জমা দিয়ে গেলেই হয়। মালপত্র অযথা টানাটানি করতে হবে না, ফেরার পথে কাস্টমসের ঝামেলা থাকবে না। তা ছাড়া সে আরও অবাক হল এই ভেবে যে মাত্র কয়েক সপ্তাহের বিদেশ ভ্রমণে এত জিনিসপত্র আমি কি জন্যে নিয়ে এসেছি। আমি কি দেশ থেকে চিরদিনের মত পালাচ্ছি, আর কখনও ফিরব না।

আমি কিন্তু ফ্র্যাংকের নিষেধ না শুনে সমস্ত লটবহর নিয়েই এয়ারপোর্ট থেকে বেরোলাম। তার একটা কারণ এই যে, সুটকেসে, ব্যাগে হোল্ডঅলে কিসের মধ্যে কী আছে খেয়াল নেই। এর মধ্যে ফ্র্যাংক আর ভাস্করের জন্যে সামান্য কিছু আছে। সেটা তো লন্ডনেই দিতে হবে। আর তা ছাড়া রাত্রি-বাসের জন্যে আমার লুঙি আছে, সেটাও লাগবে। এখন এই ভিড়ের মধ্যে বাক্সপ্যাঁটরা খুলে সে সব খুঁজে বার করা বেশ হাঙ্গামার ব্যাপার।

তবে এ ছাড়াও অন্য একটা বড় কারণ ছিল। এই বিদেশ বিভুঁয়ে সাহেবদের লাগেজরুমে আমার মহামূল্যবান জিনিসপত্র কতটা নিরাপদ সে বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ। যারা এনট্রি পারমিট দেওয়ার পরেও ওই রকম জেরায় জেরবার করতে পারে তারা আমার লাগেজও সরিয়ে ফেলতে পারে।

সবচেয়ে বড় কথা মালপত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করতে আমি খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করি। হাতে-মাথায়, ঘাড়ে-পিঠে অনেক জিনিসপত্র না চাপালে নিজেকে কেমন খালিখালি, অসহায় মনে হয়। মনে হয় কী যেন ছিল, সেটা নেই, কী যেন হারিয়ে ফেলেছি।

এই হারিয়ে ফেলার ভয়েই সেই কবে লণ্ঠন, মশারি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম আজও মাথায় দেওয়ার তেল থেকে পায়ের জুতোর কালি পর্যন্ত সঙ্গে না নিয়ে আমি বাইরে বেরোই না।

বিমানবন্দরের বাইরে একটা বাঁকে এসে আমি আর ফ্র্যাংক দাঁড়ালাম। পেছনের দিকে কোথাও একটা পার্কিং স্পেসে ভাস্করের গাড়িটা রাখা ছিল। ভাস্কর গিয়ে গাড়িটা নিয়ে এল। সামনের সিটে আমি আর ভাস্কর বসলাম। পিছনের সিটে মালপত্র নিয়ে ফ্র্যাংক।

গাড়ি চালাতে চালাতে ভাস্কর আমার আর ফ্র্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করে আমার শনি-রবিবারের প্রোগ্রাম ঠিক করল। এ ধরনের কাজে ভাস্করের দক্ষতা অপরিসীম।

ঠিক হল, এখন আমরা তিনজনে প্রথম ফ্র্যাংকের বাড়িতে যাব। এই সুত্রে ফ্র্যাংকের বাড়িটা ভাস্করের চেনা হয়ে যাবে। ফ্র্যাংকের বাড়িতে গিয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে, একটু হাতমুখে জল দিয়ে আমি ভাস্করের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব।

ভাস্কর তার গাড়িতে আমাকে লণ্ডন দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাবে তার বাড়িতে। তারপর সেখানে সামান্য একটু দম নিয়ে দুজনে একটু ঘোরাফেরা করতে বেরোব। ফিরে এসে রাতের আহার ভাস্করের ওখানেই।

ফ্র্যাঙ্কেরও নেমন্তন্ন নৈশাহারে। তবে সে তার নিজের কিছু ব্যক্তিগত কাজকর্ম সেরে রাতের দিকে ভাস্করের বাড়িতে চলে আসবে। ভাস্করের ঠিকানাটা ফ্র্যাঙ্ক ভালো করে জেনে এবং বুঝে নিল।

রাতে আমি ভাস্করের বাড়িতে থাকব না ফ্র্যাঙ্কের বাড়িতে, ও নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ মতভেদ হয়েছিল। ভাস্করের খুব ইচ্ছে ছিল যে আমি ওর ওখানেই রাতে থাকি। এবং থাকলে একটা সুবিধে আছে, পরের দিন দুপুরে ভাস্করের গাড়িতেই আমি এয়ারপোর্ট চলে যেতে পারব।

কিন্তু আমার সুটকেস, ব্যাগ সব কিছু পড়ে থাকবে ফ্র্যাঙ্কের বাড়িতে। তা ছাড়া ফ্র্যাঙ্কের ওখানেও আমার থাকা উচিত, অন্তত ভদ্রতা করেও।

অতএব ঠিক হল, আমি নৈশভোজনের পর ফিরে যাব ফ্র্যাঙ্কের বাড়িতে। সেইখানেই রাত্রিবাস, পরদিন সকাল উঠে ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে আমি একটু ঘুরেফিরে কাছাকাছি জায়গাগুলো দেখব।

তা, ভাস্করের সঙ্গে তো চলে এলাম ভাস্করের বাড়িতে। আগেই বলেছি শান্ত লোকালয়ে, সুন্দর বাড়ি। চমৎকার সুসজ্জিত বাইরের বসবার ঘর, লিভিং রুম, যেটা বিলেতের বাড়িগুলোর প্রধান অঙ্গ।

শোয়ার ঘরে শোবে, রান্নাঘরে রান্না করবে, বক্সরুমে জিনিসপত্র রাখবে আর জীবনযাপন, আড্ডা, গানবাজনা, টিভি সব লিভিং রুমে, সে ঘরের কার্পেট হবে পুরু আর নরম, সোফা, ডিভান হবে নয়নমনোহর এবং আরামদায়ক।

ভাস্করের বাড়িতেই আমি প্রথম সাহেবি লিভিং রুম দেখলাম, কলকাতায়, ঢাকায় বা দিল্লিতে ঠিক এমন আগে দেখিনি। সাহেবদের দেশে সব বাড়িতেই হয়তো লিভিং রুম এই রকম, তবু ভাস্করের বাড়ি বলেই খুব ভাল লাগল।

ভিক্টোরিয়া বাড়িতে ছিল না। কোথায় যেন কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিল। আমরা যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই সে ফিরল।

ভাস্করের বাড়িতে বসে সামান্য বিশ্রাম করে, এক পেয়ালা চা খেয়ে আমি আর ভাস্কর চরতে বেরোলাম।

বেশি দূরে গেলাম না। নৈশ লণ্ডন তার সৌন্দর্য ও আলোকমালা নিয়ে, রহস্য ও উত্তেজনা নিয়ে কিছু দূরে রইল, আমি ভাস্করের সঙ্গে তাদের গলির মোড় পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গেলাম। এর চেয়ে বেশি দূরে যেতে ইচ্ছে করল না। হইচই করে, ঘুরে ফিরে দেখার লোক আলাদা, সে আমি নই।

গলির মোড়ে একটা বিয়ার পাব। কলকাতায় আগে আমরা বিয়ার খেতাম না, লণ্ডন থেকে ফিরে এসে উৎপল আমাদের বুঝিয়ে ছিল বিয়ার খুব ভাল স্বাস্থ্যকর জিনিস, এক প্লাস বিয়ার এক পেয়ালা দুধের সমান ভাল, ইংরেজি কথাটা হল, এ প্লাস অফ বিয়ার ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ এ কাপ অফ মিল্ক।

সে যা হোক, নিতান্ত পয়সার অভাবেই হয়তো, এ জীবনে বিয়ার পানের বিলাসিতা খুব বেশি করে উঠতে পারিনি।

শনিবারের সন্ধ্যায় ভাস্করদের গলির মোড়ের বিয়ার পাবটায় বেশ ভিড়। আমরা কাউন্টারের ওখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। পাবের পরিচালক এক স্বাস্থ্যবান প্রৌঢ় সাহেব। অনেকদিন আগে নাকি কলকাতায় থাকত। বোধহয় অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, তবে গায়ের রং যা ধবধবে ইংরেজও হতে পারে।

এই পাবে একটা মজার জোচ্চুরি দেখলাম। হ্যান্ডেল লাগানো একটা বড় কাঠের পিপের মধ্যে বিয়ার ভরা রয়েছে, পিপেটা কাউন্টারের জালে বসানো। দাম মিটিয়ে হ্যান্ডেলটা ঘুরিয়ে দিলেই পিপেটা এক পাক ঘুরে যায়, তখন পানপাত্রটি পিপের মুখের গর্তের সামনে ধরতে হয়। সেই গর্ত দিয়ে বিয়ার বেরিয়ে আসে।

ঠিক পিপেটার পাশেই পাব পরিচালক দাঁড়িয়ে। পয়সা নেওয়ার সময় কথায় কথায় খদ্দেরকে অন্যমনস্ক করিয়ে দিয়ে সে হ্যান্ডেলটা খুব জোরে ঘুরিয়ে দেয়, তাড়াতাড়িতে পিপের মুখ দিয়ে পানীয় খুব কম বেরোয়।

বিয়ার পাব থেকে সরাসরি ভাস্করের বাড়িতে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ পরে ফ্র্যাংক এল। আরো কাউকে কাউকে ভাস্কর বলেছিলো। তারাও এলো। পার্টি বেশ জমেছিলো।

আমার সেই প্রথম বিদেশি সন্ধ্যায় তুলোর গেঞ্জি-পাজামা আমাকে কি বিপদে ফেলেছিলো সে কথা আগেই বলেছি। রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ করে ভাস্কর আবার গাড়ি বের করে আমাকে আর ফ্র্যাংককে ফ্র্যাংকের বাড়িতে পৌঁছে দিল।

ফ্র্যাংক থাকে শহরের শেষ প্রান্তে সারেতে, রিচমণ্ড অঞ্চলে। টেমসের পাশেই জায়গাটা। এখানে অনেক আগে লণ্ডন পুরসভার ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। টানা, লম্বা আস্তাবল, সারি-সারি। সেগুলো ছোট ছোট ভাগে মিউনিসিপ্যালিটি বিক্রি করে দেয়। ছোট একটা অংশ ফ্র্যাংক কিনে সেটাকে সুন্দর একটা ডুপ্লে অ্যাপার্টমেণ্ট বানিয়েছে। একতলায় বসার ঘর থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়, দোতলায় শোয়ার ঘর, রান্নাঘর। সিঁড়িটা একটু চাপা, ছাদটা একটু নিচু, এই যা। আশেপাশের সবগুলো বাড়িই একই রকম ভাবে তৈরি। ফ্র্যাংকের মত ব্যাচেলারের পক্ষে চমৎকার আবাস।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে ফ্র্যাংকের সঙ্গে হাঁটতে বেরোলাম। অদূরেই জগৎ-বিখ্যাত টেমস নদী, সেখানে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে এক মৎস্যশিকারি সাতসকালেই ছিপ দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করছে। এখানে টেমস একটা সামান্য সাধারণ নদী, এলাকাটার চেহারাটাও তেমন নাগরিক নয়। কাছেই একটা কবরখানা, সেখানে নিয়ে গিয়ে ফ্র্যাংক বলল, হিকির গেজেটখ্যাত স্মরণীয় উইলিয়াম হিকির সমাধিস্থল এখানে।

সুন্দর রোদ উঠেছে আজ সকালে আবার। আমাদের পুজোর দিনের মতো আকাশ নীল, চারদিক ঝলমলে। ফ্র্যাংকের বাড়ি ফিরে বাক্সপ্যাটরা গুছিয়ে,

সাজপোশাক করে প্রস্তুত হলাম। ভাস্কর তুলে নিয়ে যাবে কথা ছিল। যথেষ্ট উৎকণ্ঠা জাগিয়ে সে এল বেশ দেরি করে। একেবারে শেষ মুহূর্তে দৌড়োদৌড়ি করে এয়ারপোর্টে ঢুকলাম।

সেই যে এক ভদ্রলোক, হেড অফিসের নকুড়বাবু, পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে লঞ্চে করে জলপথে সুন্দরবন ভ্রমণে গিয়েছিলেন।

পুরো দুই রাত্রি, তিন দিনের কণ্ডাকটেড ট্যুর। তিনদিন পরে নকুড়বাবু বিরসবদনে অফিসে ফিরে এলেন। অফিসের ছেলেরা নকুড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করল, 'বড়বাবু, সুন্দরবন কেমন দেখলেন?'

নকুড়বাবু বললেন, 'খুব ঠকে গেছি। দুশো টাকা একেবারে জলে, নোনাজলে গেল হে।'

অফিসের ছেলেরা বলল, 'সুন্দরবন দেখা হল না?'

নকুড়বাবু বললেন, 'কী করে দেখব, খালি গাছ, আর গাছ, আর গাছ। গাছের জন্যে সুন্দরবন দেখতেই পেলাম না।'

আমারও নকুড়বাবুর দশা।

সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্বপ্নের লণ্ডন শহরে এলাম, থাকলাম, কিন্তু কিছুই দেখা হল না। যাতায়াতের পথে দেখলাম শুধু বাড়ি আর বাড়ি, দালান আর দালান। নতুন পুরনো, ছোট বড়, উঁচু নিচু দালান আর দালান। দালানের আড়ালে পড়ে রইল লণ্ডন তার খ্যাতি আর রহস্য নিয়ে।

এই আমার ভূত-ভবিষ্যৎ, এই আমার বর্তমান, এই আমার পরিণতি।

কোনও দিন ভালো করে কিছু জানা হল না, কোনও দিন ভালো করে কিছু দেখা হল না।

বোঝাপড়ার আগেই হুইসিল, বিদায়বাঁশি।

আবার সেই হিথ্রো বিমানবন্দর। আবার প্যান-অ্যাম।

কিন্তু সম্ভবত ইচ্ছে করলে, চেষ্টা করলে অবশ্যই, দুচার রোজ লণ্ডন শহরে থাকা যেত।

কিন্তু সময়, সময় যে নাই। গরিব কেরানির হাতে মাত্র, নিতান্ত ছয় সপ্তাহ, সবেতন ছয় সপ্তাহ। বিনা বেতনে ছয় সপ্তাহ কেন, ছয় দিন পর্যন্ত আমার পক্ষে অকল্পনীয়।

তা ছাড়া ফ্র্যাঙ্ক কিংবা ভাস্কর কিংবা আর কেউ কোনও বন্ধু, কোনও আত্মীয় যেখানেই 'মাথা গুঁজি, বাক্স-বিছানা ফেলি, আমার ব্যক্তিগত খরচ কে যোগাবে? কার কাছে মুখ ফুটে চাইব। কবে, কীভাবে শোধ দেব। সুতরাং বিদায় লণ্ডন।

লণ্ডন বন্দনার সেই সামান্য কবির বর্ণিত সেই সব সোনায় মোড়া পথে হাঁটা হল না। সেই সব সুন্দরী মেমবালিকাদের সঙ্গে দেখা হল না, সাক্ষাৎ পরিচয় হল না। শুধু সামান্য একটু স্মৃতি সম্বল করে চলে যাচ্ছি। বিশাল মার্কিন ভূখণ্ড পরিক্রমা করে উলটো পথে যখন দেশে ফিরে যাবো লণ্ডন শহরের কথা ভালো করে মনেও থাকবে না।

শুধু কলকাতায় প্রাইভেট বাসের পিছনে যেমন লেখা থাকে, 'আবার দেখা হবে।' মনে মনে তাই বলে লণ্ডনকে বিদায় জানালাম।

আবার আসব।

পরের বার এসে থাকব। পরের বার এসে সব জিনিস দেখব। এই আশা মনে নিয়ে লণ্ডন থেকে বেরোলাম।

সে আশা অবশ্য এখনও পূর্ণ হয়নি। আমার এখনও পর্যন্ত আর দ্বিতীয়বার লণ্ডন যাওয়া হয়নি।

দশ

ওয়াশিংটন

'এখন আমি কারুর কোথাও যাবার কথা
শুনলে হঠাৎ চমকে উঠি,
এক নিমেষে ছলছলিয়ে ওঠে কেমন বুকের পুকুর।
কোথায় যাবে? কেন যাবে? এমনিতর প্রশ্ন শুধু
চোখের তারায়, ঠোঁটের রেখায়
কাঁপতে থাকে।'

—শামসুর রাহমান

যাওয়া ব্যাপারটা নিয়ে চিরকালই মানুষের মনে একটা সংশয় ছিল, খুঁতখুঁতানি ছিল। আমরা অল্পবয়সে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়, যখনই বলতাম, 'যাই', মা বলতেন, 'যাই নয়, বলো আসি।'

যাওয়া নয় আসা, যেখানে যতদূরেই যাই, ফিরে যেন আসি। যাও কিন্তু পুনরাগমন যেন হয়। আমরা বৎসরান্তে দেবী প্রতিমাকে বিদায় দিই, নদীর জলে বিসর্জন দেয়ার সময় বলি, 'আসছে বছর আবার এসো।' বিসর্জনের সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে পাড়ার ছেলেরা তারস্বরে গলা মিলিয়ে চেঁচায় যাতে এই পুনরাগমনের আবেদন মাটির প্রতিমার কানে পেঁছায়।

এককালে ভ্রমণ ছিল তীর্থগমন। তীর্থযাত্রা ছাড়া জীবিকা বা ব্যবসার প্রয়োজনে চিরকালই মানুষ ঘরছাড়া হয়েছে, তবে তাদের সংখ্যা অনুপাতে নগণ্য। তবে অজানার আকর্ষণে, অপরিচিতের আহ্বানে, দূরকে নিকট করবার চিরন্তন প্রাণের টানে কিছু কিছু মানুষ চিরদিনই ঘরছাড়া হয়েছে।

তীর্থযাত্রা এই সেদিনও দুর্গম ছিল। বৃদ্ধ সংসারীরা উইল, দানপত্র করে উত্তরাধিকারীদের হাতে বিষয়সম্পত্তির বিলিবন্দোবস্ত তুলে দিয়ে, তীর্থে যেতেন। প্রধান ভরসা নৌকো, নদীপথ।

বর্ষায় পুরীর রথযাত্রা, মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর, চৈত্রে বাবা বিশ্বনাথ।

রেলগাড়ির আগে নৌকোয় মহানদী হয়ে বঙ্গোপসাগরের তীর ধরে জগন্নাথধামে যেতে হত। গঙ্গাপথে যেতে হত কাশী ও গঙ্গাসাগর। পথে দস্যু-তস্কর ছিল। মহামারী ছিল। ঝড়ঝঞ্ঝা ছিল, ছিল অপরিসীম অনিশ্চয়তা। কত লোক যে নৌকোডুবিতে মারা যেত তার ইয়ত্তা নেই। এর পরেও ছিল খাড়ি আর খাদ। চড়াই আর উৎরাই। সুদুর্গম কেদারবদরি, আর আমাদের ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার ধর্মপিপাসুরা যেত গহন জঙ্গলে ভরা রহস্যময় কামাখ্যায়।

আর কজন মুসলমানই বা তাদের পবিত্র তীর্থ আজমির বা মক্কামদিনায় যেতে পারত। এখন দলে দলে লোক মক্কায় হজে যাচ্ছে। হজ করে আসা

মুসলমান হলেন হাজি। যেমন হাজি মহম্মদ মহসিন, সে ছিল ধর্মীয় গৌরবের, সাহসিকতার খেতাব। উত্তাল সমুদ্র এবং তার আগে ও পরে বিপজ্জনক স্থলপথ—তীর্থযাত্রীরা সবাই ফিরে আসতো না। আশেপাশের একশো গ্রাম খুঁজে একজন হাজি পাওয়া কঠিন ছিল।

এই সূত্রে একটা পুরনো দিনের ঘটনা মনে পড়ছে। আমাদের গ্রামের পাশের গ্রামে এক ডাক্তার ছিলেন। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। টাউনে যাওয়ার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার মোড়ে তেঁতুলতলায় বারোয়ারি ইঁদারার ধারে ছিল ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা টিনের চালার নীচে তাঁর ওষুধখানা, 'ইকনমিক হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারি'। সাইনবোর্ডে দোকানের নাম ছাড়াও লেখা ছিল, 'ডাক্তার হাজি আলতাফ হোসেন'।

ডাক্তার হাজি আলতাফ হোসেনকে, দুঃখের বিষয়, আশেপাশের গাঁয়ের লোক হাজি বলে মানত না। তাঁকে হাজি না বলে শুধু আলতাফ ডাক্তার বলে সম্বোধন করত। কেন যেন সকলেরই ধারণা ছিল ডাক্তার আলতাফ হোসেন হজ পর্যন্ত পৌঁছাননি। হজের মাসখানেক আগে গ্রাম থেকে বেরিয়ে তারপর হজের মাসদেড়েক পরে ফিরে এসে ঘোষণা করেছিলেন, 'হজ করে এলাম।' কিন্তু আলতাফ ডাক্তার সমুদ্র ও মরুভূমি পাড়ি দেওয়ার, মক্কা ও মদিনার যে সব গল্প করেছিলেন তা খুব বিশ্বাসযোগ্য ছিল না।

আর তা ছাড়া সে বছর আমাদের মহকুমার আরও কেউ কেউ হজে গিয়েছিলেন। তাঁরা কেউ আলতাফ ডাক্তারকে হজে দেখেননি তবে দু'একজন নাকি বোম্বাইতে দেখেছিলেন।

তাই অনেকে তাঁকে বলত বোম্বাইয়া হাজি। পুরো হাজি নয়, বোম্বাইয়া।

জানি না, জানার চেষ্টাও করছি না। ওই বোম্বাইয়া হাজির অবস্থায় পৌঁছে গেছি কি না আমি।

পুরনো ব্যাগটার মধ্যে আমার সেই বিদেশযাত্রার টুকিটাকি দরকারি অদরকারি সব কাগজপত্রই রেখে দিয়েছিলাম। ব্যাগ খুলে সব কাগজপত্র টেবিলে ছড়িয়ে বসেছি।

টুকরো টুকরো স্মৃতি। অনেক কিছু ভুলে গেছি, অনেক কিছু মনে আছে। অনেক কিছু ভুল মনে আছে। পুরনো কাগজ ঘেঁটে স্মৃতি ঝালিয়ে নিচ্ছি। আমার মনের অম্বর এখন মেঘমেদুর।

প্যান আমেরিকান এয়ার লাইনসের ফ্লাইট নম্বর একশো সাত। সরাসরি লন্ডন থেকে ওয়াশিংটন। ওয়াশিংটন ডি. সি। আতলান্তিকের এক তীর থেকে অন্য তীর। শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার দুই দুনিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা।

ওয়াশিংটন ডি. সি-র কথা একটু বলি।

মার্কিন রাজধানী ওয়াশিংটন নগরের নাম লিখতে গেলে সঙ্গে ডি. সি.ও লিখতে হয়। এই ডি. সি. মানে হল, ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া অর্থাৎ কলম্বিয়া জেলার ওয়াশিংটন।

আসলে ওয়াশিংটন নামে একটা রাজ্যও আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। সেটা অবশ্য এই ওয়াশিংটন ডি. সি. থেকে অনেক দূরে। একেবারে চূড়ান্ত উত্তর-পশ্চিমে কানাডার পাশে; প্রশান্ত মহাসাগর আর রকি পর্বতমালার ভৌগোলিক সীমানায়। সেই ওয়াশিংটন রাজ্যেই হল সিয়াটল। এরোপ্লেনের জন্য বিখ্যাত সিয়াটল, যাকে বলা হয় বোয়িং বিমানের দেশ।

পর পর দু'রাত্রি দিল্লিতে এবং লণ্ডনে ভালো ঘুম হয়নি। মাত্র দুই-এক ঘণ্টা করে ঘুমিয়েছি। ফলে লণ্ডন থেকে ওয়াশিংটন আসার পথে বার বার ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। এ যাত্রা জানালার ধারে সিট পেয়েছিলাম। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই জনপদ অতিক্রান্ত হওয়া মাত্র এবং মহাশূন্যে বিমান উঠে যাওয়ার পর গবাক্ষপথে শুধুই নীলিমা এবং বরফ ঢাকা পাহাড়ের মতো মেঘ এবং অস্পষ্ট মহাসমুদ্র। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় লণ্ডন ছাড়ার অল্প পরেই দু'একটা বিন্দুসম জাহাজ চোখে পড়েছিল। সেটা অবশ্য দৃষ্টিভ্রমও হতে পারে। তারপরে পুরো ব্যাপারটা খুবই একঘেয়ে। আভাতি বেলাশেষে লবণাম্বুরাশি, মহাকবি কালিদাসের সেই বর্ণনা যতই মধুর হোক। স্বচক্ষে বেশিক্ষণ দেখতে পারিনি।

দুই রাত্রির অনিদ্রাকাতর চোখ ঘুমে জড়িয়ে যাবে সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়। শুধু বিমানবালিকার আগ্রহাতিশয্যে ঘুম ভাঙানো চোখে লাঞ্ছ খেয়েছিলাম। দেখলাম, এ মেয়েটি আগের জনের মত নয়, সুহাসিনী, সুভাষিণী। আগের জন এবার আমাকে আবার ঘুমন্ত অবস্থায় পেলে হয়তো মাথায় গরম জল ঢেলে ঘুম ভাঙাত।

তা প্রায় ঘুমোতে ঘুমোতেই ওয়াশিংটন এসে পৌঁছলাম। আজকাল নাকি আর ওয়াশিংটন বা ওয়াশিংটন ডি. সি. বলতে হয় না, শুধু ডি সি বললেই হয়ে যায়।

তাড়াহুড়োর মধ্যে লণ্ডনে বিমানে উঠেছিলাম। আমার জিনিসপত্র ঠিক মতো এসেছে কি না ঘুম ভাঙার পর এই চিন্তাটাই প্রধান হয়ে দাঁড়াল।

বাথরুম থেকে মুখচোখে জল দিয়ে আসতে আসতেই সিট বেল্ট বাঁধার, সিগারেট নেবানোর নির্দেশ যথাস্থানে জ্বলে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যে বিমানের অভ্যন্তর থেকে ওয়াশিংটন তথা মার্কিন দেশে স্বাগত জানিয়ে মাইকে জানানো হল ওয়াশিংটনে এখন তাপমাত্রা, আবহাওয়া কিরকম। সেই সঙ্গে জানানো হল স্থানীয় সময়। তদনুযায়ী ঘড়ি মিলিয়ে নিলাম, এখন ওয়াশিংটনের দুপুর তিনটে। তার মানে কলকাতায় গহন মধ্যরাত, রাত দেড়টা।

আমেরিকার সব জায়গায় এক রকম সময় নয়। হনলুলু কিংবা আলাস্কার মত বিচ্ছিন্ন অঞ্চল বাদ দিলেও মূল মার্কিন ভূখণ্ডেই পূবে পশ্চিমে চার রকম সময়। কলকাতায় যখন দুপুর বারোটা, নিউইয়র্ক-ওয়াশিংটনে পূর্ব উপকূলে তখন রাত দেড়টা অথচ পশ্চিম উপকূল সানফ্রানসিসকোয় রাত সাড়ে দশটা। শুধু তাই নয়, শীতগ্রীষ্মে দিনের আলোর সঙ্গে মিলিয়ে সময়ের হ্রাস বৃদ্ধি

করা হয়। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে পিছিয়ে দেওয়া হয়। এই জিনিসটার একটা গালভরা নাম আছে, ডে লাইট সেভিং টাইম, দিনের আলো বাঁচানো সময়।

মধ্য জানুয়ারির ওয়াশিংটনের বিকেল। নামলাম ডালস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। এই সেই বহু বিতর্কিত মার্কিন বিদেশসচিব জন ফস্টার ডালস।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় আমি যখন দেশ থেকে কলকাতায় কলেজে পড়তে এলাম সেটা সেই কোরিয়া যুদ্ধের যুগ, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির যুগ। সেই সময়ে বোধহয় একবার ডালস সাহেব এদিকে এসেছিলেন। বহু ধিক্কার মিছিল বেরিয়েছিল, রাস্তায় রাস্তায় প্রসেশনে স্লোগান উঠেছিল, 'গো ব্যাক ডালস', অসংখ্য প্ল্যাকার্ডেও সে কথা লেখা ছিল।

আমি অবশ্য খুব সন্ত্রস্ত হয়ে বিমানবন্দরে অবতরণ করেছিলাম। আমার চিন্তা ওই একটাই, মালপত্রগুলো সব ঠিকমতো এসেছে তো।

একটা গোলমেলে গল্প এরই কিছুদিন আগে রিডার্স ডাইজেস্ট না অন্য এক অতিসাময়িক পত্রিকায় পড়েছিলাম।

এক যাত্রী বিমানবন্দরে তিনটি মাল নিয়ে গিয়েছে, সুটকেস, ব্যাগ আর হোল্ড-অল। তারপর কাউণ্টারে দ্রব্য তিনটি পেশ করে বলল, 'আমার এই সুটকেসটা যাবে প্যারিস, এই ব্যাগটা যাবে নিউ ইয়র্ক আর হোল্ডঅলটা কোথাও যাবে না এখানেই থাকবে।'

কাউণ্টারে কর্তব্যরত বিমান কোম্পানির কর্মচারী এই কথা শুনে অবাক, 'তা কি করে হবে? সে কি করে সম্ভব?'

প্রশ্ন শুনে যাত্রীটি পালটা প্রশ্ন করলেন, 'সম্ভব নয় কেন? গত মাসে আপনাদের এখান থেকে আমি যখন বাইরে যাই, আমার মালপত্রগুলো তখন কি করেছিলেন?'

হতবাক বিমান কর্মচারী বললেন, 'কি করেছিলাম?'

যাত্রী মহোদয় বললেন, 'কি করেছিলেন? আমি যা বললাম তাই করেছিলেন। আমার ব্যাগটা পাঠিয়েছিলেন নিউ ইয়র্কে, সুটকেসটা প্যারিস আর হোল্ড অলটা আপনাদের জিম্মাতেই রেখে দিয়েছিলেন।'

ভয়াবহ গল্প। গল্পটা আমার মনে গেঁথে বসে গিয়েছিল।

সুতরাং জিনিসপত্র হারিয়ে গেলে কি করব, কি করা যায় এই জাতীয় কাল্পনিক দুশ্চিন্তা নিয়ে বিমান থেকে কনভেয়র বেল্টের দিকে এগোচ্ছিলাম, এমন সময় এক দশাসই ব্যক্তি আমার পথরোধ করে দাঁড়াল।

লোকটি যথেষ্ট লম্বা চওড়া। মাথার চুল কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হলেও গায়ের রং কৃষ্ণাঙ্গদের মতো কালো নয়। তবে উজ্জ্বল গৌরাঙ্গও নয়। লাল নয়, তার গায়ের রং নয়নসুখকর লালচে। লোকটির চেহারায়, চাল-চলনে বেশ একটা খুশি-খুশি, আত্মীয়-আত্মীয় ভাব আছে। যেমন থাকে রিসেপশনের প্রোটোকলের লোকদের।

আমি তাকিয়ে দেখলাম লোকটি আমি ছাড়াও আরও কয়েকজনকে আটকেছে, তাদের পাশে আমাকে দাঁড় করিয়ে সে আমাকে কট্টর মার্কিনি উচ্চারণের ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কলকাতা থেকে আসছি কি না, আমি কবি কি না?' এই বলে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে একটা ছাপানো তালিকা খুঁজে আমার নাম বের করে মিলিয়ে নিল। তারপর আমার কাছ থেকে আমার পাসপোর্টটি চেয়ে নিল।

লক্ষ করে দেখলাম একটু দূরে সরে গিয়ে একটা কাউন্টারের আড়ালে আমার পাসপোর্টটা খুলে আমার ফটোটা বার করে সেই ছবির সঙ্গে খুব সতর্কভাবে আমার চেহারাটা মিলিয়ে নিল।

তার হাতে আমারটা ছাড়াও, আর বেশ কয়েকটা পাসপোর্ট। সবগুলো খুলেই সে একে একে আমার পাশের লোকদের চেহারার সঙ্গে সেগুলো মেলাল।

ইতিমধ্যে দূরে ভিড়ের মধ্যে আরেকজন যাত্রীকে দেখতে পেয়ে সে ছুটে গিয়ে তাকে পাকড়াও করল। কি করে যে সে তার অভীষ্ট ব্যক্তিদের চিনতে পারছে সে এক রহস্য।

এই লোকটির পরনে সেদিন ছিল উইন্ডচিটার এবং জিনস, পায়ে পেটেন্ট লেদারের ঝকঝকে জুতো। পরে এর সঙ্গে আরও দুয়েকবার ওয়াশিংটনে থাকার সময়ে দেখা হয়েছে, তখনও তার পরনে এই একই রকম বস্ত্রাদি, মার্কিন প্রলেটারিয়েটের মোক্ষম পোশাক।

লোকটির নাম স্মিথ, জন বা বিল, খুবই সাধারণ গোছের। অ্যাদ্দিন পরে আর মনে নেই। তবে লোকটিকে মনে আছে। জেনেছিলাম যে সে একজন মুলাটো। মুলাটো মানে মা-বাবার একজন যদি কৃষ্ণাঙ্গ অন্য জন যদি শ্বেতাঙ্গ হয়, তাদের সন্তান।

মুলাটো শব্দটি কিন্তু ভালো নয়। শব্দটি এসেছে স্পেনীয় ভাষা থেকে। যার সরাসরি মানে হ'ল খচ্চরের বাচ্চা।

নাম মনে নেই এই অজুহাতে এতদিন পরে বারংবার লোকটি লোকটি করা ভাল দেখাচ্ছে না। আপাতত তার নাম দেয়া যাক বিল, বিল সাহেব।

বিল সাহেব সরকারি কর্মচারী। খোদ মার্কিন সরকারের স্টেট ডিপার্টমেণ্টের রিসেপশন সেন্টারের লোক। তার দক্ষতাও অপরিসীম। তালিকা মিলিয়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সব নবাগত আমন্ত্রিতদের পাকড়াও করে তাদের পাসপোর্টগুলো নিয়ে সামান্য আড়াল করে মিলিয়ে দেখে সে অতিদ্রুত মালপত্র খালাস করিয়ে, পাসপোর্টের কাজকর্ম চুকিয়ে ফিরে এল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মার্কিন দেশে প্রবেশের সময় কিংবা মার্কিন দেশ থেকে বেরিয়ে আসার সময়, যাতায়াতের কোনও ক্ষেত্রেই পাসপোর্টে কোনও ছাপ দেওয়া হয়নি। সে পাসপোর্ট দেখে কখনই বোঝা যাবে না, অন্তত তখন যেত না, পাসপোর্টধারী কখনও কোনও কালে মার্কিনদেশে প্রবেশ করেছে না কি করেনি।

তবে যতদূর মনে পড়ছে, প্রবেশকালে আমার ঐ অকুলীন ভারতীয় ছাড়পত্রের পাতায় এক ফালি ছাপ্পামারা কাগজ পিন দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছিল। ফেরার সময় সানফ্রানসিসকোতে সেই কাগজের ফালিটুকুও বিমানবন্দরে অভিবাসন দপ্তরে রেখে দিল।

আমি অসহায় ভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নিতান্ত আমার রাইটর্সীয় কেরানির মনোবৃত্তি নিয়ে 'আমি যে আপনাদের দেশে এসেছিলাম তার রেকর্ড কি রইল?'

পিঙ্গলকেশী, নীলনয়না, শ্বেতাঙ্গিনী খিল খিল করে হেসে বলেছিলেন 'যদি চাও তো তোমার পাসপোর্টে একটা ছাপ্পা এখনই দিয়ে দিতে পারি', তারপর হাস্য সম্বরণ করে সেই অবিমৃষ্যকারিণী নিঃসন্দিগ্ধা বলেছিল, চলে যাওয়ার সময় এত চিন্তা করতে, এত মাথা ঘামাতে আমার এই সুদীর্ঘ চোদ্দ মাসের চাকরি জীবনে আর কাউকে দেখিনি।

তা এসব ফেরার কথা ফেরার সময়ে যথাস্থানে হবে।

এখন ওয়াশিংটনে যাই। ডালস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ঐ বিলসাহেবের জন্যে শুল্ক কিংবা অভিবাসন দপ্তরে কোনও সমস্যাই হয়নি।

তবে দাপট দেখেছিলাম কৃষি দপ্তরের। কৃষিদপ্তর জাঁকিয়ে বসেছে বিমানবন্দরে। গাছপালার, চারা বা বীজের তো প্রশ্নই নেই বিশেষ পরীক্ষা না করে কাউকে এক টুকরো ফলমূল নিয়েও ঢুকতে দেবে না।

আমার সঙ্গে এক হরলিকসের শিশি ভর্তি লেবু-বিটনুন দিয়ে জারক দেয়া জোয়ান ছিল মুখশুদ্ধির জন্যে। সেগুলো কি গাছের বীজ, আমি এই দেশের কোথায় সেটার চাষ করব, তাতে এই মহাদেশের কতটা ক্ষতি হতে পারে, এগুলো গাঁজা, ভাং না পার্থেনিয়ামের বীজ অতি নিচুগলায় চারজন বৃষস্কন্ধ উদ্ভিদপণ্ডিত তাই নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন।

বিল সাহেব, অবশ্য আমাকে উদ্ধার করল, মনে হল, জোয়ান জিনিসটা সে চেনে, এটা যে একটা মুখরোচক মুখশুদ্ধি সে বিষয়ে তার ধারণা আছে। হয়ত অন্য কোনও ভারতীয়ের কাছে অনুরূপ জিনিস দেখেছে। সে হরলিকসের শিশি থেকে কিছুটা জোয়ান তুলে নিজের মুখে ফেলল এবং উদ্ভিদ পণ্ডিতদেরও হাতে দিল। তার দেখাদেখি তাঁরাও জিনিসটা মুখে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি অব্যাহতি পেলাম।

এয়ারপোর্টের গেটে এসে বিল সাহেব আমাদের দু'দলে ভাগ করল। সেদিন নবাগত বা বিশেষ আমন্ত্রিতের সংখ্যা ছয় সাত জন হবে। সাধারণত এত নাকি হয় না। সামনেই তেলের দাম নিয়ে কি একটা মিটিং ছিল তাই আরব দেশ থেকে প্রতিনিধিরা এসেছে সেই আলোচনায়।

আমার স্থান হয়েছিল ডুপণ্ট প্লাজা হোটেলে। ওয়াশিংটন শহরের কেন্দ্রে ডুপণ্ট স্কোয়ার। সেখানেই প্লাজা হোটেল। একেবারে শহরের মাঝামাঝি এলাকা, এদেশে যাকে বলা হয় ডাউন টাউন।

ডুপণ্ট হোটেলের আমরা তিনজন। একটা বড় গাড়িতে আমাদের তিনজনকে

একসঙ্গে তুলে দেওয়া হল। এটা ঠিক ট্যাক্সি নয়, প্রাইভেট গাড়ি। আমাদের সামনেই ভাড়া চুকিয়ে ড্রাইভারকে যথাযথ নির্দেশ দিল বিল সাহেব।

অন্যদের নিতে এয়ারপোর্টে তাদের লোকজন এসেছিল। দ্বিতীয় দলের লোকদের তাদের উপযুক্ত হাতে তুলে দিয়ে বিল সাহেব আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিল। তার নিজের গাড়ি আছে, অদূরে তার সঙ্গিনী দাঁড়িয়ে অধীর প্রতীক্ষা করছে।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরোতে বেরোতে দিন গড়িয়ে গেল। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। যদিও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে বসে সেটা টের পাচ্ছিলাম না। কিন্তু গাড়িতে ওঠার সময়ে সেটা বুঝেছিলাম।

থার্মমিটারের পারদ এখনও শূন্য ডিগ্রিতে নামেনি। তবে শূন্য ছুঁই ছুঁই করছে। কলকাতার থেকে দিল্লিতে ঠাণ্ডা বেশি ছিল, দিল্লি থেকে লণ্ডনে ঠাণ্ডা বেশি ছিল, এখন ওয়াশিংটন লণ্ডনের থেকে শীতলতর। ঠাণ্ডার পৃথিবীতে আমার ক্রমোত্তরণ হচ্ছে।

ডালস বিমানবন্দর থেকে ওয়াশিংটন শহর, বেশ খানিকটা দূরে। পথে ঝোপঝাড়। জনবসতিহীন ঠাণ্ডা এলাকাও রয়েছে। গাড়িও খুব দেখলাম না।

এখানেও ছোট দিন, বড় দিন আছে। ছোট দিনের বেলা হঠাৎ শেষ হয়ে আঁধার ঘনিয়ে আসছে।

একদা বহুকাল আগে বিদ্যালয়ে আমার এক সহপাঠীকে মাস্টারমশায় বিজ্ঞানের ক্লাসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'গরমে বড় হয়। ঠাণ্ডায় ছোট হয় এর ভালো উদাহরণ কি?'

আমার বাল্যবন্ধুটি খুব সম্ভব রসিকতা করার জন্যেই সঙ্গে সঙ্গে উদাহরণ দিয়েছিল, 'দিন। গরমে বড় হয় আর ঠাণ্ডায় ছোট হয়ে যায় দিন।'

শীতে ছোট হয়ে যাওয়া অন্ধকার দিনশেষে অমরাপুরী ওয়াশিংটনের দিকে যেতে যেতে কেন যে এই বহুকাল আগের উদ্ভট গল্পটা মনে পড়েছিল।

এগারো

আমেরিকা-আমেরিকা

..."They admit that what appears to them today to be good, may be superseded by something better tomorrow."

—*Alexis de Tocqueville*

'তারা স্বীকার করে যে আজকে তাদের কাছে যা ভালো মনে হচ্ছে, আগামীকাল হয়তো তার চেয়ে ভালো কিছু এসে সেটাকে সরিয়ে দেবে।......

—আলেক্সিস দ্য টকভিল

(মার্কিন যুক্তরাজ্যে জনৈক ফরাসি পর্যটক, ১৮৪০ সালে।)

সরাসরি মার্কিন যুক্তরাজ্যের তথ্য দপ্তরের বহুল প্রচারিত 'দিস্ ইজ আমেরিকা', বা 'এই হল আমেরিকা' নামক প্রচার-পুস্তিকা থেকে দেড় শতাব্দী আগের জনৈক ফরাসি পর্যটকের উপরোক্ত উক্তিটি দিয়ে আমার আমেরিকা প্রবেশের সূচনা করলাম।

অবশ্য জনৈক শব্দটা এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত হল না। টকভিল, ঠিক কোনও সাধারণ ভ্রমণকারী নন। এই এতকাল পরেও টকভিল সাহেবের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। এমনকি কখনও কখনও আমেরিকার রাষ্ট্রপতির কথায়-বার্তায়, ভাষণেও দেড়শো বছর আগের এই ফরাসি ভ্রমণকারীর মন্তব্য উদ্ধৃত হয়।

টকভিলের বক্তব্যকে এতটা গুরুত্ব দেওয়ার একটা কারণ হল সেই অতকাল আগে তিনি মার্কিন সমাজ ও জীবনধারাকে যে ভাবে দেখেছিলেন, একজন বিদেশির চোখে সেই দেখা, তার মূল্য আলাদা।

আত্মপ্রশংসা অনেক সময়েই করা যায়। কিন্তু সবসময়ে সেটা সুরুচিকর নয়।

কিন্তু তার বদলে যদি একটি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা যায়, একটি প্রশংসা-বহুল সার্টিফিকেট, তাহলে সেটা মোটেই দৃষ্টিকটু হয় না।

টকভিল সাহেবের বক্তব্য মার্কিন তথ্য দপ্তরের পক্ষে সেই সার্টিফিকেটের কাজ করেছে।

টকভিল সাহেব মোদ্দা কথা যা বলেছিলেন, সাদা বাংলায় অনুবাদ করলে তা হল,

'আমেরিকানদের একটা জীবন্ত বিশ্বাস আছে মানুষের পরিপূর্ণতায়, তারা বিশ্বাস করে যে জ্ঞান বিস্তৃত হলে মানুষের উপকার হবে, অজ্ঞানতার ফলাফল মারাত্মক হতে পারে।...

'তারা বিবেচনা করে যে একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজের পথ ক্রমোন্নতি প্রসারী, মানবসমাজে কিছুই স্থায়ী নয়, স্থায়ী থাকবে না।

সতত পরিবর্তনশীল মার্কিন জীবন ও সমাজের কথা টকভিল সাহেব উল্লেখ করেছেন।

মনে রাখতে হবে, এটা আঠারোশো চল্লিশ সালের কথা। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে, পরাধীনতার বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম সংগ্রাম সিপাহি বিদ্রোহ এরও সতেরো বছর পরে আর, এর ঠিক সতেরো বছর আগে আঠারোশো তেইশ সালে ইতিহাসখ্যাত মনরো ডকট্রিন, যাতে মার্কিন মহাদেশে ইউরোপিয়ানদের ঔপনিবেশিক অভিযান চিরতরে বন্ধ করার প্রস্তাব ছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে আরও অনেক বড় সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল। যে সব ঘটনা মানব সমাজের ও সভ্যতার চেহারা ক্রমে ক্রমে পালটিয়ে দিচ্ছিল।

· আঠারোশো আটাশ সালে প্রথম রেলরাস্তা চালু হল আমেরিকায়। এক দশকের মাথায় চার্লস গুডইয়ার রবারের ব্যবহার নিয়ে যুগান্তকারী কাজ করে ফেললেন। শুধু তাই নয় এরই চার বছরের মধ্যে স্যামুয়েল ফিনলে ব্রিজ মর্স, এই সুদীর্ঘ নামের মর্স সিস্টেম প্রবর্তক অবিস্মরণীয় মানুষটি তারযন্ত্র উদ্ভাবন করে দূরকে নিকট করে ফেলেছেন। আজ আমি যে ওয়াশিংটন শহরে এসে পৌঁছেছি, প্রথম তারটি প্রেরিত হয়েছিল সেই ওয়াশিংটন শহর থেকে মেরিল্যান্ডের বালটিমোরে।

এত সব আমার জানার কথা নয়।

এই ভ্রমণকথা লিখতে গিয়ে অনেক রকম তথ্যের সম্মুখীন হচ্ছি যার কিছু কিছু লেখার খাতিরে পাঠকদের জানাতে ইচ্ছে করছে।

অন্য দিকে তথ্যবহুল ভ্রমণকাহিনী লেখার আমার মোটেই ইচ্ছে নেই।

বরং এখন সরাসরি ওয়াশিংটনের পথে রওনা হয়ে যাই।

নিচু ছাদ, পেট মোটা আমেরিকান গাড়ি। রীতিমত জবরদস্ত চেহারা। কিন্তু খুব আরামদায়ক সে কথা বলতে পারব না। গাড়িতে উঠতে গিয়ে কপাল ঠুকে গেল দরজায়, একটু বিব্রত ভাবেই গাড়িতে উঠে ডানদিকের জানালার পাশে বসলাম।

ডালস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমেছিলাম বিকেল তিনটের সময়। সব কাজকর্ম চুকিয়ে, এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ওয়াশিংটন আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে এল।

বিমানবন্দর থেকে আমার সঙ্গে একই গাড়িতে তিনচারজন একত্রে এসে-ছিলাম, গাড়িতে আমাদের সেভাবেই উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সে সময়ে পেট্রোলের দাম নিয়ে ওয়াশিংটনে কি একটা জরুরি আন্তর্জাতিক আলোচনা চলছিল। সেই আলোচনায় যোগ দিতে বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক লোক মার্কিন রাজধানীতে এসেছিলেন।

আমার সঙ্গে গাড়িতে এক ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি এক আরব দেশের তেল

দপ্তরের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। বেশ গণ্যমান্য লোক। যতদূর মনে পড়ে পরের দিন ওয়াশিংটন পোস্ট কাগজে তাঁর নাম দেখেছিলাম।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ হয়েছিল, ভদ্রলোকের সাজপোশাক বা চেহারা কিছুই আরব্য নয়। কোট প্যান্ট, টাই, মোটাসোটা ভারতীয় চেহারা। আমাদের মতই ইংরেজি বলেন, ভুলভাল নয়, তবে প্রাচ্যদেশীয় উচ্চারণ। শুনলাম পেশোয়ারে সরকারি স্কুলে লেখাপড়া করেছিলেন, তারপরে বিলেতে।

পেশোয়ারের সেই সরকারি স্কুলে কে এক চক্রবর্তী একজন বাঙালি শিক্ষক ইংরেজি পড়াতেন। আমি বাঙালি জানতে পেরে ভদ্রলোক আমাকে এ কথা বললেন।

দেখলাম ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের নাম জানেন। এবং কলকাতায় না এলেও একাধিকবার ঢাকায় গিয়েছেন।

ভদ্রলোক যখন শুনলেন যে আমি একজন কবি এবং ভিজিটর এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে কবি হিসেবে আমি একজন সরকারি অতিথি, বেশ অবাক হলেন। তারপর আমাকে বললেন, 'তুমি নিশ্চয় তোমার দেশের এক নম্বর কবি।'

আমি সবিনয়ে বললাম, 'না। ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। বরং আমি প্রধান খ্যাতিমানদের মধ্যে বোধহয় পড়ি না।'

তারপর তাঁকে বুঝিয়ে বললাম এই এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে নিয়মিতই লোকজন কবিশিল্পী যাতায়াত করে। তা ছাড়া আমলাতন্ত্র, সরকারি লাল ফিতের বন্ধন মুক্ত হয়ে অনেকেরই নাম সুপারিশের পর্যায়ে আটকে যায়।

অবশ্য আমাকে এত কথা ভদ্রলোক বলতে দিলেন না। তার আগেই আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখুন, আপনি যা বলছেন সে সব কথা এ দেশে বলতে যাবেন না। এরা বিনয়-টিনয় ভালো বোঝে না। আপনি সরাসরি বলবেন যে আপনি একজন খুব বড় কবি, বিরাট লেখক। টেগোরের পরে আপনার মত ক্ষমতাবান কবি আপনাদের ভাষায় আর হয়নি।'

ভদ্রলোকের উপদেশ শুনে আমি হো হো করে হেসে ফেললাম। ভদ্রলোকও হাসলেন।

ইতিমধ্যে আমরা ওয়াশিংটন এসে গেছি। ওয়াশিংটন শহরের ঠিক মাঝখানে ড্যুপণ্ট প্লাজা হোটেল, নিউ হ্যাম্পশায়ার এভিনিউতে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাস্তায় দোকান, বাড়িতে আলো জ্বলছে। পরিষ্কার ঝকঝকে পথঘাট। রাস্তায় পথচারীদের একটা বড় অংশই কৃষ্ণাঙ্গ।

নিউ হ্যাম্পশায়ার এভিনিউ শহরের প্রাণকেন্দ্র হলেও, হই-হট্টগোল তেমন নেই। বরং এত বড় বিখ্যাত শহরের পক্ষে একটু নিরিবিলিই বলা চলে। সামনে একটা পার্ক। বোধ হয় নাম ড্যুপণ্ট স্কোয়ার, সেই স্কোয়ারের নামেই হোটেলের নাম।

বিমানবন্দর থেকে মুলাটো ভদ্রলোক বলে দিয়েছিলেন হোটেলে নেমে হোটেলের কাউন্টারে আত্মপরিচয় দিতে।

আত্মপরিচয় বিশেষ দিতে হল না। আমি গিয়ে কাউণ্টারে দাঁড়াতে আমার নামটা জেনে নিয়ে আমার দিকে একটা খাম এগিয়ে দিল, তার ওপরে আমার নাম লেখা।

একটা চাবি ও আমার মালপত্র নিয়ে একজন পোর্টার আমাকে সঙ্গে করে পাশে একটা লিফটে উঠে আমার নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে দিল।

ঘর চারতলায়। সে দিক থেকে ভালো। খুব উঁচুতে উঠলে আমার কেমন মাথা ঘোরায় নীচের দিকে তাকালে। কেমন একটা অস্বস্তি লাগে, ভয় ভয় করে। চারতলা পর্যন্ত সে অসুবিধে হয় না।

এই ওপরের থেকে নীচে তাকানো মাথা ঘোরা নিয়ে ভারটিগো নামে একটা রোমহর্ষক সিনেমা করেছিলেন আলফ্রেড হিচকক, পঞ্চাশের দশকে।

সে যা হোক, ঘরটি ভালো। ভালো হোটেলে যেমন হয় দেওয়াল পর্যন্ত কার্পেট, শোয়ার জায়গা, বসার জায়গা, লম্বাচওড়া বাথরুম, ঠাণ্ডা জল, গরম জল। পরিচ্ছন্ন বিছানায় ধবধবে সাদা চাদর। পায়ের কাছে ভাঁজ করা নরম, লাল কম্বল। তবে বালিশ মাত্র একটা।

পরে দেখেছি কোথাও কোনও হোটেলেই একটার বেশি বালিশ দেয় না। অথচ কলকাতায় একাধিক মাথার বালিশ, কোল বালিশ এবং রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় স্ত্রীর কাছ থেকে চুরি করে সরিয়ে নেওয়া আরও দুয়েকটি বালিশ সবশুদ্ধ বিছানায় চার-পাঁচটি বালিশ দখলে না রাখতে পারলে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

সেণ্ট্রাল হিটিং, রাস্তার পাশে লম্বা, টানা কাচের জানলা, সাদা পর্দা দিয়ে ঢাকা। সে জানলা সবসময় বন্ধ, খোলা অসম্ভব। ছিটকিনি-জাতীয় কোনও কিছু চোখে পড়ল না।

এদিকে ঘরে ঢোকার দরজা বন্ধ করে দিলে এই ঘর একেবারে নিশ্ছিদ্র। একবিন্দু বাইরের হাওয়া আসবে না, লখিন্দরকে বাসরঘরে যে সাপ কামড়েছিল সেই সাপও প্রবেশ করতে পারবে না। একেবারে লোহার সিন্দুক।

এ ব্যাপারটাতেও আমার খুব অসুবিধে। একটু খোলা হাওয়া না পেলে আমার দমবন্ধ হয়ে আসে, কেমন হাঁসফাঁস লাগে। বিমানের ভেতরেও আমার এই অসুবিধে হয়। তবে প্লেনে সিটের ওপরে একটা করে খুব ছোট অতি দ্রুত ঘূর্ণায়মান বল আছে তার থেকে হাওয়া বেরোয়, সেটা পাখার কাজ করে।

কিন্তু এ ঘরে কোনও পাখাও নেই। থাকার কথাও নয়। চেষ্টা করলাম জানলার পাল্লাটা একটু তুলে দিতে। অবশ্য বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তাতেও যথেষ্ট অসুবিধে হবে। তবে লক্ষ করে দেখেছি একটু অন্যমনস্ক থাকলে নিঃশ্বাসের কষ্টের অসুবিধেটা চলে যায়। অর্থাৎ ব্যাপারটা পুরোপুরিই মানসিক।

অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টাতেই জামাকাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে লুঙ্গি, পাঞ্জাবি পরে বিছানায় চিৎপাত হলাম। এই সময়ে এক কাপ চা হলে খুব ভালো লাগত। হোটেলের রুম সার্ভিসে ফোন করলে নিশ্চয় চা পাঠিয়ে দেবে। বিছানার পাশেই তেপায়ার ওপরে টেলিফোন রয়েছে, তার গায়ে স্পষ্ট নির্দেশ

রয়েছে ফোন তুলে বোতাম টিপলেই রুম সার্ভিস পাওয়া যাবে।

কিন্তু সাহস হল না। এক কাপ চায়ের কি দাম, কি ল্যাঠা কে জানে। তা ছাড়া আমেরিকায় প্রবেশ করেই এতবড় একটা দুঃসাহসী কাজ। রুমসার্ভিসে ফোন করে হোটেলের ঘরে চা এনে খাওয়া, আমার পক্ষে সম্ভব হল না।

বিছানায় শুয়ে হোটেলের কাউন্টারে পাওয়া খামটা খুললাম।

বেশ ভারী খাম। বড় আকারের। সেটা খুলতে দুটো সাধারণ লম্বাটে খাম বেরোল। দুটোতেই আমার নাম লেখা। প্রথমটিতে একটি চিঠি। দ্বিতীয়টিতে আমার প্রথম সাতদিনের খরচখরচা বাবদ একটি চেক।

এ ছাড়া ওই বড় খামটির মধ্য থেকে বেরোল ওয়াশিংটনের একটি ম্যাপ, ওই 'দিস ইজ আমেরিকা' নামক তথ্য পুস্তকটি এবং আরও কিছু প্যামফ্লেট ও হ্যান্ডবিল ধরনের ওয়াশিংটন সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি ও বিজ্ঞাপন।

চিঠিটা মন দিয়ে পড়লাম।

চিঠিটি লিখেছেন শ্রীমতী রোজ মেরি এমস নাম্নী এক মেমসাহেব। মেরিভিয়ান হাউস ইন্টারন্যাশনালের ভিজিটর প্রোগ্রাম সার্ভিস থেকে তিনি আমাকে আমেরিকায় স্বাগত জানিয়েছেন।

শ্রীমতী এমস আমাকে জানিয়েছেন যে কয়েকদিন ধরেই বেশ ঝড়ঝঞ্ঝা বৃষ্টিপাত চলেছে। তুষারপাত আসন্ন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এই আবহাওয়ায় আমার হয়তো কিঞ্চিৎ অসুবিধে হবে। বিশেষ করে ঠাণ্ডায়, কারণ আমি গরমের দেশ থেকে এসেছি।

এর পরে কাজের কথা! আমাকে পরের দিন সোমবার ষোলোই জানুয়ারি সকাল দশটায় ভিজিটর প্রোগ্রাম সার্ভিসের অফিসে যেতে হবে। অফিসটা কাছেই, ম্যাসচুসেটস এভিনিউতে। সেখানে আমার সঙ্গে একত্রে বসে আমার মার্কিন ভ্রমণসূচি তৈরি করা হবে। এ দেশে আমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন যাঁরা আছেন, যাঁদের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই তাঁদের সকলের নাম-ঠিকানা যেন আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাই ওই আলোচনার সময়, তাহলে তদনুযায়ী আমার ভ্রমণ তালিকা প্রস্তুত হবে। এই চিঠির মধ্যেই ভিজিটর প্রোগ্রাম সার্ভিস আমাকে পরের দিন মধ্যাহ্নভোজেও আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

দ্বিতীয় খামটিতেও আর একটা চিঠি ছিল, চেকের সঙ্গে। তাতে বলা আছে যে আমার হোটেলখরচা, থাকাখাওয়া বাবদ প্রথম সপ্তাহের জন্যে এই টাকা দেওয়া হল। কোনও কারণে খরচ যদি বেশি হয়ে যায়, সে দায় অবশ্যই আমাকে বহন করতে হবে। তবে আমাকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে পরের কিস্তির টাকা যথাসময়ে, যথাস্থানে, মানে তখন আমি যেখানে থাকব, আমার কাছে পৌঁছে যাবে।

জানি না, কখনও কোনও আমন্ত্রিত অতিথি পুরো ভ্রমণকালের সমস্ত পাথেয় এক সঙ্গে হাতে পেয়ে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল কি না অথবা সে থোক টাকাটা হারিয়ে ফেলে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। তাই এই আমেরিকান সতর্কতা।

চেকের সঙ্গে চিঠি ছাড়াও ছোট একটা মুদ্রিত চিরকুট ছিল। তাতে লেখা আছে চেকটা ভাঙানো যাবে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাঙ্কের নিকটবর্তী শাখায়। ওই শাখা অফিস সামনের স্কোয়ারের ওপাশেই, অল্পদূরে। সকালবেলাতেই ব্যাঙ্ক খুলে যায়। দরকার পড়লে আমি কাল সকালেই চেকটা ভাঙিয়ে নিতে পারি।

পথশ্রমে ক্লান্ত, বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিঠিপত্র পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙল, বালিশের নীচের থেকে হাতঘড়িটা বের করে দেখি রাত দেড়টা। উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম।

সব শুনশান। রাস্তায় কোনও লোকজন নেই। কচ্চিৎ কদাচিৎ নিঃশব্দে দুয়েকটা গাড়ি যাচ্ছে। তবে কাছে দূরে কয়েকটা বাড়ির কাচের জানলায় তখনও আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে, যেমন আমার ঘরে জ্বলছে অন্য একটা জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একটা অতিকায় আয়তনের কালো ল্যাব্রাডর কুকুর কোনও বাড়ি থেকে ছাড়া পেয়ে খুব ধীর গতিতে রাস্তা শুঁকে শুঁকে যাচ্ছে।

একটু পর টের পেলাম প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। হয়তো খিদের জন্যেই ঘুমটা ভেঙেছে।

এই বিদেশ বিভুঁয়ে অচেনা শহরে এই শেষ রাত্রে কোথায় খাবার খুঁজতে বেরোব। তখন কি জানি যে রোববারের রাত, আমার হোটেলের একতলার রেস্তোরাঁটাই রাত দুটো পর্যন্ত খোলা।

কিন্তু খিদেয় কষ্ট পাওয়া সে রাতে আমার কপালে ছিল। বেলা একটা নাগাদ দুপুরে প্যানআমের বিমানে একটা বড় লাঞ্চ খেয়েছিলাম। সে কখন হাওয়া হয়ে গেছে। এখন একমাত্র উপায় পেটে গামছা বেঁধে শুয়ে থাকা, তাতে নাকি খিদের যন্ত্রণা কমে। কিন্তু দেশের থেকে আসার সময় গামছা আনিনি, সম্ভ্রান্ত সাহেবদের দেশ তাই একটা তোয়ালে এনেছি, তার বাঁধন তত শক্ত হবে না।

ঘরের মধ্যে একটা ফ্রিজ ছিল। সেটা খুলে দেখলাম ধুধু। তবে এক বোতল জল আছে। ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সোমবার সকালে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ে রাস্তার পাশে একটা ছোট রেস্তোরাঁয় চা, রুটি, চিজ খেয়ে ক্ষুধা-নিবৃত্তি হল।

পকেটে আর সামান্যই অবশিষ্ট আছে। স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে শর্টকাট করে ব্যাঙ্কের দিকে রওনা হলাম। শর্টকাটের কাজটা বুদ্ধিমানের মত হয়নি। একটা রাহাজানি হতে পারত, সে ঘটনা পরে বলছি।

ব্যাঙ্ক থেকে চেক ভাঙিয়ে যখন বেরোলাম তখনও দশটা বাজতে অনেক দেরি। হাতে অনেকটা সময়। আনমনে নতুন শহরে আশ্চর্য হয়ে হাঁটাহাঁটি করতে করতে হঠাৎ চোখে পড়ল আমার সামনেই পাতাল রেলের স্টেশনে যাওয়ার রাস্তার সঙ্কেত।

ওয়াশিংটনে আমি সেই প্রথম পাতাল রেল চড়ি।

লণ্ডনে চড়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু সময় পাইনি। তবে লণ্ডনের টিউব রেল অনেক কালের পুরনো আর তখন ওয়াশিংটনে পাতালরেল আনকোরা, টাটকা, সদ্য চালু হয়েছে।

সেই সময়ে কলকাতাতেও পাতাল রেলের বিরাট যাগযজ্ঞ, এলাহিকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। বড় বড় প্রাচীন সব রাস্তা খুঁড়ে ফেলা হয়েছে। বিশাল বিশাল মাটির স্তূপ, কলকাতার পেটে পেটে যে এত মাটি ছিল তা কে জানত। অনেকে প্রস্তাব দিল এই সব মাটি একত্রে ঢিবি করে ময়দানে একটা কৃত্রিম পাহাড় করা হোক।

কলকাতার পাতাল রেলের ব্যাপারটা কিন্তু খুব গোলমেলে। আজ পনেরো বছর ধরে প্রত্যেক বছরেই শোনা যাচ্ছে তার পরের বছরেই দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত সরাসরি পাতাল রেল যাবে।

এত লম্বা একটা রেলপথ মাটির নীচে, এই রকম জনাকীর্ণ একটা শহরে পরিকল্পনাটা গোড়াতেই ভুল ছিল। এক সঙ্গে পুরো কাজটা আরম্ভ করাই ঠিক হয়নি।

অত বড়লোকের শহর ওয়াশিংটন। তারা শুনলাম প্রতি তিনচার বছরে একটা করে স্টেশন এগোচ্ছে। পুরোটা অনেক দিনের প্রোগ্রাম। আমি যখন ওয়াশিংটনে তখন সাড়ে চার কিলোমিটার টিউবরেল বসেছে। পরের স্টেশনের দিকে কাজ এগোচ্ছে।

তবে মনে পড়ছে, পাতাল রেলে চড়ার চেয়ে পাতাল রেলের টিকিট কাটায় অনেক বেশি মজা পেয়েছিলাম। এখন কলকাতাতেও পাতাল রেলে যান্ত্রিক টিকিট কাটার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ওয়াশিংটনে একটা জিনিস দেখেছিলাম, যা বোধহয় এখনও কলকাতায় হয়নি।

পাতাল রেলে ওঠার আগে যন্ত্রে টিকিট কাটলাম। যন্ত্রের কাছে খুচরো ছিল না, খুচরো ফেরত দিতে পারল না। কিন্তু টিকিটে লেখা ছিল। পরের স্টেশনে নেমে বেরোনোর মুখে স্লটে টিকিটটা ঢুকিয়ে দিতেই আগের স্টেশনের খুচরোটা ফেরত পেয়ে গেলাম।

বারো

অজানা দেশে তারাপদ

'অজানিত সমধর্মা কত
দেশে দেশে আমাদেরই মতো
জীবন মাতাল,
উহারাই মোদের সমাজ
মান যেন উহাদেরই মাঝ
লভি চিরকাল।'

—অন্নদাশঙ্কর রায়

মনের ভুলে, প্রায় কলম ফস্কিয়ে এই পরিচ্ছেদের নামকরণটা কেমন যেন রোমাঞ্চকর, ছমছমে হয়ে গেল।

অথচ আরম্ভ করেছিলাম অন্নদাশঙ্করের বিশ্বমানবতার বন্দনা দিয়ে।

কারণ অবশ্য একটা আছে।

ওই যে আগের পরিচ্ছেদে ড্যুপণ্ট স্কোয়ার পার হওয়ার সময়ে ছিনতাই-কারীর হাতে পড়ে যাওয়ার ঘটনাটা এড়িয়ে গেলাম, পরে লিখব বলে, সেই ঘটনাটাই বার বার কলমের নিবের ফাঁকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

তবে ওই একটা ঘটনাই নয়। সর্বসমেত আমি ঠিক তিনবার মার্কিনমুলুকে বিপদে পড়েছিলাম। সব কটি আমি আপাতত এক সঙ্গে লিখছি, অন্যথায় পরবর্তীকালে যথাস্থানে মনে না পড়তেও পারে। তখন অযথা অবচেতন মনে এবং কলমের নিবের ফাঁকে এরকম ছমছমে আতঙ্কের সঞ্চার হবে।

এক নম্বর ঘটনায় আসি।

ব্যাপারটা একটু ঝালিয়ে নিচ্ছি। আমেরিকায় প্রথম সকাল সেটা আমার। আগের দিন সন্ধ্যায় ড্যুপণ্ট স্কোয়ারের পাশে ড্যুপণ্ট প্লাজা হোটেলে উঠেছি। তারপর আর হোটেলের ঘর থেকে বেরোইনি। সকালে ঘুম থেকে উঠে শেষ সম্বল দিয়ে একটা রেস্তোরাঁ থেকে প্রাতরাশ করেছি। আমার কাছে আর নগদ টাকা কিছু নেই। একটা চেক ভাঙাতে যাচ্ছি ড্যুপণ্ট স্কোয়ারের অপর পাশে একটা ব্যাঙ্কে।

ব্যাঙ্কটায় ড্যুপণ্ট স্কোয়ারের পাশ দিয়ে গোল হয়ে ঘুরে বড় রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায়। আবার ড্যুপণ্ট স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে শর্টকাট করাও যায়। যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী ভবন থেকে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে গোলদিঘির মধ্যে দিয়ে যাওয়া যায় আবার বড় রাস্তা ধরে কলেজ স্ট্রিট বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট হয়েও যাওয়া যায়। তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে গোলদিঘি সদাসর্বদাই জনাকীর্ণ, এমনকি সাতসকালে। সাঁতার,

ব্যায়ামাগার ইত্যাদির মানুষজন, সেই সঙ্গে পথিক ও প্রাতঃভ্রমণকারীরা। ড্যুপণ্ট স্কোয়ার তা নয়, গোলদিঘির থেকে আকারে অনেক বড় এবং স্বভাবতই নির্জন।

আমি ড্যুপণ্ট স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে শর্টকাট করে পার হচ্ছিলাম। গায়ে অনভ্যস্ত ওভারকোট, গলাবন্ধ কোটপ্যাণ্টের গরম সুটের ওপরে ওভারকোট। অভ্যন্তরে আরও অনেক কিছু। তদুপরি হাতে দস্তানা, গলায় মাফলার, মাথায় কানঢাকা বানর টুপি। এই বানর টুপিটাকে আগে খেয়াল করিনি। ওয়াশিংটনে এসে হোটেলের ঘরে বাক্স খুলে বাক্সের পকেটে এটা পেলাম। বানরের গাঢ় লোমের মত বেশ কালচে উলে একটা মাথাঢাকা চোখ নাক খোলা বানর টুপি। আমার দয়াবতী স্ত্রী কখন কোন অবসরে এটা কিনে বাক্সের ভেতরে ভরে রেখেছেন।

হোটেলের আয়নায় টুপিটা মাথায় দিয়ে দেখেছি। বানর টুপিটা আমাকে চমৎকার ফিট করেছে, চমৎকার মানিয়েছে আমাকে টুপিটা পরে, আমার ব্যক্তিত্ব জাহির হয়েছে।

হুহু ঠাণ্ডা, শীতের জমাট সকাল। আকাশে অবছায়া সূর্য উঠেছে। কিন্তু সূর্যকিরণে কোনও তাপ নেই। প্রায় নির্জন ড্যুপণ্ট স্কোয়ার। শীত তাড়ানোর জন্যে আমি যথাসম্ভব দ্রুত হাঁটছি। হঠাৎ দেখলাম, অনতিদূরে পার্কের রাস্তার একপাশে একটা লোক শুয়ে রয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গ। প্রথমে ভেবেছিলাম ঘুমিয়ে আছে। তারপর দেখলাম, না জেগে আছে, চোখ দুটো খোলা। বার্নিশ-কালো মুখের মধ্যে রক্তহীন দুটো সাদা চোখ ঝকঝক করছে।

শায়িত অবস্থাতেই লোকটা আমাকে একটু মাথা উঁচু করে দেখল। রীতিমত হিংস্র দৃষ্টি। ঘটনার ভাবগতিক আমার ভালো মনে হচ্ছিল না। চারদিকে আশেপাশে এক পলক তাকিয়ে দেখলাম তেমন কাউকে দেখতে পেলাম না।

আমি হাঁটার গতি কমালাম না। কিন্তু টের পেলাম সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও আমি ঘামছি। কোনও রকমে পা চালিয়ে লোকটিকে পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু চরম মুহূর্তে ঠিক যখন প্রায় পার হয়ে যাচ্ছি, লোকটা আবার মাথা তুলল। মাথা তুলে একটা কাঁপা হাত তুলে আমাকে কি একটা বলল।

এড়িয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না ভেবে দাঁড়ালাম। লোকটা মাথা তুলে আমাকে কিছু একটা আদেশ করছে। একই বাক্য দু-তিনবার বলার পরে বুঝতে পারলাম যে জড়ানো ইয়াঙ্কি ইংরেজিতে সে বলছে, 'গিভ মি ফাইভ ডলারস' অর্থাৎ 'আমাকে পাঁচটা ডলার দাও।'

অবশ্য কথাটা সে এতটা স্পষ্ট করে বলেনি। যতদূর মনে পড়ছে ফাইভ ডলারস না বলে ফাইভার বলেছিল। ফাইভার মানেও পাঁচ মুদ্রার একটি নোট, পাঁচ টাকা, পাঁচ পাউণ্ড বা পাঁচ ডলার। আর গিভ মি শব্দ দুটোরও জোড়া দেওয়া সন্ধিবন্ধ উচ্চারণ, জি আই এম এমই যার যুক্ত বানান।

কিন্তু প্রাণের দায়েই বোধহয় আমি লোকটির আদেশের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারলাম। বুঝতে পারলাম একটা বড় বিপদের সম্মুখীন হতে হয়তো

যাচ্ছি। এ রকম ঘটনার কথা অনেক পড়েছি, শুনেছি ; এবার আমার ক্ষেত্রে ঘটতে যাচ্ছে।

তবু আমি শেষ চেষ্টা করলাম। সত্যি কথাটা দ্রুত বলে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলার গতিটা আর একটু বাড়িয়ে দিলাম।

সত্যি কথাটা হল, 'পাঁচ ডলার কেন দু ডলার বা এক ডলারও আমার কাছে নেই। পকেটে বড় জোর দু-চার সেন্ট খুচরো অবশিষ্ট পড়ে থাকতে পারে।' অবশ্য এ কথা বললাম না যে ব্যাঙ্কে চেক ভাঙাতে যাচ্ছি, তা হলে হয়তো চেকটাই দাবি করে বসবে।

লোকটা কিন্তু আমার কথায় সন্তুষ্ট হল না। সন্তুষ্ট হওয়ার কথাও নয়। অত্যধিক ক্ষিপ্রতায় আমার দিকে একটু থুতু ছিটিয়ে সে দ্রুত গতিতে উঠতে যাচ্ছিল আমাকে ধরবে, কিন্তু আমার ভাগ্য ভালো ছিল, লোকটা উঠতে পারল না, মুখ থুবড়ে পার্কের ওপরে পড়ে গেল। বোধ হয় নেশাচ্ছন্ন ছিল, ড্রাগ বা মদ। লোকটা পড়ে গিয়ে আর ওঠার চেষ্টাও করল না। তবে ততক্ষণে আমি পার্ক অতিক্রম করে বাইরের সদর রাস্তায় এসে গেছি।

আমার বিপদের পরবর্তী ঘটনাটি ঘটেছিল, এর প্রায় দিন দশেক পরে, নিউ ইয়র্ক শহরে।

তবে এখানে বলে রাখি ঘটনাটি যে বিপজ্জনক তা আমি ঘটনাকালে একেবারেই বুঝতে পারিনি। নিতান্তই গ্রাম্য সরলতাবশত আমি এমন একটা বোকামি করেছিলাম, বহুমূল্য বোকামি, যা আমাকে রক্ষা করেছিল।

তখন আমার এক প্রতিবেশীর ভাইঝি, বিয়ে হয়ে, নিউ ইয়র্কে থাকে। তার বর মানহাটানে একটা ভারতীয় ব্যাঙ্কের কর্মচারী। আমাদের পাড়ার মেয়ে, তার ছোটবেলা থেকে আমি তাকে দেখেছি, স্নেহ করি। এই সেদিন, মাত্র বছর দুয়েক আগে তার বিয়েতে ম্যারাপের গেটে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সারা সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে বরপক্ষকে অতিথি অভ্যাগতকে স্বাগত জানিয়েছি।

মেয়েটির বিধবা মা, পাড়া সম্পর্কে আমরা মণিবৌদি বলতাম। তিনি মহীয়সী মহিলা ছিলেন, আমাকে খুব পছন্দ করতেন, আমার উল্টোপাল্টা হিজিবিজি সব অখাদ্য লেখা পড়তেন। মণিবৌদি অতি সম্প্রতি প্রকাশ্য দিবালোকে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত দিনেদুপুরে সজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে হার্টফেল করে পরলোক গমন করেছেন। এই সূত্রে তাঁর একটু স্মৃতিতর্পণ করা গেল।

সেই মণিবৌদি আমাকে রওনা হওয়ার আগের দিন মেয়ে-জামাইয়ের ঠিকানা দিয়ে বলেছিলেন যদি নিউ ইয়র্ক যাই, আমি যেন ওদের ঘরকন্না একটু দেখে আসি।

মণিবৌদি যথেষ্টই উদারমনা ছিলেন এবং সেইসঙ্গে কোনও অজ্ঞাত কারণে প্রাচীনপন্থীও ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে দিতেন এবং আমাকে ঠাকুরপো সম্বোধন করতেন। নাগরিক বাঙালি হিন্দু সমাজে পাড়াতুতো দেবরকে সেটাই সম্ভবত শেষ 'ঠাকুরপো' সম্বোধন।

মণিবৌদির অনুরোধের উপরে আমি বলেছিলাম, 'আমেরিকা যাব আর নিউ ইয়র্ক যাব না, নিউ ইয়র্ক যাব আর তোমার মেয়ের ঘরসংসার দেখে আসব না, তার নরম হাতের রাঁধা ডাল-ভাত-মাছের ঝোল খেয়ে আসব না ?'

মণিবৌদি মাথা থেকে স্খলিত ঘোমটা যথাস্থানে টেনে ফেরত দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি জানতাম।'

কিন্তু মণিবৌদি কি জানতেন, এক অক্ষম রচনাকার এই রকম গুরুচণ্ডালি, এলোমেলো ভাষায় এই রকম এক হাস্যকর রচনায় তাঁকে স্মরণ করবে।

আর যাই হোক, আমি জানি, আমার চেয়ে ভালো করে আর কে জানে, ঝাপসা নীল দিগন্তে এই কাঁচা হাতের অসফল ম্যাজিক তাঁর মোটেই ভালো লাগত না।

কিন্তু সে তো অন্য কথা।

আসল কথায় যাই।

তা সেই মণিবৌদির মেয়ে-জামাইয়ের বাড়ি থেকে একদিন সান্ধ্য নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরছিলাম। কথায় কথায় গল্পে গল্পে রাত প্রায় এগারোটা হয়ে গিয়েছিল। তবে নিউ ইয়র্কের পথে সেটা খুব বেশি রাত কিছু নয়।

চমৎকার রান্না করেছিল মেয়েটি। গরমভাতে খাঁটি মাখন, আলুভাজা, মুগের ডাল, প্রায় ইলিশের মত স্বাদের একটু অন্য রকম আকারের মাছের লঙ্কাবাটা জিরে ফোড়ন দেয়া ঝাল। দেশ থেকে কাচের বোতলে নিয়ে আসা তেঁতুলের মিষ্টি মশলা আচার আর সেই সঙ্গে স্নেহশীলা উইসকন্সিন গাভীর দুধের ছানা কেটে ঘরে তৈরি অতিকায় কাঁচাগোল্লা।

একটু এদিক-ওদিক হতে পারে। তবে খুব পেট পুরে চেটেপুটে খেয়েছিলাম, সেটা মনে আছে।

মেয়ে-জামাই দুজনেই আমাকে তাদের গাড়িতে হোটেল পর্যন্ত পেঁছোতে বেরোচ্ছিল। আমি বললাম, 'তার দরকার নেই।' জামাইয়ের আবার সকাল সাড়ে ছটার মধ্যে কাজে বেরোতে হয়। আমার উইক-এণ্ডেই আসা উচিত ছিল। কিন্তু তখন আর আমি নিউ ইয়র্কে থাকব না।

সে যা হোক, আমি ওদের বললাম, 'তোমরা আমাকে একটা টিউব রেলের স্টেশনের কাছে পেঁছে দাও, সেখান থেকে আমি চমৎকার চলে যাব।'

তাই হল। যথাস্থানে এসে নামলাম। নিউ ইয়র্কের টিউব রেল থেকে যাত্রীরা ঝড়ের গতিতে নামে আর রেলে ওঠে ঘূর্ণিবাত্যার গতিতে। আমি ধীরভাবে এগোচ্ছিলাম। চারদিক দেখতে দেখতে। দেয়ালে অনেক কিছু রকমারি লেখা শিষ্ট-অশিষ্ট, শ্লীল-অশ্লীল, নিতান্ত ব্যক্তিগত—চূড়ান্ত আন্তর্জাতিক।

আনমনে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি চারদিক ফাঁকা। কোনও লোকজন প্রায় নেই। এ রকম নাকি হয়। রাতে-বিরেতে যখন ট্রেন কম চলে একটা ট্রেন আসার পর আর একটা ট্রেন আসা পর্যন্ত মধ্যের দু-চার মিনিট এরকম শুনশান ফাঁকা হয়ে যায়।

হঠাৎ দেখি ঠিক ফাঁকা নয়। আমার সামনে একেবারে দেয়াল ঘেঁষে এক মূর্তিমান হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। টকটকে ফর্সা, ঘোলাটে চোখ। অবিন্যস্ত কেশ, বাদামি জ্যাকেট পরিহিত এক যুবক। লোকটি সম্ভবত হিস্পানিক, সে আমাকে কিছু বলল। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না।

লোকটি বোধহয় ভাবেনি যে আমি ওর কথাবার্তা বুঝতে পারব না। সে এবার হাসিমুখে তার জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা চকচকে ক্ষুদ্রাকার রিভলভার বার করে আনল, সেটা বার করে হাতে নাচাতে লাগল।

আমি বুঝতে পারলাম লোকটি আমার কাছে রিভলভারটা বেচার চেষ্টা করছে। শুনেছিলাম নিউ ইয়র্কে আগ্নেয়াস্ত্র এভাবে লাইসেন্স ছাড়া কেনা-বেচা হয়। ব্যাপারটা বেআইনি, কিন্তু হয়।

কিন্তু আমি রিভলভার দিয়ে কি করব! ছাপোষা, গৃহস্থ মানুষ। অতি বড় বিপদে পড়লেও এ রকম একটা যন্ত্র হাতে ধরার যোগ্যতা বা সাহস আমার হবে না। কথাটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম আমি নরম ছাড়াছাড়া ইংরেজিতে, বোধ হয় সে সেটা বোঝেনি। লোকটি আরও ঘন ঘন রিভলভার নাচাতে লাগল।

তখন আমি নানা রকম ভাবভঙ্গি করে লোকটিকে যথাসাধ্য বোঝাতে চাইলাম যে আমি নিতান্ত বিদেশি মানুষ, নিরীহ গৃহস্থ, আমার এসব মারাত্মক জিনিসের মোটেই প্রয়োজন নেই।

আমার সেই মূকাভিনয় শ্রীযুক্ত যোগেশ দত্তের মত উচ্চাঙ্গের হয়েছিল কি না সে কথা বলতে পারব না কিন্তু আমার ব্যাপারস্যাপার দেখে রিভলভার বিক্রেতাটি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, তার মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু তখন আর তার কিছু করার ছিল না। পরের গাড়ির সময় হয়ে গেছে। স্টেশন চত্বরে কাতারে কাতারে লোক ঢুকে পড়েছে। সেই ভিড়ের মধ্যে আড়াল হয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। লোকটিও তার জ্যাকেটের মধ্যে ছোট রিভলভারটি চট করে লুকিয়ে পশ্চাদপসরণ করল।

পরে এই গল্প নিউ ইয়র্কে এবং অন্যত্র যখনই যাদের বলেছি, তারা বলেছে, লোকটি মোটেই আমার কাছে রিভলভার বেচতে চায়নি। সে নাকি আমাকে রিভলভার দেখিয়ে ভয় পাইয়ে আমার টাকা পয়সা, মানিব্যাগ ছিনতাই করতে চেয়েছিল। সে মোটেই রিভলভার বিক্রেতা নয়, আমি খুব বোকা বলে বুঝতে পারিনি, আসলে সে ছিল নিউ ইয়র্ক শহরের আতঙ্ক, দুর্ধর্ষ হিস্পানিক ছিনতাইকারী।

সারা জীবন নিজেকে বোকা জেনে হীনমন্যতায় ভুগেছি, শুধু এই একবার সান্ত্বনা পেয়েছিলাম।

মূল ভ্রমণসূচির বাইরে এসে পড়েছি।

তৃতীয় বিপদটির কথা তাড়াতাড়ি সংক্ষিপ্ত করে সেরে নিয়ে কাহিনীতে ফিরতে হবে।

আমেরিকার প্রথম দিনে আমি যেমন প্রথম বিপদে পড়েছিলাম তেমনিই

শেষ বিপদে পড়েছিলাম শেষ দিনে।

পূর্ব উপকূলে ওয়াশিংটনে যাত্রা শুরু করে অবশেষে পশ্চিম উপকূলে সানফ্রানসিসকো থেকে দেশে ফিরেছিলাম।

ঘটনাটা ঘটল আবারো সকালবেলায়। শেষের দিন বাড়ি ফেরার উত্তেজনায় খুব সকাল-সকাল ঘুম ভেঙে গেছে। কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে এলোপাথাড়ি চিন্তা করে, তারপরে হাত মুখ ধুয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেললাম। দুপুরে প্লেন। তখন হাতে অঢেল সময়। এ দিকে খুব চা তেষ্টাও পেয়েছে।

কলকাতার মতো সানফ্রানসিসকোতেও ট্রাম গাড়ি আছে। ওরা বলে স্ট্রিট কার। হোটেলের ঘর থেকে রাস্তায় স্ট্রিট কার যাতায়াতের শব্দ পাচ্ছি। ভাবলাম রাস্তায় গিয়ে কোনও রেস্তোরাঁয় চা খেয়ে আসি।

সময়টা খেয়াল করিনি। ভোর-ভোর দিন। একাই লিফট চালিয়ে এসে নিয়ে নেমে যাচাই করে নিলাম হোটেলের কফিশপটা খুলেছে কি না। সেখানেও চা পাওয়া যায়। তবে দাম চড়া। কিন্তু দেখলাম কফিবার বন্ধ।

রাস্তায় নেমে দেখলাম বাইরে শীতের জড়তা ও অন্ধকার তখনও কাটেনি। সামনের দিকে বড় রাস্তায় দোকানপাট কিছুই খোলেনি। আমি হাঁটতে হাঁটতে ঠিক করলাম এপাশের কোনও গলির মধ্যে ঢুকে যাব, কলকাতার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, সেখানে এমন চায়ের দোকান থাকা সম্ভব যেটা রাত সাড়ে তিনটেয় উনুনে ধোঁয়া দেয়। সেরকম চায়ের দোকান বড় রাস্তায় মিলবে না।

চায়ের সন্ধানে গলির মধ্যে ঢুকে কিছুটা গিয়ে বুঝলাম সেটা আসলে একটা ব্যাক স্ট্রিট। বড় বড় দোকান আর কারখানার গুদাম সেই রাস্তায়। দারোয়ান-কেয়ারটেকারের বাসস্থান ছাড়া যেখানে জনবসতি নেই। যে-কোনও মহানগরেই এ সব রাস্তা বিপজ্জনক।

আমিও বিপদে পড়লাম।

রাস্তার ধারে বড় একটা কাঠের ক্রেটের ওপরে বসে পাঁচ-সাতজন সন্দেহজনক চেহারার লোক নিজেদের মধ্যে কি একটা মীমাংসা করার চেষ্টা করছিল, বোধহয় টাকা ভাগ করছিল।

হঠাৎ দূর থেকে আমাকে আসতে দেখে তারা খুব সতর্ক হয়ে ক্রেটের ওপরে উঠে দাঁড়াল, তারপর তখনও আমি এগোচ্ছি দেখে ক্রেটের ওপর থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ল।

আমি বুঝতে পারলাম এইবার তারা আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু তারা রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সোজা বিপরীত দিকে চোঁ-চোঁ দৌড় লাগাল। আর ততক্ষণে আমিও কিছু না বুঝে উল্টো ছুটে বড় রাস্তায় পৌঁছে গেছি।

পরে শুনেছিলাম সানফ্রানসিসকোর চোরাচালান দমন দপ্তরে এক দাপুটে বড়বাবু ছিলেন, শ্যামকায়, স্থূলাকার, উৎকোচ-নির্মোহ এক তামিল। তিনি ছিলেন শীতকাতুরে, ক্যালিফোর্নিয়ার নাতিশীতোষ্ণ পৃথিবীতে তাঁর শীতবস্ত্র ছিল হাসির বিষয়।

আমার চেহারা, চালচলন ও শীতনিবারক পোশাক দেখে চোরা-চালানকারীরা আমাকে তিনি ভেবে দৌড়ে আত্মরক্ষা করে।

অতঃপর ভ্রমণসূচি মান্য করে প্রথম দিনের প্রথম ঘটনায় ফিরে যাই।

আমি যখন ঘামতে ঘামতে ড্যুপণ্ট স্কোয়ার থেকে উর্ধ্বশ্বাসে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে আসছিলাম, এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, তিনিও কৃষ্ণাঙ্গ, পার্কে বেড়াতে ঢুকছিলেন।

দ্রুত ধাবমান আমাকে থামিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কি হয়েছে?' আমি তাঁকে ছোট করে ঘটনাটা বললাম এবং এ কথাও বললাম যে আমি আমেরিকায় সদ্য আগত। তিনি আমাকে সস্নেহে একাধিক উপদেশ দিলেন, এ কথাও বললেন যে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কিছু দিন কলকাতায় ছিলেন, সৈন্যবাহিনীতে কাজ করতেন। ফোর্ট উইলিয়াম, গ্র্যাণ্ড হোটেল, চৌরঙ্গি, চিনেপাড়া, ময়দান এ সব সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার স্মৃতি রয়েছে। তিনি কথা বলতে বলতে আমার সঙ্গে ব্যাঙ্ক পর্যন্ত এলেন।

তিনি আমাকে তাঁর ঠিকানা দিয়েছিলেন। কাছেই একটা আধা-গরিব পল্লীতে এক ঘরের ফ্ল্যাটে একাই থাকেন, নিজেই রান্নাবান্না করে খান।

ওয়াশিংটন থেকে চলে আসার আগের দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি আমার সঙ্গে ফেরার পথে হাঁটতে হাঁটতে হোটেল পর্যন্ত এলেন। আমার কলকাতার ঠিকানা চাইলেন।

আমার পকেটে তখন কাগজ-কলম কিছুই ছিল না। হোটেলের কাউণ্টারে এসে বললাম, 'এক টুকরো কাগজ আর কলম দিন তো। এই ভদ্রলোককে আমার ঠিকানাটা লিখে দিতে হবে।'

কাউণ্টারবাসিনী স্থূলবপু বিগতযৌবনা মহিলা আমার আসা-যাওয়ার পথে আমাকে অনবরত যথাসাধ্য মোহিনী হাসিতে বিভূষিত করেন এবং তৎসঙ্গে অনবদ্য 'হ্যালো' এবং তদুপরি অনিবার্য 'হ্যাভ এ গুড ডে' উপহার দেন।

কিন্তু আজ যখন কাগজকলম চাইলাম, সেই একই কাউণ্টার-রমণী লাল ঠোঁটে, শুকনো মুখে, হাস্যলেশহীন কণ্ঠে সন্দেহজনকভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি যে কাগজকলম চাইছেন, কিন্তু আপনি কি আমাদের অতিথি?'

আমার আর সহ্য হল না।

তার প্রধান কারণটা হল, আমি এক মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারলাম এই ভদ্রমহিলার পূর্বর্তী হাসি, হ্যালো ইত্যাদি সব কিছুই নকল, মেকি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলাম, কালীঘাট মন্দিরের সামনের বাজার থেকে কিনে আনা গন্ধমাদন পর্বত মাথায় বীর হনুমানের পাথরের মূর্তি, যেটা এই মহিলাকে দেব বলে সুটকেস থেকে বার করেছিলাম, সেটা সুটকেসেই ফিরবে।

বীর হনুমান যথাস্থানে যথাসময়ে উপযুক্ত হাতে তুলে দেব।

তবে আপাতত এই স্থূলাঙ্গিনীকে একটা জবাব দেওয়া দরকার।

সুতরাং অবিনীত, অতারাপদীয় ভাষায় আমাকে নিবেদন করতেই হল, 'কাকে অতিথি বলছেন ? আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না।'

কাউণ্টারবাসিনী ভ্রূকুঞ্চন করলেন, 'চিনব কি করে ?'

আমি বললাম, 'প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা আমাকে হ্যালো, গুড মর্নিং, গুড ডে, গুড ইভনিং, গুড নাইট হেসে হেসে জানাচ্ছেন, আর এখন বলছেন চিনতে পারছেন না ?'

ভদ্রমহিলা বোকার মত আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি বললাম, 'মেমসাহেব, আমি আপনাদের অতিথি-টতিথি কিছু নই। দৈনিক তিরিশ ডলার ভাড়া দিয়ে আপনাদের ঘরে থাকি। আমি আপনাদের গ্রাহক।'

ভদ্রমহিলার মরা মাছের মত চোখ দেখে আমি আর কথা বাড়ালাম না, বললাম, 'রুম নাম্বার তিনশো চার। একটা কাগজ-কলম দিন।'

তেরো

এ শহরে নতুন

…'রাস্তার ওপাশে ওটা কী গাছ
আমি জানি না।
বাগানে ফুটে আছে ওটা কী ফুল
আমি জানি না।

আমি পরদেশী,
এ শহরে
নতুন।'…

—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বিখ্যাত গ্রন্থাগারের ক্যাটালগে ওয়াশিংটনের টমাস ল বলে এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে।

এক ব্যক্তি বললাম বটে কিন্তু টমাস ল কোনও সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না।

আঠারো শতকের শেষার্ধে ভারতে ব্রিটিশরাজের গোড়াপত্তনে ল সাহেবের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রথম যুগের ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে কর্মতৎপর। লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান রূপকারদের মধ্যে একজন হলেন এই টমাস ল, জেলা কালেক্টর।

আপাতত পাঠক-পাঠিকা ভাবতে পারেন অবশেষে সত্যিসত্যিই আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে; অথবা ভদ্রভাষায় বলতে পারেন আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে।

একটু আধটু ঠাট্টা-তামাশা ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে, সেটা তাঁরা দায়সারাভাবে চোখ বুলিয়ে উতরিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বলা নেই, কওয়া নেই, স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনাবোধ নেই, সরাসরি গোলমেলে ইতিহাস তাও ওয়াশিংটন-ভ্রমণ লিখতে গিয়ে কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, এ যে সত্যি সত্যি ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আসলে এর মধ্যে একটা ব্যাপার আছে। রীতিমত গোলমেলে ব্যাপার। সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছি, তবে এ রকম বিষয়ে আমার একটু সাহসের অভাব আছে।

আমি স্কলার, গবেষক বা পণ্ডিত নই। লেখাপড়া জানা লোক বলতে সাধারণত যা বোঝায় আমি ঠিক তাও নই। ইতিহাসবিদ তো কখনোই নই। তবু এখানে ইতিহাসের কথাই একটু লিখতে হচ্ছে।

টমাস ল, যাঁর কথা দিয়ে এই পরিচ্ছেদ শুরু করেছি, তিনি ছিলেন আমেরিকা যুক্তরাজ্যের প্রথম প্রেসিডেণ্ট জর্জ ওয়াশিংটনের আত্মীয়, বিবাহ-সূত্রে।

তা এই টমাস সাহেবের একটু হাতটানের দোষ ছিল, ঘুষ-টুস ভালই খেতেন। সে ছিল গভীর অরাজকতার যুগ, দেশীয় শাসন ব্যবস্থা মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে, ইংরেজ শাসন ভালোভাবে কায়েম হয়নি। পূর্বভারতে চলছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব। সে যুগের ইংরেজ রাজপুরুষদের নীতিজ্ঞান প্রখর ছিল না। চুরি করা বা উৎকোচ গ্রহণ, এই নব্য শাসক-সম্প্রদায়ের লোকেরা খুব একটা পাপ বা দোষের বলে মনে করতেন না।

টমাস সাহেবও কোনও ব্যতিক্রম নন।

কিন্তু লোক-পরম্পরায় এ সব অসাধুতা এবং দুর্নীতির খবর ইংলণ্ডে পৌঁছোল। এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে বিলেতে কিছু কড়াকড়ি শুরু হল।

নতুন যাঁরা প্রশাসক হয়ে বিলেত থেকে আসতে লাগলেন তাঁদের বিষয়-সম্পত্তি, ধনদৌলতের হিসেব দিতে বলা হল। যাতে যখন চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরবে মিলিয়ে দেখা যায় অসঙ্গত বা বিসদৃশ কোনও ধনসম্পত্তি চাকুরিকালে অর্জন হয়েছে কি না।

অবৈধভাবে প্রজাদের রক্ত চুষে প্রভূত ধনসম্পদ করেছিলেন টমাস সাহেব। বিলেতের কড়াকড়ির সংবাদ যখন এল তিনি ভাবলেন আমি তো সম্পত্তির হিসেব দিয়ে আসিনি, এখনই ফিরে গেলে যা সম্পত্তি করেছি তা নিয়ে ঝামেলা হবে না, আমিও বাকি জীবন অতি স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেব।

এক শুভলগ্নে তাঁর সমস্ত সোনাদানা, টাকাপয়সা নিয়ে টমাস সাহেব দেশে যাওয়ার জাহাজে উঠে বসলেন। কিন্তু মধ্যবর্তী এক বন্দরে, বোধহয় এডেনে, এক দুঃসংবাদ পেলেন টমাস ল। বিলেতে আরও কড়াকড়ি হয়েছে। এখন ফেরার পথেও জাহাজ থেকে দেশের বন্দরে নামার সময় ধনসম্পত্তির হিসেব দিতে হবে।

প্রমাদ গনলেন তিনি। কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র ছিলেন না। তিনি ওই মধ্যপথে জাহাজ বদল করে এক আমেরিকাগামী জাহাজে উঠে বসলেন এবং যথাকালে নিরাপদে সব জিনিসপত্র টাকাপয়সা নিয়ে এই নতুন পৃথিবীতে পৌঁছোলেন, তখন থেকেই আমেরিকা আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনার মহাদেশ।

টমাস সাহেব ছিলেন একাধারে প্রশাসক, অর্থনীতিবিদ, শিল্পোদ্যোগী এবং ফাটকাবাজ। তিনি তাঁর সমুদয় অর্থ বিনিয়োগ করলেন ওয়াশিংটন শহরের পত্তনে এবং ওয়াশিংটনের আশেপাশে চিনির কারখানা স্থাপন করে। পরে ওই ভূসম্পত্তি আমেরিকার সরকারের কাছে বিক্রয় করে তিনি প্রভূত অর্থলাভ করেন এবং নবগঠিত সরকার ওই জমিজমার ওপরে শিশু প্রজাতন্ত্রের রাজধানী গড়ে তোলে।

সুতরাং আমার মতো নির্বোধ এবং প্রগলভ কেউ যদি দাবি করে যে উত্তরাধিকার সূত্রে ভারতীয় হিসেবে ওয়াশিংটন শহরের স্থাবর সম্পত্তিতে আমারও কিছু পাওনা আছে, কেননা এগুলো করা হয়েছিল আমারই পূর্ব-পুরুষদের ঠকানো টাকায়, তা হলে?

তা হলে ? তা হলে কিছুই নয়। আমার এই ইতিহাসকথার কতটা শুদ্ধ, কতটা ভুল সেটা খতিয়ে দেখার বিদ্যে আমার নেই, শুধু পাঠককুলের অবগতির জন্যে লিপিবদ্ধ করলাম। তাঁরাই সত্যমিথ্যে যাচাই করবেন।

অতঃপর সেই সোমবার সকালে প্রথম দিনের ওয়াশিংটনে ফিরে যাচ্ছি।

ব্যাংক থেকে চেক ভাঙিয়ে এবার আমার গন্তব্যস্থল ভি পি এসের অফিস মানে ভিজিটার প্রোগ্রাম সার্ভিসের অফিস, সেটা অবশ্য কাছেই, হাঁটাপথে দশ মিনিট।

এবং যদিও ওভারকোটটা এখনও সড়গড় হয়নি তবুও হাঁটতে ভালই লাগছে। জোর ঠাণ্ডা, কনকনে বাতাস কিন্তু ঝলমল করে বেলা বেড়ে উঠছে। সুন্দর পরিষ্কার, সাজানো গোছানো শহর। রাস্তায় অচেনা লোকজন বোধহয় বিদেশি বুঝতে পেরেই বারবার 'হ্যালো' বলছে, তার মানে বোধ হয় 'ভালো তো ?' কিংবা, 'স্বাগতম'।

ভি পি এস তথা ভিজিটার প্রোগ্রাম সার্ভিসের অফিস মেরিডিয়ান হাউস ইণ্টারন্যাশনাল নামে এক পাকাপোক্ত বাড়িতে দোতলায়, মার্কিন সেকেণ্ড ফ্লোর যেটা আসলে বিলিতি ফার্স্ট ফ্লোর। আমাদের দোতলা আর আমেরিকানদের দোতলা একই, কিন্তু ইংরেজদের সেটা একতলা। তাদের প্রথম মেঝে মাথার ওপরে, ভিত শূন্যে।

ভি পি এসে গিয়ে যাঁদের হাতে পড়লাম, তাঁরা দুজনেই মহিলা, শ্রীমতী রোজ মেরি এমস এবং শ্রীমতী মেরি লুইস কনলে। সেই সময়েই মহিলারা নামের আগে মিস, মিসেস ইত্যাদি ব্যক্তিগত পরিচয়জ্ঞাপক উপসর্গ পরিত্যাগ করেছেন। এঁরা দুজনাই, যুগ্মশ্রীমতী রোজ মেরি এবং শুধু মেরি তাঁদের নামের আগে রহস্যময় এম এস উপস্থাপন করেছেন। কারোর বোঝার উপায় নেই, কুমারী না সধবা, অথবা (বিচ্ছেদা) না বিধবা, সুরক্ষিতা না অরক্ষিতা।

নিতান্ত সাদামাটা জোলো এম এস। সিঁথির সিঁদুর, হাতের শাঁখা, বাতাস-বিহ্বল ওড়না, চপল চাহনি, ভ্রূ-ভঙ্গিমা, শ্রী, শ্রীমতী, শ্রীযুক্তা, দেবী, দাসী—কত ভাবেই তো সুন্দরীদের চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু এই এক এম এস, আধুনিক নারীতন্ত্রের শেষতম শিরোপা সব রোমান্স, সব রোমাণ্টিকতা তছনছ করে দিয়েছে।

একদা এম এস মানে আমরা বুঝতাম ম্যানসক্রিপ্ট, পাণ্ডুলিপি। এই এম এসও নিতান্ত পাণ্ডুর ফ্যাকাশে লিপি।

ফ্যাকাশের সঙ্গে 'একা সে' দিয়ে যে ছড়াকার মিল দিয়েছিল তাকে চিরকাল আমার পছন্দ।

কিন্তু মূল মার্কিন ভূখণ্ডে এসে, যেখানে এম এস ডানা মেলেছে, আমার মনে হয়েছিল মিস বা মিসেস যদি দরকার নেই তবে এম এসই বা কেন দরকার, নামের আগে কিছু না লিখলেই হয়। শুধু কোনও মহিলার যদি খুব

পুরুষালি নাম হয়, নাম শুনে যদি বোঝা না যায় স্ত্রী না পুরুষ, প্রাতঃস্মরণীয় পরশুরামীয় রীতিতে নামের পাশে স্ত্রীং বা এফ (মানে ফিমেল) লিখে দিলেই হয়।

এ সব অবশ্য অবান্তর কথা। রোজ মেরি এবং শুধু মেরি, দুই মেরি মেমসাহেবকেই আমার ভালো লেগেছিল, তবে তাঁদের সঙ্গে আমার এই গোলমেলে এম এস তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করিনি। বলতে পারতাম, তোমাদের এম এসের চেয়ে আমাদের এস এম, শ্রীমতী, অনেক ভালো। শ্রীমান-শ্রীমতী, শ্রী-শ্রীমতী, শ্রীযুক্ত-শ্রীমতী সব কিছুই হয়। কিন্তু এ-বিষয়ে আলোচনায় যাইনি।

যতদূর মনে হয়, সেটা করার চেষ্টা করলে পরিণাম খুব ভালো হত না। তাছাড়া দুজনাই হাস্যময়ী হলেও খুবই স্বাস্থ্যবতী।

এখানেই আমার আলাপ হল জিমসাহেবের সঙ্গে। এর পরে পুরো মার্কিন দেশ সফরকালে তিনি ছিলেন অমোর ছায়াসঙ্গী বা এসকর্ট।

জিমসাহেবের পুরো নাম হল জেমস আর মারটিন। জেমস থেকে জিম। সব ভাষাতেই ভাল নামকে ছোট করে জিভের মাপমত করে সেইটাকে ডাকনামে পরিণত করার একটা প্রবণতা আছে। সিদ্ধেশ্বরকে সিধু, জগন্নাথকে জগা, কানাইকে কানু বা অপরাজিতাকে অপু কত অনায়াসে বানিয়ে ফেলা হয়। তেমনিই সাহেবরা উইলিয়ামকে বিল বলে, টমাসকে টম বলে, এলিজাবেথকে লিজা বলে এবং জেমসকে সান্নিধ্যার্থে জিম বলে ডাকে।

আর আমার এই তারাপদ নামের তো অপার মহিমা ও সুযোগ। ভদ্রভাবে তারা, অভদ্রভাবে তারু, সাহেবি কেতায় টর্পেডো, অষ্টোত্তর শতনাম না হলেও আমার সুনামের অপভ্রংশ অনেক। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পরে বাংলার শেষ সাহেবকবি শক্তি, মহামহিম শক্তি চট্টোপাধ্যায় চিরকাল আমাকে টর্পেডো বলে ডেকেছে এবং সেই সূত্রে চিরকবি অ্যালেন গিনসবার্গ এবং তাঁর চিরসঙ্গী আলাভোলা পিটার অরলভস্কি আমাকে টর্পেডো বলত এবং যত্রতত্র অদ্যাবধি আমার প্রসঙ্গ উঠলে আমাকে টর্পেডো বলেই সম্বোধন করে।

এ বিষয়ে অনতিদূরে নিউ ইয়র্ক পরিচ্ছেদে বিস্তারিত লিখব এবং সেখানে নিউ ইয়র্কে অ্যালেনের বাড়িতে জিমের দুর্দশার কথাও লিখব।

এখন জিমের কথা বলি।

জিম অর্থাৎ পুরো নাম জেমস আর অস্টিন। তাঁর একটা ভিজিটিং কার্ড এখনও আমার কাছে আছে। তাতে জিমের ওয়াশিংটনের ঠিকানা এবং ফোন নম্বর আছে এবং সঙ্গে লেখা আছে ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভিস ডিভিশন।

এই ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভিস ডিভিশনটা যে কি সেটা আমার মোটেই হৃদয়ঙ্গম হয়নি।

জিমকে প্রশ্ন করেছিলাম, জিম বলেছিলেন তিনি পূর্ব ইউরোপে অনেকদিন কাজ করেছেন, পূর্ব ইউরোপের অনেক ভাষাই তাঁর দখলে। কিন্তু আমার

তো পূর্ব ভারতের ভাষা, আমি কি জিমের এলাকায় পড়ি ?

ভি পি এসে পেঁছে আত্মপরিচয় দেওয়ার পরে দুই মেমসাহেব এবং এই জিমসাহেব আমাকে নিয়ে পড়লেন। অবশ্য আত্মপরিচয় দেওয়ার খুব প্রয়োজন ছিল না, এঁরা সকলেই আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন। আমার চেহারা, চালচলন দেখে এঁরা বুঝেই নিয়েছিলেন বাঙাল এসে গেছে।

অনেকদিন আগে ছড়ার রাজা অমিতাভ চৌধুরী আমাকে নিয়ে একটি ছড়া বানিয়েছিলেন,

টাঙ্গাইল টাঙ্গাইল।
তারাপদ বাঙ্গাইল ।।

এ ছাড়াও অনেকেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে চেহারায় ও চরিত্রে বাঙ্গালপনা বা বাঙ্গাইলত্ব আমার মধ্যে যেমন প্রকট, এমন সচরাচর দেখা যায় না।

সাত রাজ্যের মানুষ চরিয়ে খান এই ভুবিদিত ভিজিটার প্রোগ্রাম সার্ভিসের আধিকারিকেরা, তাঁরা আমাকে তাঁদের অফিস ঘরে ঢুকতে দেখেই, আমি নিজে থেকে 'রায় ফ্রম ক্যালকাটা' বলার প্রায় আগেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সমস্বরে বলে উঠলেন, 'হ্যালো, মিস্টার রায় ফ্রম ক্যালকাটা।'

কিঞ্চিৎ বাক্য ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর কিঞ্চিৎ আতিথেয়তা করা হল আমার প্রতি। আতিথেয়তা আর কিছু নয়, ঘরের এক প্রান্তে একটি সুদৃশ্য আসবাব আছে, পরে জেনেছিলাম ওটা কফি তৈরির যন্ত্র, সেই যন্ত্রের ভেতর থেকে ধূমায়িত কফি উৎপাদন করে সুদৃশ্য কাগজের কাপে বড় মেম রোজ মেরি সাহেবা আমাকে দিলেন এবং সেই সঙ্গে ওই ঘরের সবাইকেও এক পেয়ালা করে কফি খাওয়ালেন। ছোট মেম শুধু মেরিও আতিথেয়তায় তৎপর, তিনি কোথা থেকে একটা চৌকো কাচের বয়াম বার করে তার ভেতর থেকে কুকিস মানে আধা বিস্কুট আধা কেক, গুড় আর আটার অনবদ্য পিঠে বার করে আমাকে ও অন্যাদের অফার করলেন।

এরপর শুরু হল কঠিন কাজ।

আমি কোথায় কোথায় যেতে চাই ? কাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই ? কি কি দেখতে চাই ?

এই সব নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন আধিকারিকেরা। এতক্ষণ ঘরের চারদিকের র‍্যাক এবং তাকের মোটা মোটা বইগুলোকে দেখে ভাবছিলাম, বড় বড় পণ্ডিত, স্কলারেরা আসেন এখানে, প্রভূত বিদ্যাচর্চা হয়।

কিন্তু এখন জিমসাহেব গিয়ে তাকের ওপরের থেকে বইগুলোকে নামিয়ে আনতে বুঝতে পারলাম এগুলো টেলিফোন ডিরেকটরি। সেগুলো আকার আয়তনে বিশাল এবং বহু সাধারণ শহরেই ডিরেকটরির সংখ্যা একাধিক আর নিউ ইয়র্ক, শিকাগো বা সানফ্রানসিসকোর মত মহানগরের টেলিফোন ডিরেকটরির সংখ্যা অগুনতি।

আমার বাঙ্গালত্বের কাহিনী বলতে গিয়ে এই একটু আগে একটা কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেছি।

আমি যখন ভি পি এসের ঘরে ঢুকেছি মেমসাহেবদ্বয় এবং জিমসাহেব আমাকে স্বাগত জানিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁরা আমার শীতের সাজ-পোশাকের বাহুল্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

জিমসাহেব তো বলেই বসলেন, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আলাস্কা থেকে আসছেন।'

তখন সদ্য আমি মাথার ওপর থেকে কানঢাকা বানর টুপিটা নামিয়ে, গলায় শক্ত করে গিঁট দিয়ে বাঁধা মাফলারটা কষ্ট করে খুলে সামনের খালি সোফাটার ওপরে রেখেছি। তারপর ওভারকোট খুললাম, ওভারকোটের নীচে গলাবন্ধ কোট, একটু পরে সেটাও খুললাম। তখনও শরীরে রয়েছে ফুলহাতা সোয়েটার, তার নীচে হাফহাতা সোয়েটার, তারও নীচে মোটা খদ্দরের ফুলশার্ট, তুলোর ফুলহাতা উলিকট, তারপর ফুলহাতা সুতির গেঞ্জি অবশেষে গাত্রত্বক।

সাহেব-মেমরা বোধহয় অতদূর অনুমান করতে পারেননি। তাঁরা গলাবন্ধ কোটের নীচে ফুলহাতা সোয়েটারের আভাস দেখেই তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন।

আমি কিন্তু জিমসাহেবের ব্যঙ্গোক্তির জবাব দিতে কসুর করিনি। আমি সরাসরি বলেছিলাম, 'দেখুন আলাস্কা থেকে ওয়াশিংটনের তাপমাত্রার যে ফারাক, তার চেয়ে অনেক বেশি ফারাক কলকাতা থেকে ওয়াশিংটনের তাপমাত্রায়। আমি এক ধাক্কায় ষোল ডিগ্রি থেকে এক ডিগ্রিতে এসে পৌঁছেছি।'

জিমসাহেব আর কিছু বললেন না। টেলিফোন ডিরেকটরিগুলি তাকের ওপর থেকে নামিয়ে টেবিলে পর পর সাজাচ্ছিলেন। আমি মনোযোগ দিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ করছিলাম।

একটু পরে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। প্রথমে ধরা হল ওয়াশিংটন। ওয়াশিংটনে আমি কোথায় কোথায় যেতে চাই? এখানে আমার কোনও আত্মীয়বন্ধু আছে কি না? তাদের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই কি না?

এ ধরনের প্রশ্নের জন্যে আমি অবশ্য প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলাম। কলকাতা থেকে একটা তালিকাও করে নিয়ে এসেছিলাম মার্কিন প্রবাসী আত্মীয়বন্ধুর এবং মার্কিন বন্ধুবান্ধবের। যদিও এদের সকলের তৎকালীন ঠিকানা আমার জানা ছিল না।

অবশ্য এ ছাড়াও ভি পি এসের কাছে ছিল কলকাতায় আমেরিকান তথ্যকেন্দ্রের পাঠানো আমার এক মাসের সম্ভাব্য সূচি, যেটা সুপ্রিয়দা, সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার সঙ্গে আলোচনা করে নিজ হাতে সযত্নে রচনা করেছিলেন।

ভ্রমণসূচির ব্যাপারে আমাকে চমৎকার সুপরামর্শ দিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম লাল, যাঁর এ ব্যাপারে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। পুরুষোত্তম বলেছিলেন, 'অল্প দিনের সফরে বেশি জায়গায় ছুটোছুটি করতে যেয়ো না। কিছুই দেখা

হবে না। শুধু শুধু হাঁফিয়ে পড়বে। গোটা চার-পাঁচেক শহর ঠিক করে নাও। একেকটা শহরে অন্তত সাতদিন।'

আমি আমার তালিকা রোজ মেরি মেমসাহেবকে দিলাম। তিনি মনোযোগ দিয়ে সেটা দেখলেন। কলকাতা থেকে আসা সম্ভাব্য ভ্রমণসূচিটি দেখলেন। তারপর আমার কাছে জানতে চাইলেন আমার ইন্টারেস্ট কি, আমি কি কি জিনিস বিশেষ করে দেখতে চাই, মিউজিয়াম, থিয়েটার, বিশ্ববিদ্যালয় এ সব দর্শনে আমি আগ্রহী কি না।

আমি বোধহয় তাঁকে একটু নিরাশ করলাম, যখন বললাম, 'আমি একটা ভালো চিড়িয়াখানা দেখতে চাই যাতে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশুপাখি আছে, ছোট বাচ্চাদের একটা সাধারণ ইস্কুল দেখতে চাই, আর একটা এ-দেশের গ্রাম দেখতে চাই।'

চিড়িয়াখানা দেখার ব্যাপারে পরে একটা হাস্যকর ঝামেলায় পড়েছিলাম, সে কাহিনী লস এঞ্জেলস অধ্যায়ে বলা যাবে। তবে ভিজিটার প্রোগ্রাম সার্ভিসকে আমি বিব্রত করেছিলাম ওই গ্রাম দেখতে চেয়ে।

হায় গ্রাম। ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গৃহগুলি। আলোর পিদিম, রাঙামাটির পথ, ঘোড়ায় টানা লাঙল, খোড়ো ঘর—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হাইওয়ে আর সুপার মার্কেটের আমেরিকায় সে গ্রাম কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অত বড় একটা দেশের মানচিত্রে একটা ছোট গ্রামও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন একটাই ভিলেজ আছে যুক্তরাজ্যে, সে হল গ্রিনিচ ভিলেজ, মহামহানগরী নিউ ইয়র্কের বুকে, আর দুয়েকটা আছে জাদুঘর হয়ে। লুইসানিয়ার সোয়ামন ল্যাণ্ডে সে রকমই একটা গ্রামে মিসিসিপি পার হয়ে পেঁৗছেছিলাম তিন সপ্তাহ পরে নিউ অরলিন্স থেকে, এঁরাই বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

বন্দোবস্ত চমৎকার।

আমার দেওয়া তালিকা ধরে একেকটা শহরাঞ্চলের ডিরেকটরির পাতা খুঁজে খুঁজে নাম ঠিকানা মিলিয়ে ফোন নম্বর ধরা হচ্ছে। যেখানে ঠিকানা দিতে পারিনি কিংবা ঠিকানা মিলছে না, সেখানে আমার দেয়া নামে যদি একাধিক ব্যক্তি থাকেন তাঁদের প্রত্যেককে সঙ্গে সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে যাচাই করে নেয়া হচ্ছে কে আমার অভীষ্ট।

অসীম ক্ষিপ্রতা ও যোগ্যতার সঙ্গে এঁরা প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেললেন। এমনকি চরম উত্তরে প্রায় কানাডা সীমান্তে নায়াগ্রার পথে বাটাভিয়া নামক ছোট শহরে বসবাসকারী আমার বাল্যবন্ধু ডাক্তার মইদুল ইসলাম খানকে পর্যন্ত পাওয়া গেল।

তবুও যাদের পাওয়া গেল না, তারা হয়তো কাজে গেছে বা অফিসে আছে, জিমসাহেব দায়িত্ব নিলেন সন্ধ্যায় তাদের ধরবেন।

কত নাম ঠিকানা নিয়ে এসেছি কলকাতা থেকে। তাদের কাউকে হয়তো দশ বছর দেখিনি, বিশ বছর দেখিনি, হয়তো কখনোই দেখিনি, আমার

নিকটজন কারও আত্মীয় বা বন্ধু, আমি ঝুলি ভরে সব ঠিকানা নিয়ে এসেছি।

একটার পর একটা ফোন ডায়াল হচ্ছে। আমি বলে দিয়েছি, 'শিগগিরই দেখা তো হবেই। এখন আর ফোনে কথা বলব না।' আমি যে সশরীরে সামনে উপস্থিত, ওই ঘরের মধ্যেই আছি এ কথা উল্লেখ না করে এঁরা কথাবার্তা চালাচ্ছেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করছেন।

অ্যালেন গিনসবার্গ কি বুড়ো হয়ে গেছেন? ফে লেভিন কি আরও সুন্দরী হয়েছে? কুড়ি বছর মইদুলের সঙ্গে দেখা হয়নি, সে কি এখন আমারই মত হৃষ্টপুষ্ট, ফুল গৃহস্থ?

এই সব এলেবেলে ভাবছি, আর জানলার কাচের ভেতর দিয়ে দেখছি দূরে রাস্তার মোড়ে প্রায় ন্যাড়া একটা গাছের শেষ দু-চারটে শুকনো পাতা হিমেল হাওয়ায় থিরথির করে কাঁপছে।

কি গাছ ওটা?

আমি জানি না।

আমি এ শহরে, এ দেশে, এ মহাদেশে নতুন।

চোদ্দ

রবিবারের সকাল

কী শান্ত এই রবিবারের সকাল—
পথে লোক নেই, ঘরে ঘরে পর্দা টানা ঘুম,
সারি সারি মোটর কার বেকার।
এ দেশে বেলা একটার আগে রবিবারে
কেউ বিছানা ছাড়ে না।
দুই দিকে গাছের স্তব্ধতা নিয়ে রাস্তাগুলি
পটের মতো পড়ে থাকে।

—বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু আমাকে ক্ষমা করবেন কিনা জানি না, নিতান্ত ছাপার সুবিধের জন্যে তাঁর দৃঢ়সম্বন্ধ পংক্তিগুলিকে আমি এইভাবে বাঁকাচোরা ভেঙে ফেললাম।

আরও একটা কথা আছে।

এ কবিতা উজ্জ্বল জুন মাসের, যখন বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় গাছের পাতা নিঃশ্বাসের মত নড়ছে।

এ কবিতা ইণ্ডিয়ানায় ব্লুমিংটনে রচিত। সেটাও এই ওয়াশিংটন থেকে দূরে, তবে খুব দূরে নয়, উত্তর আমেরিকার পক্ষে বেশ কাছে। এখান থেকে মাত্র দুই রাজ্য পেরিয়ে।

ব্লুমিংটনে আমি যাইনি। তবে ওয়াশিংটনে শেষ দিন রবিবারে খুব ফাঁকা লাগছিল। প্রথমে জব্দ হলাম সকালবেলায় প্রাতরাশ করতে গিয়ে। দাম বেশি বলে প্লাজা হোটেলে আমি কিছু খাচ্ছিলাম না। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ আমি বেরিয়ে পড়তাম।

হোটেলের পেছনেই একটা সরু গলিতে একটা ছোট কাফে মতন ছিল। সকালবেলায় সেখানে খুব কম ভিড় হত। দুধ-কর্নফ্লেক, চা, ওমলেট, ডিমসেদ্ধ সঙ্গে চিজ বা মাখন, একেকদিন একেক রকম নিতাম। দাম দেড় ডলার দু ডলারের বেশি পড়ত না। সেই কাফের ওয়েট্রেস, শঙ্কর মাছের চাবুকের মত ছিপছিপে, চোখের কোনায় কালি, প্রসাধনহীন মুখমণ্ডল, তীক্ষ্ণ নাকমুখ, উড়ো উড়ো অসংলগ্ন চুল দড়ির রিবন দিয়ে আলগা করে বাঁধা মধ্যবয়সিনীর সঙ্গে প্রভাতবেলার ফাঁকা কাফে কক্ষে আমার চকিত দৃষ্টি বিনিময় হত।

তবে শুধু ওইটুকুই, তার বেশি নয়। আর বড় জোর দু চারটি বাক্য বিনিময়। 'সাকিন কলকাতা', 'এই প্রথম এসেছি', 'ওয়াশিংটন খুব ভালো লাগছে' এই জাতীয় সরল নিরীহ সব বাক্য। সোম থেকে শনি পরপর ছয়দিন এই মহিলার হাতের প্রাতরাশ খেয়ে প্রবাসের দিন আরম্ভ করেছি। রবিবার আসার দিন ভদ্রমহিলাকে একটু ধন্যবাদ, সামান্য বিদায় জানিয়ে আসব—

সেটাই সঙ্গত।

কিন্তু তা হল না রবিবার সকালে ওই রেস্তোরাঁয় গিয়ে দেখলাম দরজা বন্ধ। রবিবার নাকি বেলা করে খোলে। প্রাতরাশ করা হল না, তার চেয়েও বড় দুঃখ, বিদেশিনীকে জানানো হল না, চলে যাচ্ছি। কাফের ঠিকানাটা পকেট থেকে নোটবুক বার করে টুকে নিলাম। কোথাও থেকে ওকে একটা চিঠি দেব।

সে আছে কিনা জানি না, কিন্তু সেই নোটবুক, সেই ঠিকানা এখনও আছে ; একটু খুঁজে দেখলেই পেয়ে যাব, কিন্তু তাকে কখনও চিঠি দেওয়া হয়নি।

প্রথমেই ওয়াশিংটনের শেষ দিনের কথা বলে ফেললাম। কিন্তু মধ্যে আর ছয় দিন রয়ে গেছে। সেগুলোর কথাও একটু একটু বলতে হবে।

তবে নিতান্ত নীরস দিনপঞ্জি দিয়ে, গতানুগতিক তথ্যে, একেবারে ব্যক্তিগত বিষয় দিয়ে ভ্রমণকাহিনীর পৃষ্ঠা ভারাক্রান্ত করে লাভ নেই। সে সব আপাতত আমার নোটবুকেই থাক।

এখন আমি ফিরে গেছি সেই মেরিডিয়ান হাউস ইন্টারন্যাশনালে, ভিজিটার প্রোগ্রাম সার্ভিসের অফিসে, প্রথম দিনের সোমবারের দুপুরে।

আমার ভ্রমণসূচি তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে ওই দুপুরে কাছেই একটা ভোজনশালায় ভিজিটার প্রোগ্রাম সার্ভিস থেকে আমার লাঞ্চের বন্দোবস্ত হয়েছে।

আমার বন্ধু কবি সুধেন্দু মল্লিকের ভাষায় বলতে পারি, সে লাঞ্চ এক লাঞ্ছনা।

না, ভিজিটার প্রোগ্রাম সার্ভিসের কোনও দোষ নেই এতে, আসলে একটা গোলমাল হয়েছিল। কলকাতা থেকে আমার যে বিবরণী পাঠানো হয়েছিল তাতে আমার সম্পর্কে সৎ ব্রাহ্মণ, সাত্ত্বিক ইত্যাদি সব বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছিল, যেগুলো বস্তুত প্রিয় বন্ধু, প্রিয়তম লেখক শ্রীযুক্ত শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে হয়তো প্রযোজ্য। প্রায় অকারণে আমাকে ওইরকম গরিমাভূষিত করা হয়েছিল।

ফলে সেই থেকে শুরু, এই ভ্রমণকালে সরকারি ও আধা সরকারি নিমন্ত্রণে আমাকে ফলমূল, আইসক্রিম, নিরামিষ তরকারি, ফলের রস এই সব খেতে হয়েছে। অথচ অন্যেরা তখন মুরগি, মটন, স্টেক, ফ্রাই, ব্রান্ডি, হুইস্কি খেয়ে যাচ্ছে ; আমার চারপাশে দিস্তা-দিস্তা বোতল-বোতল ওড়াচ্ছে।

প্রথম প্রথম নিমন্ত্রণে আমার বিরুদ্ধে এই পক্ষপাতের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণ ধরতে পারিনি। রাগে, দুঃখে লোভে ভালো করে খাওয়াই হত না। তা ছাড়া কে চিবোবে মেপল সিরাপে চোবানো আমেরিকান চাল-কুমড়োর না লালকুমড়োর ডাঁটা ? কে গিলবে কটু, কষায়, বিস্বাদ গ্রেপ ফ্রুট জুস অথবা তিতকুটে বিটার টনিক ?

লোভী মানুষের এই সব সামান্য দুঃখের কথা পাঠ করে কারও কারও

হয়তো হাসি পাবে।

এ সব কথা থাক।

সেদিন মধ্যাহ্নভোজনের পরে আমার আমন্ত্রণজনিত দুয়েকটা সরকারি কাজ সারতে হল। একবার ভারতীয় দূতাবাসে গেলাম, কাছেই সে অফিসটা। দুচারটে মামুলি কথাবার্তা হল। ইউনাইটেড স্টেটস ইনফর্মেশন এজেন্সির সদর দপ্তরে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরে যাওয়াও তালিকাভুক্ত ছিল। সে সব জায়গায় গিয়ে কিঞ্চিৎ শিষ্টবাক্য বিনিময় করতে হল।

অবশেষে ওয়াশিংটন শহরের রাজপথে হাঁটতে বেরোলাম, একা একাই।

আকারে আয়তনে ওয়াশিংটন তেমন বড় শহর কিছু নয়। সাত-আট লক্ষ লোকের শহর, এই আমাদের হাওড়ার মত। কিন্তু বড়লোকের দেশের রাজধানী। তার রাস্তাঘাট বাড়িঘরের চেহারাই আলাদা। বেশ ছড়ানো ছিটানো গোছানো রাস্তাঘাট। সকালবেলায় দেখে ভালো লেগেছিল, এখন দিনশেষের মায়াবী আলোয় আরও চমৎকার আরও মনোরম দেখাচ্ছে সব কিছু।

কিন্তু একটা কথা, ওয়াশিংটনে কোনও স্কাইস্ক্র্যাপার, গগনচুম্বী আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি নেই। বড় জোর ছয়-সাত তলা বাড়ি। পরে শুনলাম, আইন নেই, বাড়ির উচ্চতার সীমা হল ক্যাপিটল। কোনও বাড়ি ক্যাপিটলের চেয়ে উঁচু হতে পারবে না।

জানি না স্মৃতিঠাকুরানি আমার সঙ্গে পরিহাস করছেন কি না, যতদূর মনে পড়ছে এই রকমই শুনেছিলাম, কিন্তু হাতের কাছে কোনও হদিস পাচ্ছি না, কাগজপত্র যা আমার প্রবাসের সুটকেসে আছে তার মধ্যে কোনও কিছুতে এই নিষেধের উল্লেখ পাচ্ছি না।

তা হোক, ব্যাপারটা বিস্ময়কর। কানাডাসহ সমস্ত উত্তর আমেরিকার কংক্রিটের জঙ্গল ছেয়ে গেছে গলা উঁচু, গগনভেদী জিরাফে। তারই মধ্যে রাজধানী শহর ওয়াশিংটনে শুধুই হরিণ, সম্বর, জেব্রা আর নীলগাই।

এত সব জন্তুর নাম লিখলাম, জন্তুগুলোর নাম জানি সেই জন্যে নয়, নানাবিধ বিচিত্র রকমের বাড়ি দেখেছিলাম সেই কথা স্মরণ করে।

অতঃপর ক্যাপিটলের কথা বলি।

ক্যাপিটাল নয়। ক্যাপিটল।

মহামতি কার্ল মার্কস সাহেবের ডাস ক্যাপিটালের স্বর্গীয় সোভিয়েত রাশিয়া নয়, ক্যাপিটালিজমের চূড়ান্ত আমেরিকার ক্যাপিটল।

অনেক মানুষের একটা জন্মজড়ুল থাকে, অনেক শহরের থাকে স্মারকচিহ্ন। যেমন কলকাতার হাওড়া ব্রিজ বা মনুমেণ্ট, দিল্লির কুতুবমিনার, নিউ ইয়র্কের স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, আমাদের টাঙ্গাইলের ছিল খাল ব্রিজের পাশের বাহাদুর সেনের ঘ্যাগের ওষুধের তিনতলা বাড়ি, তেমনিই ওয়াশিংটনের প্রতীক হল আলো ঝলমল ক্যাপিটল সৌধ।

মার্কিনিরা বলেন ন্যাশনাল ক্যাপিটল। তার একটা কারণ আছে। শুধু রাজধানী ওয়াশিংটনে নয়, আমেরিকা যুক্তরাজ্যের প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীতে ক্যাপিটল আছে, ক্যাপিটল হল আইনসভা। রাজধানীর ন্যাশনাল ক্যাপিটলেই মার্কিন কংগ্রেসের ঠিকানা। এর হলেই দেশের সর্বোচ্চ আইনসভার অধিবেশন বসে।

ওয়াশিংটনের নানা জায়গা থেকেই ক্যাপিটলের চূড়া চোখে পড়ে। কাছে যাইনি, আমি একটু দূর থেকেই দেখেছিলাম, অনেকটা আমাদের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আদল, তবে বাড়িটা তৈরি হয়েছিল ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের অনেক আগে সেই আঠারো শো পঁয়ষট্টি সালে।

প্রাচীন রোম নগরীর সাতটি পাহাড়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাহাড়টির চূড়ায় ছিল প্রধান দেবতা জুপিটারের মন্দির। রোমদেশের জুপিটার আর গ্রিসদেশের সর্বশক্তিমান দেবাদিদেব জিউস একই দেবতা। রোমের যে ছোট পাহাড়ের চূড়ায় জুপিটারের মন্দির ছিল সেই পাহাড় আর মন্দির দুইয়েরই নাম ক্যাপিটলিন। ওই ক্যাপিটলিন থেকেই ক্যাপিটল।

ক্যাপিটল সম্পর্কে আরও একটা তথ্য আছে। অনেকেই হয়তো জানেন না কিংবা খেয়াল করেন না নিউ ইয়র্কের স্ট্যাচু অফ লিবার্টির মত একটি মুক্তিমূর্তি ওয়াশিংটনেও আছে। সেটি ওই ক্যাপিটল সৌধের উজ্জ্বল গম্বুজের চূড়ায়। নাম স্ট্যাচু অফ ফ্রিডম। ঝলমলে গম্বুজের শীর্ষে কৃষ্ণ মূর্তি, চট করে আমাদের ভিক্টোরিয়ার চূড়ার কৃষ্ণপরির কথা মনে পড়ে। কিন্তু আমাদের তো ছিল পরাধীন দেশ, আমরা মুক্তিমূর্তি, স্বাধীনতার দেবীকে পাইনি, আমাদের সৌধ রচিত হয়েছিল মৃতা ইংলণ্ডেশ্বরীর নামে. তার চূড়ায় ঘূর্ণায়মতী কালো পরি, বছরের পর বছর বঙ্গোপসাগর থেকে ছুটে আসা দুরন্ত বাতাসে পরাধীন দেশের প্রাক্তন রাজধানীর ময়দানের মাথায় কেবলই ঘুরপাক খেয়েছে।

হ্যাঁ। একদিন সেই ভুবনবিদিত সাদাকুঠি হোয়াইট হাউসেও গিয়েছিলাম স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জিমি কার্টার স্বাক্ষরিত আমন্ত্রণপত্র পেয়ে।

জানি, এ সব কথা কেউই বিশ্বাস করেন না। আমি যদি বলি লাটসাহেব আমাকে চা খেতে ডেকেছিলেন কেউ বিশ্বাস করবে না, ব্যাপারটাকে পাত্তা দেবে না, গুরুত্ব দেবে না। কিন্তু যদি বলি আমার ওপরওলা কালকে আমাকে 'গেট আউট' বলে তাঁর ঘর থেকে বার করে দিয়েছেন, সকলেই সমবেদনা জানাবেন। যদি তদুপরি বলি ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছিলেন, অনেকেই ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দেবেন।

বাজে কথা নয়। সত্যি জিমি কার্টার স্বাক্ষরিত সেই নিমন্ত্রণপত্রটি অদ্যাবধি আমার কাছে আছে।

জেমস থেকে জিমি, জিমি অবশ্যই ডাকনাম। মহামান্য আমেরিকান রাষ্ট্রপতি কিন্তু ডাকনামেই নিমন্ত্রণ-চিঠি সই করেছেন, হোয়াইট হাউসে যাওয়ার সরকারি নিমন্ত্রণ। সব কিছুই ঘরোয়া, আটপৌরে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে

নিয়ে যাওয়ার এটা একটা মার্কিন প্রয়াস, মুহূর্তের পরিচয়ে তুই-তোকারি করা, অথচ দূরত্ব রেখে চলা। এই হোয়াইট হাউস দেখতে আমি যার সঙ্গে গিয়েছিলাম সেই আমার এসকর্ট মহোদয় মিস্টার জেমস আর অস্টিন সামান্য আলাপের পরেই আমাকে বলেছিলেন, 'কল মি জিম', মানে আমাকে জিম বলে ডাকবে। মাননীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব আরও এক ধাপ এগিয়ে, নিমন্ত্রণপত্রে পর্যন্ত তিনি জিমি।

সযত্নে রক্ষিত সেই নিমন্ত্রণপত্রটি এখন আমার সামনেই রয়েছে, দেখছি ন্যানসি উইলিং নাম্নী এক মহিলার অনুরোধক্রমে আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

এতদিন পরে শ্রীমতী ন্যানসি উইলিং যে কে আজ আর মনে পড়ছে না। স্রেফ ভুলে গেছি। স্বল্পদিনের সেই প্রবাস জীবনে উইলিং বা আনউইলিং যে সব সুন্দরীদের সঙ্গে আলাপপরিচয় হয়েছিল কলকাতায় চিরগৃহিণীর উষ্ণ আশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন করে অবচেতন মনের কি এক কলাকৌশলে তাদের প্রায় সবাইকে বিস্মৃত হয়েছি। নাম, মুখ কিছুই মনে নেই, সবই ভাসাভাসা। যেন স্বপ্নে দেখা হয়েছিল, স্বপ্নেই বিলীন হয়ে গেছে, যেন জন্মান্তরের আবছায়া স্মৃতি।

যা হোক্ আমন্ত্রণপত্রে তারিখ দেখছি, ১/১৯ সময় সকাল পৌনে নয়টা। ১/১৯ মানে উনিশে জানুয়ারি, ইংরেজি মতে তারিখের প্রথমটা হল দিন, তার পরেরটা মাস, সবার শেষে বছর—এই ক্রমটাই ঠিক এবং উপযুক্ত, কিন্তু আমেরিকানদের একটু আলাদা হতে হবে তো, তাই আগে মাস তারপর দিন, তারপর বছর, উনিশে জানুয়ারি উনিশশো আটাত্তর আমেরিকান পদ্ধতিতে প্রথম প্রথম বেশ খটকা লাগে।

উনিশে জানুয়ারি তারিখটা ছিল বৃহস্পতিবার। সাদা কুঠির প্রসঙ্গে এসে মঙ্গলবার আর বুধবারের কথা বাদ পড়ে গেছে।

মঙ্গলবার সকালে জিমের সঙ্গে গেলাম লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসে। সে এক এলাহি ব্যাপার। তার বিস্তারিত বিবরণে যাচ্ছি না, যে কোনও মার্কিন ভ্রমণকাহিনীতে সেটা পাওয়া যাবে। তবে এই বিশাল লাইব্রেরির বাংলা বিভাগে গিয়ে আমি হৃদয়ঙ্গম করলাম এটা বাঙালিদের পক্ষে খুবই জরুরি একটি গ্রন্থাগার, কারণ এই একমাত্র জায়গা, যেখানে ঢাকা-কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-পূর্ব পাকিস্তান-বাংলাদেশ এবং অন্যত্র থেকেও প্রকাশিত প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য বাংলা বই একসঙ্গে আছে। এমনকি, একটু নিচু গলায় বলছি, এই হাস্যকর, অসফল রচনাকারের এক আধটি এলেবেলে গ্রন্থও যেন বইয়ের তাকে দৃষ্টিগোচর হল।

লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসে আমার একটা কাজও ছিল। বড়লোকের দেশের কায়দাকানুনই আলাদা, এখানে এই লাইব্রেরিতে একজন রেসিডেন্ট পোয়েট আছেন। তিনি হলেন কাব্য উপদেষ্টা। কাব্যের কি উপদেশ লাগে জানি না তবে তৎকালীন রেসিডেন্ট পোয়েটের সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।

সেই সময়ে রেসিডেন্ট পোয়েট ছিলেন মিস্টার রবার্ট হেডেন। তিনি তেমন বড় জাতের কোনও কবি নন। যথারীতি একজন প্রতিষ্ঠান সম্বল পদ্যকার। আমেরিকান ভার্সের নিউ অক্সফোর্ড বুক, এমনকি নিউ ইয়র্কার বুক অফ পোয়েমস ঘেঁটে দেখে নিয়েছি এই সব সঙ্কলনে কোথাও হেডেন সাহেবের স্থান হয়নি। তাছাড়া আমি অ্যালেন গিনসবার্গ, পিটার অরলভস্কির ব্যক্তিগত বন্ধু, সিটি বুকের ফারলিংগেত্তিও, নিউইয়র্কারের ওয়ালাস সান আমার কাছের মানুষ, হেডেন সাহেবকে পাত্তা দেওয়ার লোক আমি নই। শুধু ভয় পাচ্ছিলাম, হয়তো বুড়ো মানুষ, হয়তো হ্যাঁচোর-প্যাঁচোর প্রসঙ্গ তুলে আমার সংক্ষিপ্ত বিদেশ বাসের একটি চমৎকার অপরাহ্ন পানসে করে দেবেন।

চিরকালই ভবিতব্য আমার সহায়। ভবিবাবু আমাকে চিরকাল রক্ষা করেছেন, আজও করলেন। গ্রন্থাগার ভ্রমণ শেষ করে হেডেন সাহেবের খোঁজ করতে জানা গেল, কবিবর আজ আসেননি, শীতে কাবু হয়ে তিনি জ্বরে শয্যাশায়ী।

সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে ঘরে বসে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ কেমন মনে হল কিছু একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ছে।

ছবিটা খুব নতুন নয়। কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। অল্প বয়েসে আমাদের টাঙ্গাইল বাড়ির সিঁড়িকোঠার ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরে বসে চৈত্রমাসের গনগনে ভরদুপুরে ঘুলঘুলি দিয়ে দেখতাম শিমুলতুলোর সাদা সাদা আঁশ বসন্তশেষের ঘূর্ণিহাওয়ায় পাক খাচ্ছে। আমরা বলতাম, 'বুড়ির চুল'। সেগুলো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ত। ঘুঘুপাখির বিষণ্ণ ডাকে ভরা নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নবেলায় হঠাৎ হঠাৎ শিমুল তুলোর ফল ফাটার শব্দ হত ফটাস ফটাস।

সে রকম কোনও শব্দ নেই। কিন্তু কাচের জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সেই বুড়ির চুলের মত, শিমুল তুলোর রোঁয়ার মত আকাশ থেকে কী যেন ছড়িয়ে পড়ছে মাটিতে।

এমন সময়ে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ফোন বাজল আমার হোটেলের ঘরে, এই গহন বিদেশে কে আমাকে ফোন করতে পারে ভাবতে ভাবতে ফোন ধরলাম। ফোনের ওপারে শোনা গেল, 'আমি মদন মুখোপাধ্যায় বলছি।'

মদন মুখোপাধ্যায় নামটি বাঙালি পাঠকের কাছে খুব অপরিচিত নয়, চমৎকার সব বৈদেশিক লিখতেন দেশ পত্রিকার পৃষ্ঠায়। তবে তাঁর আরও দুটি পরিচয় আছে। তিনি একজন বিখ্যাত ডাক্তার ক্যানসার বিশেষজ্ঞ, আমেরিকায় ভীষণ নামডাক। তখন ওয়াশিংটনের কাছে মেরিল্যাণ্ডে লা প্লাটায় থাকতেন মাউণ্ট কারমেল এস্টেটসে, এখন থাকেন পশ্চিম উপকূলে লসঅ্যাঞ্জেলেসের কিছু দূরে।

মদন হল বাণীর ভাই। সুনীল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শালাজ হল বাণী। বাণী আর দেবুদা, স্বাতীর সুবাদে আমরা বলি দাদা আর বউদি, এই পরম-

সুহৃদ দম্পতির আমরা বহুকাল প্রতিবেশী ছিলাম। বাণীই মদনকে জানিয়েছে আমার আমেরিকায় আগমনের কথা।

মদন ফোন করে আমাকে বলল যে, সে কর্মস্থল ফেরত পরের দিন মানে বুধবার সন্ধ্যায় হোটেল থেকে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে তার বাড়িতে এবং বৃহস্পতিবার সকালে আমাকে হোটেলে ফেরত দিয়ে যাবে কাজে যাওয়ার পথে।

কথায় কথায় আমি তাকে বললাম, 'জানলার বাইরে যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে বরফ পড়ছে।' মদন বলল, 'তা হতে পারে না। আমি এই মাত্র বাড়ি ফিরলাম, পথে কিছুই চোখে পড়েনি এখানেও কিছু চোখে পড়ছে না।' তারপর একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এর আগে কখনও কোথাও বরফ পড়তে দেখেছেন?'

আমি বললাম, 'না।'

মদন থমকে গিয়ে বলল, 'তা হলে?' তারপর কী যেন বিবেচনা করে বলল, 'আপনি জানলায় গিয়ে একটু দেখে এসে বলুন তো কী দেখছেন।'

আমি বললাম, 'আমি জানলার সামনেই বসে আছি, দেখতে পাচ্ছি পেঁজা তুলোর সাদা সাদা পাতলা আঁশের মতো কি সব ভাসছে বাতাসে, ভাসতে ভাসতে নীচে পড়ছে।'

মদন বলল, 'তাই তো। আশ্চর্য।'

একটু পরে আরও দুয়েকটা কথা বলার পর মদন ফোন ছেড়ে দিল।

ফোন নামিয়েছি কি নামাইনি, দু'তিন মিনিটের মধ্যে আবার ফোনটা বেজে উঠল। আবার ধরলাম। আবার মদন।

একটু বিব্রত কণ্ঠে মদন বলল, 'তারাপদদা, আপনি ঠিকই দেখেছেন। তুষারপাত আরম্ভ হয়েছে। এইমাত্র এ বি সি, আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন সন্ধ্যার খবরে বলল। এই মুহূর্তে আমাদের এখানেও বরফ পড়া শুরু হল।'

এরপরে আমাকে বলল, 'এ নিয়ে ভাববার কিছু নেই। বছরের এ সময়ে এ ব্যাপারটা এখানে জলভাত।'

আমি এসব কিছুই ভাবছিলাম না। ভাবছিলাম বরফ পড়া এমন সাধারণ ব্যাপার, বৃষ্টির মতই সাধারণ, কই আগে তো কখনও ভাবিনি।

হঠাৎ আমার ভাবনার জাল ছিঁড়ে ফোনের ওপার থেকে মদনের গলা শোনা গেল, 'আচ্ছা, তারাপদদা এই কবিতাটা আপনি লিখেছিলেন না,

'এক বর্ষার বৃষ্টিতে যদি
মুছে যায় নাম,
এত পথ হেঁটে, এত জল ঘেঁটে
কি তবে পেলাম,
কি তবে পেলাম?'

আমি সবিনয়ে উত্তর দিলাম, 'না। মদন ও কবিতাটা আমার লেখা নয়, আমার চেয়ে প্রবীণতর এক কবির লেখা। এমন বিষাদমধুর কবিতা আমি

লিখতে পারি না।' তারপর কথার মোড় ঘোরানোর জন্যে বললাম, 'আচ্ছা আমাদের ওখানে যেমন ঝড়-বৃষ্টির মেঘলা দিনে সূর্য দেখা যায় না, রোদ ওঠে না ; এখানে দিনের বেলায় যখন তুষার পড়ে তখন কি রোদ, সূর্য দেখা যায় ?'

মদন অবাক হয়ে ফোনের ওপার থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'এ প্রশ্ন করছেন কেন, আপনি জানেন না ?'

আমি বললাম, 'তুমি আমার এই কবিতাটা কখনও পড়েছ ? শোনো।

"একদিন ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা হবে। দেখা হলে,
কাঁধে হাত রেখে বলবো, 'সাবাস ওস্তাদ।
কি কল বানিয়ে দিলে
ফিলিপস, অসরামের চেয়ে ঢের ভালো,
এখনো তোমার সূর্য
এত লক্ষ বছরেও ফিউজ হলো না।"

মদন শুনে বলল, 'না, এ কবিতা তো পড়িনি।'

আমি বললাম, 'কোথায় যাচ্ছেন, তারাপদবাবু ?'

মদন বলল, 'সেও কি আপনার কোনও কবিতা ?'

পনেরো

কোথায় যাচ্ছেন, তারাপদবাবু ?

'কতদিন পরে দেখা হলো তোমার সঙ্গে
হে আমার ছোট বয়সের উ'টশালিক,
তুমি এখানে খোলা জানালার নিচে
মাদার গাছের ডালে,
এতদিন পরে কি করে এই পথ এলে ?'

—স্বরচিত

বুধবার দুপুরে চাঁদে গেলাম। সঠিকভাবে বলতে গেলে সন ১৯৭৮, ১৮ জানুয়ারি, বুধবার দুপুর দুটোয় চাঁদে গেলাম। চাঁদে নামা হয়নি, চাঁদের চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে অবশেষে নিরাপদে সশরীরে মরলোকে ফিরে এলাম।

সে এক অবাস্তব অভিজ্ঞতা।

একটা মাঝারি সাইজের মহাকাশযানে আমরা বেশ কয়েকজন যাত্রী। আমার সঙ্গে আমার এসকর্ট জিমসাহেবও রয়েছেন।

মুহূর্তের মধ্যে হু-উ-উ-উ-স তারপর শোঁ-শোঁ শব্দ করে সেই মহাকাশযান অতল অন্তরীক্ষে যাত্রা শুরু করে দিল ঘণ্টায় হাজার মাইল কিংবা তারও বেশি গতিতে। নীল আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র জ্বল জ্বল করছে। ওই শনিগ্রহ দেখা যাচ্ছে, তার বলয় দেখেই তাকে চেনা যাচ্ছে। ওদিকে একটা রক্তগোলক, লাল আলো ছড়াচ্ছে, ওটাই সম্ভবত বুধ। একটু নীচে সবুজ বলের মত আমাদের পুরনো পৃথিবীও দেখা যাচ্ছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে মহাবিশ্ব পরিক্রমা শেষ হল। বোধহয় পাঁচ ডলার লেগেছিল টিকিটের দাম।

স্থান, ওয়াশিংটন নগরীর জেফারসন ড্রাইভে স্মিথসনিয়ান ইন্সটিটিউশন। ইন্সটিটিউশনের দোতলায় ন্যাশনাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়াম, যেখানে ভেলকিবলে পুরো গ্যালারিটা মহাকাশযান হয়ে যায়।

স্মিথসনিয়ান ইন্সটিটিউশন এক অত্যাশ্চর্য জাদুঘর। শিল্প, কলা, ভাস্কর্য, ছবির গ্যালারি থেকে শুরু করে ইতিহাস প্রযুক্তিবিদ্যা সব কিছুরই প্রদর্শনী। বিশাল ব্যাপার। এমনকি কিছু দূরে পাঁচশো বিঘে জমির ওপরে এদের একটা চিড়িয়াখানাও রয়েছে। সেখানে জীবজন্তুর সংখ্যা দু হাজার, যার মধ্যে সাদা বাঘও রয়েছে।

ইংলন্ড দেশীয় জনৈক জেমস স্মিথসন নামক এক ধনী ব্যক্তি, দেড়শো বছর আগে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে দান করে যান বিধিসম্মতভাবে উইল করে।

স্মিথসন সাহেবের উইলের শর্ত ছিল যে, ওই সম্পত্তির অর্থ দিয়ে

ওয়াশিংটন শহরে স্মিথসনিয়ান ইন্সটিটিউশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে, যে প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে জ্ঞানের বৃদ্ধি ও প্রসার।

গত দেড়শো বছরে স্মিথসনিয়ান ইন্সটিটিউশন দীর্ঘ পথ পার হয়ে এসেছে, সারা উত্তর আমেরিকায় এটি একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান, এর পরিচালক মণ্ডলীতে রয়েছেন প্রধান বিচারপতি, উপরাষ্ট্রপতি ইত্যাদি সব কেউকেটা লোক।

যা হোক স্মিথসনিয়ানের স্পেস মিউজিয়াম থেকে মহাকাশ যাত্রার পর ক্লান্ত শরীরে ফিরে হোটেলের বিছানায় কাবু হয়ে শুয়ে ছিলাম। পর পর কয়েকদিনের অনিয়মিত রুটিনে খুবই কাহিল তখন আমি, জানতাম মদন, ডাক্তার মদনগোপাল মুখোপাধ্যায় আমাকে নিতে আসবে কিন্তু মনে মনে একেক সময়ে আশা করছিলাম মদন হয়তো নিতে আসতে পারবে না, সে ব্যস্ত ও সফল চিকিৎসক, তদুপরি গবেষণারত, নিশ্চয় কাজে-কর্মে-কলে আটকে যাবে। ফোনে জানাবে, 'সরি তারাপদদা, একেবারে আটকিয়ে গেছি।'

কিন্তু চিরকাল যা হয়েছে, আমার আশাভঙ্গ করে যথাসময়ে ঘরের দরজায় ঠুক্‌ঠুক্‌ করে মদন ঢুকে পড়ল।

সামান্য কিছু রাত্রিবাস সঙ্গে করে মদনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। তার বাড়ি শহরের থেকে বেশ বাইরে মেরিল্যাণ্ডের মাউণ্ট কারমেল এস্টেটসে।

সন্ধ্যাবেলার আলোকোজ্জ্বল ওয়াশিংটন ঘোরাতে ঘোরাতে বিভিন্ন দর্শনীয় জায়গা দেখানো শেষ করে ওয়াশিংটন শহর পেরিয়ে ফাঁকা মাঠের মধ্যে রাস্তায় উঠে মদন বলল, 'কিছু কেনাকাটা করতে হবে। আপনার কোনও অসুবিধে হবে না তো?'

আমি বললাম, 'আমার অসুবিধের কথা নয়, কিন্তু তুমি এই শহর পেরিয়ে ধু-ধু প্রান্তরে বাজার করবে কোথায়?'

মদন বলল, 'চলুন দেখবেন।'

একটু পরে বড় রাস্তা থেকে নেমে একটা মেঠো পথ ধরে গাড়িটা একটু এগোতেই দেখি বিশাল ব্যাপার, আলোয় আলোময়, ঝলমলে এক ময়দানবের প্রাসাদ। তার সামনের উঠোনে সারি দিয়ে শয়ে শয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মদন বলল, 'এটা একটা নতুন সুপারমার্কেট।' নতুন কিংবা পুরনো কোনও রকম সুপারমার্কেটই আমি ইতিপূর্বে দেখিনি।

কৌতূহলভরে মদনের পিছু পিছু এসকেলেটর বাহিত বাজারের দোতলায় উঠলাম।

দেখি তাজ্জব ব্যাপার। বেশ কয়েক তলা জুড়ে মানুষের যা কিছু চাহিদা হতে পারে সব সামগ্রী থরে থরে সাজানো। আনাজ, তরকারি, মাছ-মাংস থেকে জামাকাপড়, জুতো, খেলনা, প্রসাধনদ্রব্য, সিগারেট, মদ, বই—কি পাওয়া যায় না সেই বাজারে?

মদন ঘুরে ঘুরে বেছে বেছে বই কিনল, চমকপ্রবণ, প্রচারপটু সলোমন রুশদির প্রথম বই। কিনল শৌখিন পাখি ডাকা টেবিল ঘড়ি, গণনযন্ত্র

ক্যালকুলেটার (তখন সদ্য-জনপ্রিয় হচ্ছে)। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

তখন কি বুঝেছি এ সবই আমার আর মদনের দিদি বাণীর জন্যে উপহার, তা হলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতাম।

অনেক কেনাকাটা শেষ করে আবার মদনের গাড়িতে উঠে দ্রুত পৌঁছে গেলাম এক অতি শান্ত পরিবেশে।

অনেকগুলো ছোট ছোট পাহাড় নিয়ে মাউণ্ট কার্মেল এস্টেটস্‌। পাহাড়-চূড়ায়, পাহাড়ের গায়ে একটি দুটি বাড়ি। রাতের অন্ধকারে আলোজ্বলা দরজা-জানলা, সদর গেট দেখে বাড়িগুলোর, সেই সঙ্গে পাহাড়গুলোর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়।

মদনের বাড়ি একটা ছোট পাহাড়ের শিখরে। গাড়ি করে তার ওপরে উঠতে উঠতে স্বগতোক্তি করেছিলাম, 'এত ফাঁকা, এত নির্জন।' শুনে মদন বলেছিল, 'জানেন তারাপদদা, এ দেশে ফাঁকা জায়গা, নির্জনতা বহু মূল্যে কিনতে হয়।'

মদন ও মদনের সুগৃহিণীর আদর-আপ্যায়ন, সেই রাতের পানভোজন, আড্ডা-গল্প সব মনে আছে। সেই সুখস্মৃতি আমার নিজেরই থাক।

পরের দিন বেশ সকালে মদন আমাকে হোটেলের দরজায় নামিয়ে দিয়ে গেল। তার কাজের জায়গায় তাড়াতাড়ি ছিল সে আর নামল না। আমি ফুটপাথে নেমে মদনের গাড়ির চলে যাওয়া দেখলাম। গাড়ির জানালার কাচ সামান্য নামিয়ে সে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে চলে গেল। আমার হাত নাড়ার উপায় নেই। আমার দু হাত ভর্তি মদনের দেওয়া উপহার। কিন্তু মুখ ফুটে ধন্যবাদ জানানোও হল না।

বহুকাল আগে দাক্ষিণাত্যের এক প্রত্যন্ত শহরে এক সাহিত্য সভায় আরও অনেকের সঙ্গে আমন্ত্রিত হয়ে আমিও গিয়েছিলাম।

সেই শহরের অতি প্রাচীন মিউনিসিপ্যালিটির বৃদ্ধ চেয়ারম্যান ছিলেন ওই সাহিত্যসভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। চন্দনচর্চিত ললাট, গৌরকান্তি, শুভ্র উত্তরীয় এবং শুভ্রতর উপবীত ভূষিত সভাপতি মহোদয় চেবানো ইংরেজিতে তাঁর ভাষণশেষে বলেছিলেন, 'আপনারা বহু বহু মান্যগণ্য লোক, আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে খেলো করতে চাই না। আপনারা এই সম্মেলনে এসেছেন আপনাদের শত শত ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

না। ওই ধরনের সারল্যের প্রকাশ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আমাদের একান্ত বাণীর ভাই মদনকে আমি কোনও ধন্যবাদ এই এতকাল পরেও আর জানাতে চাই না।

তার সঙ্গে পরে আরও দুয়েকবার দেখা হয়েছে এই কলকাতা শহরেই, যখন সে ছুটিছাটায় এসেছে। তখনও তাকে তার সৌজন্য ও আতিথেয়তার কথা স্মরণ করিয়ে বিব্রত করিনি। তবে আবার যদি কখনও মার্কিন ভূখণ্ডে যাই, যাওয়ার সুযোগ হয়, তবে আবার তার অতিথি হবো।

অনেকদিন আগে সেই বিলিতি গল্পটা চুরি করে আমিই তো লিখেছিলাম।

একটি বাচ্চা মেয়ে ঝোলা ভর্তি বই কাঁধের ব্যাগে নিয়ে স্কুলে যেত। আমি হাতব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে অফিসে যেতাম। দৈনিকই একই সময়ে একই বাস-স্ট্যাণ্ডে দেখা হত। সেই থেকে অসম সখ্য। তার বয়েস নয়-দশ, আমার বয়েস তিরিশ-বত্রিশ। কলকাতার বাস কখন আসে কখন আসে না, ঠাঠা রোদ্দুরে, রিমঝিম বৃষ্টিতে একটা বুড়ো পিপুলগাছের নীচে দাঁড়িয়ে দুজনায় অনেক গল্পগুজব হত। দুজনায় একই সঙ্গে উদ্বিগ্ন হতাম স্কুল কিংবা অফিসে যেতে দেরি হচ্ছে বলে।

এই ভাবে ঘনিষ্ঠতা হল। অবশেষে মেয়েটি একদিন বাসস্ট্যাণ্ডে তার স্কুলব্যাগ থেকে একটা ছোট খাম বের করে আমাকে দিল।

আমি জানতে চাইলাম, 'এটা কি?'

মেয়েটি মধুর হেসে বলল, 'আমার জন্মদিনের নিমন্ত্রণ।'

আমি বললাম, 'কবে?'

মেয়েটি মধুরতর হেসে বলল, 'আজকেই। তবে নিমন্ত্রণটা সামনের রোববার সন্ধ্যায়। সেদিনই সবার সুবিধে।'

আমি বললাম, 'হ্যাপি বার্থ ডে। কিন্তু কি করে তোমার নিমন্ত্রণে যাব? আমি তো তোমাদের বাড়ি চিনি না।'

সে বলল, 'সে খুব সোজা। সামনের ডানদিকের গলিটায় ঢুকে বাঁদিকে দুটো বাড়ি পরে, লাল রঙের তিনতলা পুরনো বাড়ি। দোতলায় নেমপ্লেট লাগানো আছে 'চক্রবর্তী', পাশেই কলিংবেল, সে বেলটা কনুই দিয়ে টিপলেই আমি নিজে এসে দরজা খুলব।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'হাত থাকতে কনুই দিয়ে কলিংবেল টিপতে যাব কেন?'

সে বলল, 'বাঃ, আপনার দুহাত তো উপহারে জোড়া থাকবে, থাকবে না?'

সেই গল্প এতকাল পরে আমার নিজের ক্ষেত্রে সত্য হল। মদনের উপহারে আমার দু হাত ভর্তি। কোনও রকমে কোলে ধরে লিফটে করে উঠে এসেছি। হোটেলে নিজের ঘরে অবশ্য কলিংবেল টিপতে হবে না, কিন্তু চাবি দিয়ে দরজা তো খুলতে হবে। উপহারগুলো দরজার সামনে নামিয়ে চাবি দিয়ে দরজা খুলে সব জিনিসপত্র তুলে স্নান করতে গেলাম।

এটা বৃহস্পতিবার সকালের কথা। ওই সকালেই এর পরে হোয়াইট হাউসে গিয়েছিলাম। তারপর বিকেলে মাউণ্ট ভার্ননে। সেখানেই দেখা হল পেটোম্যাক নদীর ধারে মাদার গাছের ডালে আমার ছোট বয়েসের ডাঁটশালিকের সঙ্গে। দেখা হল বহুকাল পরে।

মাউণ্ট ভার্নন, ওয়াশিংটন শহর থেকে বেশ দূরে, কলম্বিয়া জেলার বাইরে ভার্জিনিয়া রাজ্যে।

হোয়াইট হাউস পর্ব সারা হয়ে যাওয়ার পর খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম করে জিমসাহেব আমাকে নিয়ে বেরোলেন মাউণ্ট ভার্নন দেখাতে।

মাউণ্ট ভার্নন আমেরিকানদের একটি পছন্দসই নাম। এ নামে অন্তত পাঁচ-সাতটি স্থান আছে সে দেশে। ঠিক একই রকম ভাবে একই নামের শহর আছে বিভিন্ন রাজ্যে, শুধু ওয়াশিংটন নামেই তিনটে জায়গা এবং একটি রাজ্য আছে। ঠিক একই নামের রাস্তা আছে বিভিন্ন শহরে, যেমন আমাদের দেশে রামপুর নামের জায়গা, বা মহাত্মা গান্ধী রোড নামে রাস্তা যত্রতত্র।

রাস্তার প্রসঙ্গই যখন উঠল আর একটা মজার কথা জানিয়ে রাখি। ও দেশে বাড়ির নম্বর একটু অন্য রকম। আমরা সচরাচর দেখতে পাই রাস্তায় বাড়ির নম্বর এক, দুই, তিন করে কিংবা জোড়-বিজোড় করে একদিকে এক-তিন-পাঁচ অন্য দিকে দুই-চার এই ভাবে সাজানো। কিন্তু আমেরিকায় বাড়ির নম্বরে কোনও সঙ্গতি নেই। একাশি নম্বর বাড়ির পরেই তিনশো সাতাশ, তার পরেই হয়তো এগারোশো সাত। এখন আমার ছেলে হিউসটনে যে বাড়িতে থাকে সে বাড়ির নম্বর ছয় হাজার পাঁচশো, কিন্তু সেই রাস্তায় পাঁচশো কেন পঞ্চাশটা বাড়িও নেই।

ব্যাপারটা হল, বাড়ি তৈরির পর নগর দপ্তরে সেই বাড়ির জন্যে প্রায় যে কোনও নম্বর চাওয়া যায়, শুধু দুটি শর্ত যে সেই প্রার্থিত নম্বরটি তার আগের বাড়ির নম্বরের চেয়ে কম সংখ্যায় হবে না এবং অবাস্তব কোনও দীর্ঘ সংখ্যা হবে না।

অনেক হল, কতটা ভুল বললাম বুঝতে পারছি না। বরং মাউণ্ট ভার্ননে ফিরে যাই। সে তথ্য স্মৃতিনির্ভর নয়, হাতের কাছেই রয়েছে মুদ্রিত প্রচারপত্র।

প্রথম আমেরিকান রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটনের প্রপিতামহ জন ওয়াশিংটন পাঁচ হাজার একর জমির ওপরে সোয়া তিনশো বছর আগে মাউণ্ট ভার্ননে খামার বাড়ির পত্তন করেন। পরবর্তী কালে জর্জ ওয়াশিংটনের পিতৃদেব অগাস্টাইন ওয়াশিংটন এর মালিক হন। তিনি আবার জর্জ ওয়াশিংটনের দাদা লরেন্স ওয়াশিংটনকে এই সম্পত্তি দেন। সেই সময়ে লরেন্স তাঁর প্রাক্তন ওপরওলা অ্যাডমিরাল ভার্ননের নামে এই এলাকার নামকরণ করেন মাউণ্ট ভার্নন। এর কিছুদিন পরে লরেন্সের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে সম্পত্তির মালিকানা যায় জর্জ ওয়াশিংটনের হাতে। তারও সিকি শতক পরে ওয়াশিংটন আমেরিকার প্রথম রাষ্ট্রপতি হন।

খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত আমেরিকা তখন যুদ্ধ-বিগ্রহে, আত্মক্ষয়ী, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত। যুক্তরাষ্ট্রীয় চেতনা দানা বাঁধেনি। প্রথম দিকে জর্জ ওয়াশিংটন মাউণ্ট ভার্ননে ভালো করে বসবাস করতে পারেননি। একদিকে ফরাসি অন্যদিকে তথাকথিত মার্কিন ভারতীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। মধ্যে অবশ্য বছর পনেরো এখানে সুখী দাম্পত্য ও কৃষক জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।

পুরনো পৈতৃক বাড়ি আগাগোড়া সংস্কার করেছিলেন জর্জ। নতুন সব বাগান করেছিলেন, পুরনো ছোট দালানগুলি ভেঙে বড় করেছিলেন, বসতবাটির পরিবর্ধন করেছিলেন।

এই বাড়ি সম্পর্কে আরও দুটো কথা আছে। এই বাড়িতেই জর্জ ওয়াশিংটন মারা যান এবং এখানেই তাঁকে কবর দেয়া হয়। আর স্কুলপাঠ্য বইয়ের সেই যে বহুপঠিত গল্প, বালক জর্জ ওয়াশিংটনের কুঠার দিয়ে চেরিগাছ কেটে ফেলা, তারপর তাঁর সত্যবাদিতা, সেই ঘটনার পটভূমিকাও এই বাড়ি।

নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশ। শীতের অপরাহ্ণে ঠাণ্ডা প্রায় বরফজমা বাতাস, প্রায় কেন প্রতিদিন রাতেই বরফ পড়ছে, আজ রাতেও নিশ্চয় পড়বে। অদূরে পোটোম্যাক নদী, সেই নদীতে নৌকো করে কারা কোথায় যাচ্ছে।

দুশো বছর আগের সেই পরিবেশ, খামার বাড়ি, আউট-হাউস, আইস-হাউস, রান্নাঘর, ধোবিখানা সব যথাযথ ভাবে রক্ষা করা হয়েছে। এমনকি সদ্য শিকার করে আনা ছাল ছাড়ানো হরিণ ঝুলছে লোহার আংটায়। শিকারির বন্দুক দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা রয়েছে, পায়ের বুটজোড়া বারান্দার একপাশে, যেন এই মাত্র সেটা খুলে কেউ ঘরের মধ্যে ঢুকেছে।

রান্নাঘরের পিছনে একটু এগিয়ে গেলেই পোটোম্যাক নদী, একেবারে পটে আঁকা ছবির মত। সেই নদীর তীরে যাওয়ার পায়ে চলার পথের পাশে ঠিক মাদার গাছের মত কাঁটাওলা একটা গুল্ম আর তার ডালে একঝাঁক সাদাটে পাখি আমাদের ভাঁটশালিকের মতো দিনশেষের হইহল্লা সেরে নিচ্ছে।

কিন্তু ওরা এখানে এতদূরে এল কি করে?

ওয়াশিংটন পর্ব বড় বিস্তারিত হয়ে গেল। বরং এবার নিউ ইয়র্কে গিয়ে সেখান থেকে না হয় একটু সময় করে আরেকবার ওয়াশিংটনে ফেরা যাবে।

সুতরাং আপাতত দুদিন গুবলেট হয়ে যাক।

সুতরাং এখন রবিবারের সকাল সাড়ে দশটা। আমেরিকায় আমার দ্বিতীয় রবিবার। জিমসাহেবের সঙ্গে মালপত্র নিয়ে এসে উঠেছি, ওয়াশিংটন স্টেশনে অ্যামট্রাকের নয়নমোহন রেলগাড়িতে।

দুশো পঁচিশ মাইল দূরে নিউ ইয়র্ক। পৌঁছোব ঘণ্টা তিনেক পরে। পথে ফিলাডেলফিয়া পড়বে।

অ্যামট্রাকের রেলের কামরার মধ্যেই দেখলাম চা, কফি, বিয়ার ইত্যাদি পানীয়, রকমারি স্ন্যাকস, ছোটখাটো উপহারের সামগ্রী, এই সব পাওয়া যায়।

এতে অবশ্য খুব একটা আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এ সব জিনিস রেলগাড়ির কামরায় পাওয়া যেতেই পারে। তবে হকার নেই। এ সব দ্রব্য হকারের কাছ থেকে কিনতে হয় না, রেলকোম্পানির নিজেরই ব্যবসা এটা।

আরেকটা ব্যাপার দেখলাম। 'অন্ধ হয়ে ভাই কত কষ্ট পাই' গান গাওয়া কিংবা 'আমি বোবা, আমার মা বোবা, আমার বাবা বোবা, আমার শ্বশুর বোবা' ইত্যাদি মুদ্রিত কার্ডওলা ভিখিরির অত্যাচার নেই অ্যামট্রাকের রেলগাড়িতে।

তবে সাহেবরা কি রেলগাড়িতে দূরযাত্রায় আমাদের মতই সঙ্গী জুটিয়ে

তাস খেলে ? অন্তত আমাদের কামরায় কিংবা পাশের কামরায় কোনও সাহেব-মেমকে দেখতে পেলাম না যে তাস খেলছে। কিন্তু চমৎকার তাস আমেরিকার বিচারে ন্যায্য মূল্যে, বোধহয় দু ডলার দাম ছিল এক প্যাকেটের, অ্যামট্রাকের কামরায় বিক্রি হচ্ছে দেখলাম।

আমি তাস ভালো খেলতে পারি না, কিন্তু তাসখেলার পুরনো ভক্ত, এক জোড়া তাস কিনে ফেললাম।

প্রত্যেকটি তাসের পিঠে অ্যামট্রাকের ট্রেনের ছবি, কারুকার্য করে অ্যামট্রাক লেখা। সুন্দর, শক্ত, অজর অমর প্ল্যাস্টিকের তাস, থাকলে হয়তো এখনও খেলা যেত।

আমাদের আগের বাড়ির পাশের বাড়িতে একটা বিয়ে ছিল। সে বিয়েতে আমাদের নিমন্ত্রণ হয়নি কিন্তু বিয়ের দিন রাত প্রায় দেড়টার সময় স্বয়ং কন্যাকর্তা, আমার প্রতিবেশী ভদ্রলোক সদর দরজায় কড়া নেড়ে আমাকে ঘুম থেকে তুললেন।

আচমকা এত রাতে ঘুম ভাঙানোয় আমি ভাবলাম, বিয়ে বাড়িতে হয়তো কিছু অঘটন হয়েছে।

কিন্তু তা নয়। বরযাত্রীরা তাস খেলতে চাইছে। আমার কাছে কি এক প্যাকেট তাস হবে ? আমি কি সেটা এক রাত্রির জন্যে ধার দিতে পারি ?

এর পরে কি এই সামান্য ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীকে না করা যায়। তা ছাড়া এর সঙ্গে এ পাড়ার সম্মানও জড়িত রয়েছে।

ঘুম ভাঙা চোখ কচলিয়ে নিয়ে বাড়ির মধ্যে গিয়ে টেবিলের দেরাজ হাতড়িয়ে অ্যামট্রাকের তাসের প্যাকেটটা খুঁজে বার করে এনে প্রতিবেশী ভদ্রলোককে দিলাম। বহু ধন্যবাদ দিয়ে তিনি আশ্বস্ত করে চলে গেলেন যে পরের দিন সকালেই বরযাত্রীরা চলে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি তাস জোড়া আমাকে ফেরত দিয়ে যাবেন।

মাননীয় তাসুড়ে বরযাত্রিবৃন্দ কবে গিয়েছিলেন, পরের দিনই গিয়েছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু আমার পরম সৌজন্যপরায়ণ প্রতিবেশী মহোদয়ের কাছ থেকে তাস জোড়া উদ্ধার করতে দু তিন সপ্তাহ লেগেছিল।

তা তাস জোড়া নয়, ঠিক অর্ধেক অর্থাৎ হাফজোড়া তাস ফেরত পেয়েছিলাম। তবে তাসের প্যাকেটটা অটুট ছিল।

যে-কোনও তাসের প্যাকেটের মতো আমার প্যাকেটেও ছিল বাহান্নটা তাস দুটো জোকার।

ফেরত পেলাম ছাব্বিশটা তাস, একটা জোকার। অদ্যাবধি সেগুলো ব্যবহার করার কোনও সুযোগ পাইনি। কিন্তু ফেলে দিইনি, রেখে দিয়েছি, তুষারসিঞ্চিত এক শীতমগ্ন সকালবেলায় এক অপরিচিত মহাদেশের বুক চিরে সেই আমার প্রথম যাত্রার স্মৃতি।

কিন্তু একটা খটকা আজও রয়ে গেছে। অন্য ছাব্বিশটা তাস আর একটা জোকার যাঁর কাছে আছে, তিনি সেগুলো কি ভাবে ব্যবহার করছেন। জানি

-না, তিনি এই লেখা পড়বেন কিনা। যদি পড়েন, দয়া করে আমাকে জানাবেন। আমার উপকার হবে, বাকি তাসগুলোর সদ্ব্যবহার হবে।

কথায় আছে,

'তাস পাশা
সর্ব নাশা।'

কথায় কথায়, তাসের কথায় কতদূরে চলে এলাম।

তার চেয়ে অবিলম্বে আসল জায়গায় চলে যাই।

অ্যামট্রাকের ট্রেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে ওয়াশিংটন থেকে নিউ ইয়র্ক। একটু আগে ফিলাডেলফিয়া শহর পার হয়ে এসেছি।

নিউ ইয়র্ক আর মাত্র এক ঘণ্টার পথ।

ষোলো

ফিচাপিলা

'হঠাৎ উঠেছে দেখ ষোলোতলা,
হয়তো পনেরো হতে পারে,
কে জানে সতেরো,
আকাশকে মাটিকে তামাশা
জিরাফ তুলেছে যেন গলা'...

—বিষ্ণু দে

ফিচাপিলা আখ্যান দিয়েই আমার নিউ ইয়র্ক পর্ব আরম্ভ করা উচিত।

কিন্তু একটা বড় অসুবিধে হয়েছে। এমনকি আমার মত চরম নির্লজ্জেরও অস্বস্তি হয়েছে এই প্রায় আজগুবি আখ্যানটি এখন লিখতে।

তার কারণ অবশ্য ওই একটাই। এই গল্প আমি এতজনকে এতবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছি এবং শুধু বলা নয়, পত্রিকার পৃষ্ঠায় লিখে ফেলেছি, গ্রন্থস্থও হয়েছে।

কিন্তু সম্পাদক মহোদয়ের অনুমতি নিয়ে এবং পাঠকদের কৃপা ভিক্ষা করে 'ফিচাপিলা' আখ্যানটি আবার শোনাচ্ছি, তা না হলে আমার নিউ ইয়র্ক ভ্রমণপর্ব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এই অধ্যায় শুরু করেছি কবি বিষ্ণু দে রচিত কবিতার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করে। বিষ্ণু দের এই কবিতা কলকাতাকে নিয়ে, তিনি এই শহরের আজন্ম অধিবাসী এবং প্রাচীন বংশের সন্তান। শেষ বয়সে তিনি দেখেছিলেন গলি ও রাজপথের আনাচে-কানাচে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বহুতল বাড়ির অহমিকা, যা তাঁর দৃষ্টি, স্মৃতি ও স্নায়ুকে আঘাত করেছিল। তবু ভাগ্য ভালো, তিনি এই শহরের প্রোমোটার এবং ডেভলপারদের সীমাহীন ঔদ্ধত্য দেখে যাননি।

বিষ্ণু দে কলকাতা শহরের পনেরো-ষোলো-সতেরো তলা বাড়ির কথা বলেছেন, বলেছেন এদের জিরাফের মত গলা, এরা আকাশ ও মাটিকে তামাশা করছে।

কিন্তু নিউ ইয়র্কের তুলনায় এ সব তামাশা কিছু নয়।

যতদূর জানি, কলকাতা শহরে এখনও সবচেয়ে লম্বা বাড়ি পঁচিশ বা তিরিশ তলার সীমা ছাড়ায়নি। নিউ ইয়র্ক শহরের গগনচুম্বী বাড়িগুলোর কাছে এগুলো নস্যি। নস্যি শব্দের প্রয়োগটা হয়তো সকলের কাছে বোধগম্য হবে না, তাই বলতে পারি পিঁপড়ে, জিরাফের কাছে যেন পিঁপড়ে।

নিউ ইয়র্কের উঁচু বাড়ির শততল ফ্ল্যাটের জানালা থেকে নীচের পুরনো দিনের পাঁচ-দশ-পনেরো তলা বাড়িগুলোকে কুটিরের মত মনে হয়, মনে হয় দ্রুম অরণ্যে গুল্মগুচ্ছ।

তবে একথাও ঠিক যে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ি এখন আর নিউ ইয়র্কে নয়। আমি যখন গিয়েছিলাম তখনই নিউ ইয়র্কের সে খ্যাতি অবলুপ্ত হয়েছে।

গিনেসের বুক অফ রেকর্ডে দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার দিনক্ষণ দেয়া আছে। উনিশ শো চুয়াত্তর সালের চৌঠা মে বেলা দুটো চৌত্রিশ মিনিট পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টার ছিল পৃথিবীর উচ্চতম দালান। কিন্তু ওই দিন বেলা দুটো পঁয়ত্রিশ মিনিটে শিকাগোতে সিয়ারস রোবাক অ্যান্ড কোম্পানির শিকাগো শহরের ওয়াকার ড্রাইভের ক্রম নির্মীয়মাণ হেড কোয়ার্টার, যার নাম সিয়ারস টাওয়ারস, একশো চার তলা ছোঁয়। বাড়িটি এর পরেও আরও ছয়তলা বেড়ে একশো দশ তলা হয়েছে। যার উচ্চতা চৌদ্দশো চুয়ান্ন ফিট এবং দুটি সুদীর্ঘ টিভি অ্যান্টেনা সমেত আঠারোশো ফিট।

তবে এ খেলার তো কোনও শেষ নেই। সেই কবে এম্পায়ার স্টেট বিলডিং নিয়ে শুরু হয়েছিল। এখন সারা উত্তর আমেরিকা, ক্যানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নগরে প্রান্তরে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় গগনভেদী ইমারতে দিগদিগন্ত ছয়লাপ হয়ে আছে।

সঠিক কিনা জানি না, সিয়ারস টাওয়ারের সেই একশো দশতলার গরিমাও নাকি আর নেই, ক্যানাডার টরনটো নাকি মার্কিন সিয়াটলে এমনকি জাপানেও। পঙ্গু ইউরোপেও এমন সব বাড়ি উঠেছে এবং ইতিমধ্যে উঠে গেছে যার সঙ্গে তুলনায় সিয়ারস টাওয়ার তুচ্ছ।

এ সব গৌরচন্দ্রিকা থাকুক। এ সব তো প্রায় সকলেরই জানা। এবার সরাসরি 'ফিচাপিলা' রহস্যে যাই।

নিউ ইয়র্ক নগরে আমার থাকার আয়োজন ছিল একেবারে জমজমাট মধ্য শহরে। জায়গাটা লেক্সিংটন এভিনিউ এবং উনপঞ্চাশ নম্বর রাস্তার মোড়ে, ডোরালস ইন নামে একটা হোটেলে। আমেরিকার ধনবাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র পঞ্চম এভিনিউ, সেই সুবিদিত ফিফথ এভিনিউ এখান থেকে বেশ কাছে।

ডোরালস ইন খুব উঁচু বাড়ি নয়। আমি ঘর পেয়েছিলাম চারতলায়। তবে তারও ওপরে আরও শেষ অনেক তলা ছিল।

এখন নিউ ইয়র্ক এবং অন্যত্র যতই উঁচু বাড়ির ছড়াছড়ি হোক, উঁচু বাড়ি বলতে, গগনচুম্বী প্রাসাদ হিসেবে আমাদের বাল্যস্মৃতিতে বিধৃত হয়ে আছে 'এম্পায়ার স্টেট বিলডিং'। বহুতল বাড়ির প্রথম যুগে এম্পায়ার স্টেট বিলডিং ছিল জগৎসংসারের সর্বোচ্চ দালান। কিশোর পাঠ্য ভূগোলে আমেরিকা অধ্যায়ে প্রায় আধপাতার একটি হাফটোন ছবি থাকত ওই আকাশভেদী বর্শাফলকের মত চূড়ান্বিত প্রাসাদের। সে ছবি সাধারণ জ্ঞানের বইতেও ছাপা হত, কোথাও কোথাও আধুনিক জগতের সপ্তমাশ্চর্যের মধ্যে এম্পায়ার স্টেট বিলডিংকে গণ্য করা হত।

ভুলেই গিয়েছিলাম এম্পায়ারের কথা। এমন কি নিউ ইয়র্ক শহরে কোথায় কোথায় যাব, কি কি দেখব তার তালিকা রচনার সময়েও সে কথা মনে পড়েনি।

কিন্তু বাল্যস্মৃতি বড় মারাত্মক।

ডোরালস ইনে আমার নিজের ঘরে পৌঁছে জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে কাচের জানলায় গিয়ে বাইরেটা দেখছিলাম, শীতের মেঘলা ও ঘোলাটে আকাশ, তারই মধ্যে অনেক বহুতল বাড়ির ফাঁকে চোখে পড়ল এম্পায়ার স্টেট বিলডিংয়ের চিরপরিচিত চূড়া।

প্রথমে খটকা লেগেছিল, কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে, আগে কোথায় যেন দেখেছি কিন্তু তা কি করে সম্ভব—এই রকম ভাবতে ভাবতে বহু পুরনো এক ভূগোল বইয়ের পাতা খুলে গেল মনের মধ্যে। এই তো সেই এম্পায়ার স্টেট বিলডিং। কোনাকুনি ভাবে জানলার মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে কিন্তু পুরোপুরি প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না। তার সামনেই আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা সুউচ্চ প্রাসাদ। পরে জেনেছিলাম, সেটি হল প্যান অ্যাম বিমানের বাড়ি। এমন ভাবে হিংসে করে গড়া হয়েছে যাতে এম্পায়ার স্টেট বিলডিং আড়াল হয়ে যায়।

কিন্তু তা ঠিক হবার নয়। প্যান অ্যাম বিলডিং এম্পায়ার স্টেটের মর্যাদা কখনোই পায়নি। ওয়ার্লড ট্রেড সেণ্টারও নয়। জগৎজোড়া খ্যাতি এদের কপালে জোটেনি।

কুহেলি মলিন আকাশের সিলুয়েটে এম্পায়ারের স্মৃতিভেদী চূড়া দেখে আমার হৃদয় আনচান করে উঠল। পুরনো নদী বা গ্রামের সন্নিকটে গেলে যেমন হয়, যেন অনেকটা সেরকম বোধ হল।

কি আশ্চর্য, মফস্বলি কৈশোরের বহু কল্পনা বিজড়িত, একতলা দালানের পৃথিবী থেকে কল্পদৃষ্টিতে দেখা এই প্রাসাদের এত নিকটে আমি এসে পৌঁছেছি।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে, হাতমুখ ধুয়ে চা খেতে হোটেলের একতলার রেস্তোরাঁয় যাব আবার জানলা দিয়ে দৃষ্টিগোচর হল এম্পায়ারের চূড়া।

ঠিক করলাম চা পান সাঙ্গ হলে পথে বেরিয়ে একটু খুঁজে এম্পায়ারের চূড়া লক্ষ করে গিয়ে ওই বাড়ির একেবারে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখে আসব।

কিন্তু হোটেলের একতলায় পৌঁছে মনে হল, চা না হয় পরেই খাওয়া যাবে।

আজকে হাঁটতে যাওয়া মানে এম্পায়ারের চূড়া লক্ষ করে পায়ে পায়ে সে বাড়িটার সামনে চলে যাওয়া তারপর বাড়িটাকে একটু ঘুরে ফিরে দেখে চলে আসা। নিশ্চয়ই আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে না। তেমন তেষ্টা পেলে পথেই কোনও দোকানে চা জলখাবার যা পাই খেয়ে নেব।

সে দিনটা আগের দিনের মত ঘোলাটে ছিল না। আকাশ খুব পরিষ্কার না হলেও দূরের বাড়িগুলো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

ফুটপাথে নেমে এসে মুখ উঁচু করে, ঘাড় কাত করে জানলা দিয়ে দেখা বাড়ির চূড়ার উদ্দেশে তাকালাম। কিন্তু কিছুই নজরে এল না। সামনের বড় বড় বাড়ির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে এম্পায়ার স্টেট বিলডিং। রাজপথের সমতল থেকে সেই বিখ্যাত ভবনচূড়ার কোনও আভাসই পেলাম না।

আমি ওই ভাবেই আকাশের দিকে মুখ উঁচু করে ফুটপাথে ইতি-উতি এগোচ্ছিলাম, পিছোচ্ছিলাম। সারি সারি হর্ম্যমালার ফাঁকে ফোকরে কোথাও নজরে পড়ে কি না অভীষ্ট এম্পায়ার। তা এলে দিক স্থির করে সে দিকে রওনা হব।

কিন্তু তা আর করা হল না। হঠাৎ এক বিশাল ধাক্কায় আমি চার হাত ছিটকে পাশের একটা দেয়ালে গিয়ে পড়লাম।

কোনও রকমে ধাক্কা সামলে তাকিয়ে দেখি এক অতিকায় কৃষ্ণাঙ্গ যুবক। হাতে একতাড়া চিঠি নিয়ে দ্রুত ছুটছে। বোধহয় ডাক পিয়ন বা ক্যুরিয়ার সার্ভিসের লোক হবে। এই সাতসকালে চিঠি বিলি করতে বেরিয়েছে। সামান্য থেমে, একটু পিছন ফিরে আমাকে একটা সংক্ষিপ্ত 'সরি' বলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সত্যিই এই ঘটনায় তার কোনও দোষ নেই। আমি মাথা উঁচু করে আকাশ দেখছি আর সে নিজের কাজে দ্রুত ছুটছে। আমাকে তার চোখেই পড়েনি। আমারই খেয়াল করা উচিত ছিল।

আমি তাড়াতাড়ি গলির মুখে চৌমাথায় চলে গেলাম। ওইখানে মোড়ের মুখে আকাশটা একটু বেশি ফাঁকা পাওয়া যাবে। হয়তো ওখান থেকে এম্পায়ার শীর্ষ চোখে পড়বে।

মোড়ে পৌঁছে আবার ঘাড় কাত করে আকাশে খুঁজতে লাগলাম, এখান থেকে নিশ্চয় এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং নিশানা করা যাবে।

কিন্তু হা অদৃষ্ট, আবার এক বলশালী ধাক্কায় আমি ভূপাতিত হলাম। আবার আমার আক্রমণকারী সেই দ্রুতধাবমান কৃষ্ণাঙ্গ যুবক। এবার সে নিজেই আমাকে হাতে ধরে ফুটপাথ থেকে তুলল, তারপর আমার পিঠে একটা সস্নেহ চাপড় দিয়ে দুবার বলল, 'ফিচাপিলা, ফিচাপিলা'।

আসলে লোকটি আমার সমস্যাটা কিছু অনুমান করেছিল। সে বুঝেছিল আমি গহন পাড়াগাঁ থেকে এসেছি, সদ্য এসেছি, এত সব উঁচু বাড়ি জন্মেও দেখিনি তাই আকাশের দিকে মুখ তুলে হাঁ করে বাড়ি ঘর দেখছি।

কিন্তু 'ফিচাপিলা'র মানে আমি তখন ধরতে পারিনি। পরে আমার এক মার্কিন বান্ধবীকে এই ঘটনার কথা বলায় সে হেসে ফেলেছিল, সে বলেছিল যে ওই যুবকটি আমাকে যা বলেছিল সেটা আমার কানে 'ফিচাপিলা' শোনালেও সে আসলে পরামর্শ দিয়েছিল, 'ফেচ এ পিলো' যার সাদা কথায় অর্থ দাঁড়ায়, 'একটা বালিশ নিয়ে এসো'।

তার এই উপদেশের কারণ পরিষ্কার। মাথা উঁচু করে ঘাড়ে ব্যথা করে এই সব বড় বড় বাড়ি, উঁচু উঁচু প্রাসাদ আত্মহারা হয়ে কতক্ষণ দেখব, তার

চেয়ে যদি একটা বালিশ নিয়ে এসে ফুটপাথে শুয়ে পড়ি সেটাই ভালো। চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে প্রাণের সুখে যত ইচ্ছা প্রাসাদচূড়া দেখা যাবে, ঘাড়েও ব্যথা হবে না, ধাক্কা খেয়ে বারবার ছিটকে পড়তেও হবে না।

'ফিচাপিলা' আখ্যান লিখে ফেলার পর মনে হচ্ছে ওয়াশিংটনের অধ্যায়ে দু-চারটে প্রসঙ্গ বাদ পড়ে গেছে।

নিউ ইয়র্কের কথায় পুরোপুরি যাওয়ার আগে সেগুলো একটু সংক্ষিপ্ত করে বলে রাখি।

প্রথমে বলতে হয় জর্জ টাউনের কথা। ওয়াশিংটন থেকে চলে আসার আগের দিন শনিবার সকালে আমার এসকর্ট জিমসাহেব তাঁর গাড়িতে করে জর্জ টাউনে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁর এক বন্ধুর মদের ডিস্টিলারি আছে। মদ মানে সুরা। কোনও চড়া বা কড়া, তেমন উত্তেজক পানীয় নয়, নিতান্তই দ্রাক্ষাসুরা। আঙুরজাত নানা রকমের লাল-সাদা টক-মিষ্টি হালকা পানীয়, যার মধ্যে অ্যালকহল দশভাগের একভাগ মাত্র।

জিমসাহেবের বন্ধুর এই সুরা কারখানার মাহাত্ম্য হল এই যে, এখানে অতিথি অভ্যাগত বন্ধুবান্ধব এলে তাদের বিনি পয়সায় নানা রকমের মদিরা চাখতে দেওয়া হয়। জিমসাহেব বোধহয় ভেবেছিলেন এই গরিব ভারতীয় বিনি পয়সায় মদিরাপান করে খুব আহ্লাদিত হবে। কিন্তু সত্যি বলতে কি সকালে প্রায় খালি পেটে এই সব আশ্চর্য স্বাদের বিচিত্র তরল পদার্থ পেটে পড়ে নেশা তো হলই না, রীতিমত গা গোলাতে লাগল।

বাধ্য হয়ে জিমসাহেবকে বললাম, 'কোনও একটা খাবারের দোকানে চলো, খুব খিদে পেয়েছে।'

জিমসাহেব আমাকে কাছেই পটোম্যাক নদীর ধারে একটা জনবহুল রাস্তায় নিয়ে গেলেন। আশেপাশে বোধহয় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। পথে তরুণ-তরুণীর জটলা। রাস্তায় গাড়ির চেয়ে ফুটপাথে পথচারীর সংখ্যা বেশি, বোধহয় উইক এন্ড বলেই।

এখানে ট্রাফিকের একটা ভালো ব্যাপার দেখলাম। পথচারীদের রাস্তা অতিক্রম করার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে কিছুক্ষণ পরপরেই চারদিকের সমস্ত যানবাহন বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে, তখন একাধিক গাড়ি চলবে না, চাইলে রাস্তা কোনাকুনি পার হতেও কোনও আপত্তি নেই।

কলকাতায়, বিশেষ করে শেয়ালদা, বিবাদী বাগ, এসপ্লানেড এলাকায় এরকম একটা ব্যবস্থা অন্তত অফিস টাইমে চালু করলে বোধহয় ভালো হত; জীবন সংশয় করে রাস্তা পেরোনোর অনাবশ্যক উত্তেজনা থেকে বহু মানুষ রেহাই পেত।

জর্জ টাউন ওয়াশিংটন শহরেরই সহোদর, কলকাতার যেমন হাওড়া, সানফ্রানসিসকোর যেমন বার্কলে, পুরনো বন্দর শহর।

পটোম্যাকের প্রায় ধারেই একটা জমজমাট রেস্তোরাঁয় আমি আর জিমসাহেব

ঢুকলাম। হৈই হল্লা, কফির গন্ধ আর সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে ছুটির দিনের সকালে ছেলেমেয়েদের কোলাহল শুনে কলকাতার কফি হাউসের কথা মনে পড়ল।

আমি আর জিমসাহেব এক প্রান্তে বসে চিজ, পাঁউরুটি এই সব খাচ্ছিলাম এই সময় একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। হঠাৎ দোকানের কাউন্টার থেকে ম্যানেজার বা মালিক উঠে এসে একেবারে রেস্তোরাঁর মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সবাইকে থামতে বললেন, জানালেন যে একটা জরুরি ঘোষণা আছে। সবাই থেমে যেতে তিনি বললেন, 'এই মাত্র আমি একটা ফোন পেয়েছি। আমাকে জানানো হয়েছে যে আমার এই দোকান ঠিক কাঁটায় কাঁটায় এগারোটার সময় বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে। কে ফোন করেছে তা বলতে পারব না।'

রেস্তোরাঁর দেয়ালঘড়িতে তখন এগারোটা বাজতে আর তিন মিনিট। সচকিত প্রত্যেকেই তাদের হাতঘড়ির সঙ্গে সময়টা মিলিয়ে দেখল। সব চুপচাপ, তার আগে প্রায় অর্ধেক লোক হুটহাট করে বেরিয়ে গেল। শুধু একটি মেয়ে উঠে গিয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি পুলিশে ফোন করেছ?'

জিমসাহেব আমার কাছে জানতে চাইল, আমি ভয় পেয়েছি কি না, আমি বেরিয়ে রাস্তায় যেতে চাই কি না। আমি বললাম, 'দেখাই যাক না কি হয়?'

বলা বাহুল্য কিছুই হল না। খুব সম্ভব এটা একটা মোটা দাগের গিমিক। রেস্তোরাঁ থেকে দাম মিটিয়ে বেরোনোর মুখে কাউন্টারের ওপারে মালিককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার এখানে এ রকম বিস্ফোরক ফোন কি প্রায়ই আসে?' সে কিছু বলল না, গম্ভীর হয়ে মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল।

সেই দিনই বিকেলে জিমসাহেব আমাকে লিঙ্কন স্মৃতি ভবনে নিয়ে যায়। আঠারোশো পঁয়ষট্টি সালের চৌদ্দই এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে নটায় ওয়াশিংটনের ফোর্ড থিয়েটারে আব্রাহাম লিঙ্কন নাটক দেখার সময়ে আততায়ীর গুলিতে আহত হয়ে পরে মারা যান। হলভর্তি লোকের সামনে, স্ত্রীর পাশে বসে লিঙ্কন আক্রান্ত হয়েছিলেন। হত্যাকারী গুলি করার পরে স্টেজে লাফিয়ে উঠে পালিয়ে যায়। স্টেজে তখন রমরমা নাটক চলছিল।

এই ঘটনার কাছে পৃথিবীর সেরা রহস্যকাহিনীও হার মানে। এর পুরো ব্যাপারটা আনুপূর্বিক বর্ণিত ও রক্ষিত আছে স্মৃতি ভবনে। আমি সেখান থেকে লিঙ্কন হত্যার পরের দিনের সংস্করণ নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড পত্রিকার একটা প্রতিলিপি কিনেছিলাম এক ডলার ব্যয়ে, অবশ্য তার গায়ে দাম লেখা ছিল আঠারোশো পঁয়ষট্টির ফোর সেন্ট। হলদেটে কাগজে একেবারে হুবহু ছাপা সেই প্রতিলিপি।

অবশেষে ভয়েস অফ আমেরিকা। ভিজিটর এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে যাঁরা আসেন তাঁদের কর্তব্যকর্মের মধ্যে বোধহয় পড়ে ভয়েস অফ আমেরিকায় কিছু বলা, আমি অবশ্য কবিতা পড়েছিলাম। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, সে কবিতা কলকাতায় জানাশোনা নিজের লোকজন কেউ শোনেনি, তারা জানতই না।

তবে সুদূর টাঙ্গাইলে আমার বাবা তাঁর পুরনো বড় ব্যাটারিচালিত মরফি রেডিয়োতে সে কবিতা শুনেছিলেন এবং শুনে আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন আমেরিকায়।

যতদূর মনে পড়ে আগের দিনে শুক্রবার দুপুরে আমি বেতার কেন্দ্রে গিয়েছিলাম। ওখানেই ক্যাণ্টিনে মধ্যাহ্নভোজন সাঙ্গ করি বাংলাভাষা বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে। প্রায় সবাই বাংলাদেশি, একজন কলকাতার লোক ছিলেন, শ্রীযুক্ত প্রসূন মিত্র। অন্যদের নাম মনে নেই।

এখন ভয়েস অফ আমেরিকা বলতে আমরা কলকাতায় যেমন রমেন পাইনকে বুঝি, তখন প্রসূন মিত্রও তাই।

প্রসূনবাবু ভুক্তভোগী ভদ্রলোক। ভুক্তভোগী এই অর্থে যে তিনি একবার আমেরিকার পাট গুটিয়ে দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন বলে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু তখন থাকতে পারেননি। কলকাতার উত্তর শহরতলিতে ঘরবাড়ি করেছিলেন, সব ছেড়েছুড়ে আমেরিকায় ফিরে যান।

প্রসূনবাবু আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে প্রচুর আপ্যায়ন ও আড্ডা সহযোগে রাত্রিবাস করি। প্রসূনবাবু থাকতেন শহরের কিছু বাইরে আলেকজান্দ্রিয়া অঞ্চলে। সেখান থেকে পরের দিন সকালে অন্য এক ভদ্রলোক আমাকে হোটেলে পেঁছে দেন।

এই ভদ্রলোকের গাড়িতে আমি একটা নতুন জিনিস প্রথম দেখতে পাই। গাড়ির সামনের কাচের ওপরে ওয়াইপারের পাশে একটা নল দিয়ে গরমজল বেরিয়ে আসে। এই গরমজলের কাজ হল কাচের ওপরে বরফ পড়লে সেই বরফ গলিয়ে দেয়া, তারপর ওয়াইপার সেই জল মুছে দেবে। তুচ্ছ যান্ত্রিক ব্যাপার, কিন্তু আমি দেখে বেশ অবাকই হয়েছিলাম।

এর বেশ কয়েক মাস পরে এক প্রবল বৃষ্টির দিনে কলকাতায় ট্যাক্সিতে করে কোথায় যাচ্ছি। ট্যাক্সির কাচ জলে ঝাপসা হয়ে গেছে, ওয়াইপার একটাও নেই। আমি একথা বলতে ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাকে বললেন, 'ওয়াইপার থাকলেই বা কি সুবিধে হত দাদা, আমার মাইনাস আট পাওয়ার চশমা, সেটাই ভুল করে বাসায় ফেলে এসেছি।'

সতেরো

পূর্বী-কাহিনী

'পূর্বী নদী,
যন্ত্রণার ঝাপসা রাতে প্রগাঢ় শিরায় অন্তঃশীল
তুমি বও একধারা অশ্রুজল,
অনিদ্রার তলে তলে হাড়ে
অতলান্ত সমুদ্রের স্পর্শ আনো মোহানায়
ডুবে যাওয়া
মানহাটানের পাশে।'...

—অমিয় চক্রবর্তী

পূর্বী নদী মানে ইস্ট রিভার। এই ইস্ট রিভার আর হাডসন নদীর মধ্যে মানহাটান, বিশ্ববিশ্রুত মানহাটান। এই মানহাটানেই পৃথিবীর বৃহত্তম দৌলতখানা ফিফথ এভিনিউ, যার আশেপাশেই রয়েছে নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ, এম্পায়ার স্টেট বিলডিং, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার।

এই মানহাটানই হল নিউ ইয়র্কের প্রাণকেন্দ্র। সব অর্থেই। বিমান থেকে বিমা, হিরে থেকে জিরে, পৃথিবীর বৃহত্তম ব্যাঙ্ক, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সব কিছুর কলকাঠি নড়ছে মানহাটানের গলির সদর দফতরের বাড়ি থেকে।

আবার কুখ্যাত লিটল ইটালি, যা নাকি রক্ত হিম করা মাফিয়াদের হেড কোয়ার্টার, রহস্যময় চায়নাটাউন, এমনকি বহু বিতর্কিত গ্রিনিচ ভিলেজও মানহাটানের অন্তর্গত।

বিখ্যাত টাইম স্কোয়ার এবং ব্রডওয়ের থিয়েটার ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে এখানেই। ইউনাইটেড নেশনসের বাড়িও এখানে ওই পূর্বী নদীর কোল ঘেঁষে।

মানহাটানের গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণগুলির বিবরণ দিতে গেলে সে তালিকা অতি দীর্ঘ হয়ে যাবে। আমাদের এই ভ্রমণ কাহিনীর পক্ষে যে সংবাদটা প্রয়োজন সেটা হল এখানে মূল মানহাটানে, আমেরিকানরা যাকে বলে লোয়ার মানহাটান, নিউ ইয়র্কের স্বল্প প্রবাসকাল আমি সেখানেই অবস্থান করেছিলাম।

আবাসস্থলটির নাম ডোরালস্ ইন। ঠিকানা, ঊনপঞ্চাশ নম্বর রাস্তা ও লেক্সিংটন এভিনিউয়ের সংযোগস্থল। এবং এটাই ঠিকানা। বাড়ির কোনও নম্বর নেই, ডাকে চিঠি দিতে গেলে লিখতে হবে ফরটি নাইনথ অন লেক্সিংটন এভিনিউ।

মানহাটানের রাস্তাঘাটের কথা বলি। অতি ঘিঞ্জি পুরনো এলাকা, বড় বড় বাড়ি, ঝলমলে অফিস আর সম্ভারপূর্ণ দোকানে ভর্তি। সে তুলনায় রাস্তা খুবই কম। অধিকাংশ রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করানো চলে না, যেখানে দাঁড়

করানো যায়, সেখানেও পার্কিং ফি অবিশ্বাস্য রকম বেশি। যারা অন্য জায়গা থেকে এই এলাকায় আসে, সাধারণত এলাকার বাইরে গাড়ি রেখে আসে। এত বিভিন্ন রকম লোকজন, হইহল্লা, এমনকি ফেরিওলা, ভিখিরি, এর সঙ্গে যদি মোড়ে মোড়ে দুচারটে করে পানের দোকান আর রাস্তায় টুং-টুং মানুষটানা রিকশা থাকত তা হলে প্রায় আমাদের কলকাতাই হয়ে যেত। বৃষ্টি বাদলায়, তুষার ঝরার দিনে জলকাদায় রাস্তার চেহারাও তেমন ভালো দেখিনি।

মানহাটানের রাস্তাগুলোর অধিকাংশেরই কোনও নাম নেই। উত্তর-দক্ষিণে চওড়া রাস্তাগুলো এভিনিউ। পূর্বে প্রথম এভিনিউ থেকে দ্বাদশ এভিনিউ সবচেয়ে পশ্চিমে, হাডসন নদীর ধারে, সেটা এগিয়ে এলিভেটেড হাইওয়েতে গেছে।

আর পূব পশ্চিমের রাস্তাগুলো সব স্ট্রিট। স্ট্রিটের সংখ্যা মনে নেই, তবে সেণ্ট্রাল পার্ক পর্যন্ত একশো নম্বর স্ট্রিট কিংবা তার একটু বেশি। শুনেছিলাম স্ট্রিটের নম্বর আড়াইশো অতিক্রম করেছে। এই স্ট্রিটগুলোর বিষয়ে আরও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে। প্রত্যেকটা স্ট্রিটের দুটো ভাগ, ইস্ট এবং ওয়েস্ট। যেমন অ্যালেন গিনসবার্গ থাকেন ইস্ট দ্বাদশ স্ট্রিটে। স্ট্রিটের নাম শুনলেই বোধগম্য হয় সেটা কোথায়, কতদূরে এবং কোন দিকে।

আমার প্রাণের বান্ধবী শ্রীমতী ফে লেভিন থাকেন ইস্ট নাইনথ স্ট্রিটে। অর্থাৎ নয় নম্বর রাস্তার পূর্বাঞ্চলে। আমি উঠেছি উনপঞ্চাশ নম্বর রাস্তায়। তার মানে ফের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হলে আমাকে চল্লিশটা রাস্তা যেতে হবে। এক মোড় থেকে আরেক মোড় হল মার্কিনিদের কথায় একটা ব্লক, অর্থাৎ আমাকে চল্লিশটা ব্লক পেরোতে হবে। অবশ্য আমি যদি শ্রীমতীর অফিসে যাই, সেটা হল তেইশ নম্বর রাস্তায়, তাহলে আমাকে অনেক কম যেতে হবে।

শ্রীমতী ফে লেভিনের সঙ্গে আমার পরিচয় উনিশশো ছেষট্টি সালের বড় দিনের মরশুমে। সেটা বোধ হয় ছিল ক্রিস্টমাস ইভ অথবা ক্রিস্টমাস ইভের আগের দিন।

তখন আমি কাজ করি সেই সুপ্রাচীন আদিম অফিস ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ রেভিনিউয়ে, বাংলা নামান্তরে, পশ্চিমবঙ্গ রাজস্ব পর্ষদে। উচ্চবর্গীয় সহায়কের নিতান্তই যৎসামান্য চাকরি। সে বছরই প্রধান সহায়ক হয়েছি। থাকি আমাদের আদ্যিকালের কালীঘাটের ভাঙা বাড়িতে। সস্ত্রীক এবং সপুত্র, কৃত্তিবাসের বয়েস তখন একবছর, মিনতির বয়েস তখনও জানতাম না। এখনও জানি না।

সে যা হোক, আমার বিশেষ পুরনো সুহৃদ শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় দত্ত, কবি ও সাংবাদিক, চিরদিনই আমাকে মনোরম চমক দিতে ভালোবাসেন।

তা সেই বড়দিনমুখী কলকাতার নিরভিমান শীতের বিকেলে আমার ধূলিমলিন, প্রায়ান্ধকার অফিসকক্ষে চারজন তরুণ তরুণী সাহেব মেম নিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন। আমার অফিস ছিল রাইটার্স বিলডিংয়ের সবচেয়ে

পশ্চিম ব্লকে দোতলায় একটা বিশাল হলঘরে। যার দেয়াল থেকে কার্নিস পর্যন্ত উঠে গেছে নথির পর নথি, টেবিলে টেবিলে ফাইলের পাহাড়।

সাহেব-মেমদের বয়েস কুড়ি বাইশের মধ্যে, তিনজন সাহেব, একজন মেম। জ্যোতি তাদের আমার কাছে জিম্মা করে গেলেন, এদের কালীঘাট দেখাতে হবে আর আমার কালীঘাটে বাড়ি, এই সূত্রে।

জ্যোতির সে দিন বিকেলে কি একটা কাজ ছিল, একটু পরেই তিনি চলে গেলেন। তা ছাড়া চিরদিনই জ্যোতি খুব ব্যস্ত মানুষ, সব সময়েই কোনও একটা কাজ কিংবা পরিকল্পনা থাকে তাঁর, যেটা তখনই কার্যকর হতে হবে।

আমি জ্যোতির কাছে এবং সেই সঙ্গে আমাকে আজীবন প্রশ্রয়দাত্রী শ্রীমতী মীনাক্ষী দত্তের কাছে, ঋণী এই জন্য যে সারাজীবন জ্যোতিদের সূত্রে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় রয়েছে, তার মধ্যে যেমন এডওয়ার্ড ডিমকের অথবা ডেভিড ম্যাকাচ্চিনের মত বিদগ্ধ পণ্ডিত রয়েছেন, তেমনই দীপালি ও বি ডি নাগচৌধুরী কিংবা উমা ও অশীন দাশগুপ্তের মতো বিখ্যাত দম্পতি রয়েছেন, রয়েছেন রামপুরহাটের অখ্যাত বিদ্যালয়ের সমাজসেবী সহকারী শিক্ষক, শহরতলির ছন্নছাড়া কবি।

জ্যোতি চলে যাওয়ার একটু পর অফিস ছুটি হতেই আমি ওদের চারজনকে নিয়ে রাস্তায় বেরোলাম। তার আগে অবশ্য তারা মার্কিনি কৌতূহল নিয়ে আমার অফিস, কাজকর্ম অভিনিবেশ সহকারে এবং প্রশ্ন সহযোগে পর্যবেক্ষণ করেছে। দুয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে আলাপও করেছে।

এরই মধ্যে আমি একবার তাদের রাইটার্সের পিছনের দরজা দিয়ে লায়নস রেঞ্জে চা খাওয়াতে নিয়ে গেছি। এখানে বলে রাখা ভালো তখন রাইটার্সের পিছনের সমস্তগুলি দরজাই খুলে রাখা হত এবং রাইটার্স ছিল, সংরক্ষিত এলাকা বাদে, সম্পূর্ণই অবারিত দ্বার।

বলা বাহুল্য, লায়নস রেঞ্জে ফলমূল এবং খাবারদাবারের বাজার তখন এত বিস্তারিত ছিলো না। আর কলরবমুখরিত শেয়ার বাজারও সেদিন সম্ভবত বন্ধ ছিল। কিন্তু মনে আছে যে নড়বড়ে কাঠের বেঞ্চিতে বসে ভাঁড়ের পাত্রে আদাম্বিত চা খেয়ে তারা বেশ আমোদ পেয়েছিল।

কথায় কথায় চারজনের সঙ্গে পরিচয় হল। চারজনেই নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট, একই ক্লাসের। একই বছরের পুরনো সহপাঠী এরা। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র।

এরা চারজন হল 'বাগি সিপাহি', পলাতক সৈন্য। ভিয়েতনাম যুদ্ধের কলঙ্কিততম পর্যায় চলছে তখন, মার্কিন সরকার যুবক-যুবতীদের ড্রাফট করে অর্থাৎ জোর করে, বাধ্যতামূলক ভাবে সদ্যসাবালকদের ভিয়েতনামে যুদ্ধে ঠেলে দিচ্ছে। ছেলেরা সৈন্যবাহিনীতে, মেয়েদেরও রেহাই নেই অন্তত নার্সিং কোরে। যারা লেখাপড়া করছে তাদেরও স্নাতক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা, তারপর অবশ্যই যুদ্ধে পাঠানো হবে।

তখন ঘরেবাইরে আমেরিকান সরকারের ভিয়েতনাম নীতির বিরুদ্ধে

বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে উঠেছে। সেই সময়ে যুদ্ধে যাওয়া থেকে ছাড়া পেয়েছিল কিছু যুবকযুবতী তবে তার বিনিময়ে তাদের পিস কোরে বা শান্তিবাহিনীতে যেতে হবে। অনুন্নত দেশগুলোতে সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত নবীন-নবীনা মার্কিনিরা দলে দলে আসতে লাগল ভিয়েতনাম এড়িয়ে শান্তিবাহিনীতে নাম লিখে। কেউ পড়ায়, কেউ চিকিৎসা-শুশ্রূষা করে, কেউ সমাজসেবা করে। এদের নিয়ে তখন অনেক সন্দেহ, অনেক সংশয়। এরা কি জন্যে কি করছে। বোধগম্য হয় না।

সেদিন অপরাহ্ণে আমার চারজন সঙ্গীই পিস কোরের। ক্রমে ক্রমে তাদের পরিচয় পেলাম। এদের কথা এত করে বলছি এই জন্য যে পরবর্তী কালে এদের সঙ্গে আমার নিবিড় বন্ধুত্ব হয়েছিল এবং এখনও যোগাযোগ রয়ে গেছে। এবং এদের কারও সম্পর্কেই আমার মনে কোনও সন্দেহ-সংশয় নেই।

প্রথমজনা, শ্রীমতী ফে লেভিন, পরমা সুন্দরী, বিদুষী, বুদ্ধিমতী, সুলেখিকা। ফে নামের বানান এফ-এ-ওয়াই-ই আমি আমার বাঙ্গাল উচ্চারণে বলতাম ফেয়ি, তাই শুনে তার মার্কিন বান্ধবেরা হেসে ফেলত, কিন্তু কয়েকদিন পরে তারাও বলতে লাগল ফেয়ি।

ফে সে বছর আমেরিকায় ফিরে গিয়ে আমার সম্পর্কে একটি সপ্রশংস নিবন্ধ লিখেছিল 'আতলান্তিক মান্থলি'তে, সেই রচনার নাম ছিল 'নতুন কলকাতা' (দি নিউ ক্যালকাটা)। অনেক ভালো ভালো কথা সে রচনায় আমার বিষয়ে লেখা ছিল, আমার চরিত্র, আমার কবিত্ব, আমার মহত্ত্ব সম্পর্কে —তার এক-দশমাংশের যোগ্য আমি নেই। এর পরের ঘটনা আরও ভয়াবহ। সেই প্রবন্ধের সূত্র ধরে আমার দৈনন্দিন জীবনের ধারাবাহিক ছবি ছাপা হল বহুবিখ্যাত রঙিন বিদেশি সাপ্তাহিকে, সে বছরই আমার খোঁজ পড়ল বিদেশ যাওয়ার আমন্ত্রণে।

একাধিক কারণে সেবার আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যেতে যেতে আরও এগারো বছর কেটে গেল। কিন্তু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আমার বিদেশ ভ্রমণে ফে লেভিনের অবদান যথেষ্ট।

ফে গল্প-কবিতা লেখে। কিন্তু তাতে সে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। তবে যাকে আজকাল ইনভেস্টিগেটিভ জারনালিজম বলে, সেই তদন্তমূলক প্রতিবেদনে ফে সিদ্ধহস্তা। কৃষ্ণপূজারী আন্তর্জাতিক হরেকৃষ্ণ সংস্থা ইসকনে সে শাড়ি পরে তিলক কেটে পূজারিণী সেজে দীর্ঘদিন কাটিয়েছে এবং বেরিয়ে এসে বই লিখেছে, 'দি স্ট্রেঞ্জ ওয়ারলড অফ হরেকৃষ্ণ'। সে বইয়ে অনেক গোলমেলে এবং বিপজ্জনক তথ্য ছিল এবং নিশ্চয় বিক্রিও ভালো হয়েছিল। কারণ, এই কলকাতার ফুটপাথে বিবাদী বাগের পুরনো বইয়ের দোকানে সেই বইয়ের পেপারব্যাক সংস্করণ এই কিছুদিন আগেও আমার চোখে পড়েছে।

ফে লেভিনের আরেকটি মারাত্মক বই হল, 'দি কালচারাল ব্যারনস'। কৃষ্টি মোগলদের নিয়ে রচিত ওই বই। আমাদের দেশের মতই সব দেশেই কিছু তালেবর, নোংরা, অভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তি থাকেন কৃষ্টি-সংস্কৃতির পরিচালনার

চোরাকুঠিতে, তাঁরা প্যাঁচ করেন। একে ওঠান, ওকে বসান। তাঁরাই ঠিক করেন কে শিরোপা পাবে, কে পুরস্কার পাবে। বলা বাহুল্য, কোনও দিন কোনও ভদ্রলোক এ সব ব্যাপারে সহজে জড়িত হতে চান না। ফলে এ ধরনের লোকদের আরও সুবিধে হয়ে যায়। এঁরা যা ইচ্ছে তাই করেন। তবে ভালো কথা এই যে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির মূলস্রোত এদের পরোয়া করে না, সে তার আপনমনে নিজ পথে প্রবাহিত হয়ে যায়। কর্মকর্তারা যদি কখনও সেটা টের পান তখন আর বিশেষ কিছু করার থাকে না, সেই স্বচ্ছ স্রোত থেকে তারা তখন বহুদূরে, মধ্যে বিশাল বালির চড়া।

আঠারো

চমৎকার

…'চমৎকার !
ওই তো ফাঁকা জায়গা রয়েছে,
আলোজ্বলা বইয়ের দোকানের পাশে পার্ক,
যেখানে আমি পাব,
কলকাতা থেকে সদ্য আসা ডাক,
আর নতুন হারমোনিয়াম
যেখানে অপেক্ষায় রয়েছে
আমার নিউ ইয়র্কে ফিরে আসার জন্যে,
আমার গান আরম্ভ করার জন্যে।'

—অ্যালেন গিনসবার্গ

মার্কিন দেশেও সংস্কৃতি সাহিত্য নিয়ে নোংরা রাজনীতি কিছু কম নেই। তার 'কালচারাল ব্যারনস' বইয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির প্যাঁচবাজ পাণ্ডাদের মুখোশ ছিঁড়ে দিয়েছে ফে লেভিন। লিঙ্কন সেণ্টার থেকে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন পর্যন্ত জাঁদরেল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতরের চেহারা ফুটে উঠেছে এই বইয়ে।

ফে লেভিন ছাড়া সেদিন কালীঘাট-দর্শনার্থী ছিল আর তিনজন যুবক।

এর মধ্যে একজন হল ওয়ালাস শান। বন্ধুবান্ধব ডাকে ওয়ালি বলে।

ওয়ালি হল ওয়ালাস শান জুনিয়ার। তাঁর বাবা হলেন, 'নিউ ইয়র্কার' পত্রিকার প্রাক্তন বহুখ্যাত সম্পাদক ওই একই নামের সিনিয়ার ওয়ালাস শান।

ওয়ালির তখনকার একটা কার্ড আমার কাছে আজও আছে। সদ্য গ্র্যাজুয়েট ওয়ালাস শানের নামের পাশে লেখা আছে বি. এ., ফুলব্রাইট টিউটর ইন ইংলিশ, ইন্দোর ক্রিশ্চিয়ান কলেজ।

মনে পড়ছে, ফে লেভিনসহ বাকিরাও সে সময়ে মধ্যপ্রদেশে, রাজস্থানে বিভিন্ন কলেজে ইংরেজি পড়াচ্ছিল।

বাকিরা মানে একজন হল টম হায়েস। সে এখন নিউ ইয়র্কে ইংরেজির অধ্যাপক। অল্পস্বল্প খুচরো সাহিত্য করে। আমি চলে আসার পর নিউ ইয়র্কার পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন লিখেছিল, 'আওয়ার ফ্রেণ্ড ফ্রম ক্যালকাটা'। আমার সম্পর্কে অত সব ভালো ভালো কথা যে লেখা যায়, ওই রচনা পড়ার আগে তা জানতে পারিনি।

এই দলে চতুর্থজন যে ছিল তার কথা ভালো মনে পড়ছে না। বোধ হয় তার নাম ছিল রবার্ট। নিউ ইয়র্কে গিয়েও তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

তা, সেদিন বিকেলে, তখন পাঁচটায় অফিস ছুটি হত, শীতের ঘোর ঘোর

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, আমি এই চার মূর্তি ফে, ওয়ালি, টম এবং রবার্টকে নিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ার (তখন বিবাদী বাগ হয়নি) থেকে কালীঘাটের ট্রামে উঠলাম। টম বিশাল ঢ্যাঙা, রবার্ট মাঝারি উচ্চতার আর ওয়ালি অতিশয় বেঁটে সেই সঙ্গে পরমাসুন্দরী ফে এবং সেদিনের রোগা, হ্যাংলা আমি—বেশ বড় দল। তবে তখন পর্যন্ত বিকেলবেলায় অফিস ছুটির পরেও ট্রামে বসার জায়গা না হোক দাঁড়ানোর জায়গা পাওয়া যেত।

আমি ট্রামে উঠে ঠিক করলাম হাজরার মোড়ে নেমে আমাদের মহিম হালদার স্ট্রিটের বাড়িতে এদের একটু নিয়ে বসিয়ে তারপর মিনতিসহ কালীঘাট মন্দিরে যাব।

আমাদের সেই পুরনো কালীঘাট বাড়ি সম্পর্কে আমার দুর্বলতা অপরিসীম। বোধহয় সে বাড়ি থেকে অবশেষে বিতাড়িত হয়েছিলাম সেই জন্যই। সেই বাড়ির নম্বর ছিল বাইশ এক সি, আমি নিজেই যেন কোথায় লিখেছিলাম,

'ছি! ছি! ছি!
বাইশ এক সি
মহিমবাবুর গলি
কেমন করে, বলি!'

অবশেষে সেই বাইশ এক সি-তে সাহেব মেমদের নিয়ে প্রবেশ করলাম।

আমরা দোতলায় থাকতাম। এক তলায় রান্নার জায়গা, ভাঁড়ার।

সাহেব-মেমদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছিলাম তাদের খিদে পেয়েছে, তাই বাসায় তাদের খাওয়াতে নিয়ে এসেছিলাম।

খাওয়ানোর ফাঁকে চোরাগোপ্তা আমার র‍্যাডিস উইথ মোলাসেস অর্থাৎ মুলোগুড়ের গল্পটা বলে রাখি। সেই কতকাল আগে কাণ্ডজ্ঞানে লিখেছিলাম, সে কি আর এখন কারও মনে আছে?

গল্পটা খুবই গোলমেলে। কিন্তু সত্যি। সেজন্যে এখানে না লিখে উপায়ও নেই। আমি সেই সাহেব মেমদের নিয়ে সোজা দোতলায় উঠলাম। উঠে দেখি সব শুনশান, ফাঁকা। আমার ছোটভাই বিজন নিশ্চয় তাতাইকে নিয়ে কালীঘাট পার্কে বেড়াতে গেছে।

কিন্তু মিনতি?

প্রায়ান্ধকার ঘরে সুইচ জ্বালতে দেখলাম খাটের সীমান্তে মাথা পর্যন্ত লেপ মুড়ি দিয়ে তিনি শুয়ে আছেন।

তখন মনে পড়ল।

মিনতি আজ সকাল থেকে আমার ওপর খেপে আছে। আমি অবশ্য বিশেষ কোনও দোষ করিনি। সকালবেলা বাজার থেকে ফেরার পথে একটা ধবধবে সাদা বেড়ালছানা মাছের বাজার থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম তাতাইয়ের জন্যে।

ইতিমধ্যে আলো জ্বলতে খাটের নীচে থেকে সেই বেড়ালছানাটাও আমাদের দেখে বেরিয়ে এসে মিউ-মিউ করা শুরু করে দিয়েছে। সেই মিউ-মিউ আওয়াজ

শুনে মিনতি লেপের নীচে আরেকবার পাশ ফিরে শক্ত করে কান চেপে শুল।

বুঝতে পারলাম, মিনতির দিক থেকে সামান্যতম সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাকে তো অতিথি সৎকার করতে হবে।

গুটি গুটি একতলায় নেমে ভাঁড়ারঘরে ঢুকলাম, যদি সেখানে কিছু পাওয়া যায়। তার আগে সাহেব-মেমদের পাশের ঘরে বসিয়ে গেলাম।

নীচে ভাঁড়ারঘরে গিয়ে আলো জেবলে যা দেখলাম তা আমার জানাই ছিল, গরিব কেরানির মাসের শেষ, ভাঁড়ার শূন্য।

তবে ঘরের একপাশে দেখলাম একটা বড় মাটির হাঁড়ি। আমার দিদিমা কিছুদিন আগে দেশের বাড়ি থেকে ঝোলা গুড় পাঠিয়েছিলেন, উঁকি দিয়ে দেখলাম সেই গুড়ের যৎকিঞ্চিৎ তলানি লেগে আছে মাটির হাঁড়িটার গায়ে।

আর তা ছাড়া তখন নতুন মুলো উঠেছে বাজারে। আমি প্রতিদিন বাজার থেকে একজোড়া করে মোটা লাল মুলো নিয়ে আসি। কখনও তলিয়ে ভেবে দেখিনি এত মুলো কি হয়। কে খায়, কি কাজে লাগে।

ঝুড়ির ভেতরে দেখলাম গত আট-দশদিন ধরে যত মুলো এনেছি সবই তরকারির ঝুড়িতে পড়ে আছে।

এই সময়ে আমার উর্বর মাথায় একটা মূল্যবান বুদ্ধি খেলে গেল।

অবশ্য এর ফলে আমাকে একটু পরিশ্রম করতে হল। রান্নাঘরের মেঝেতে বসে তরকারি কাটা বঁটিটা ভালো করে ধুয়ে নিয়ে মুলোগুলো কুচিকুচি করে কাটলাম। তারপর সেই মুলোর টুকরোগুলো গুড়ের হাঁড়িতে ঢেলে খুব ভাল করে মাখলাম। যতদূর মনে পড়ে সুস্বাদু করার জন্য সেই মুলোগুড় মাখায় অল্প একটু নুন আর এক প্যাকেট শুকনো লঙ্কাগুঁড়ো মিশিয়ে ছিলাম।

এর পর বছর আড়াই আগে বিয়েতে উপহার পাওয়া এবং প্রায় অব্যবহৃত আনকোরা ডিনার সেট থেকে আঙুর গাছের নীল ছবি আঁকা চারটে সুদৃশ্য কোয়ার্টার প্লেট বার করে সেই মুলোগুড় সমান করে সাজিয়ে দোতলায় নিয়ে গেলাম। সঙ্গে কাঁটা-চামচে দিতেও ভুল করিনি।

একটা একটা করে প্লেট সাহেব-মেমদের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে জানালাম, 'র‍্যাডিশ উইথ মোলাসেস, এ বেঙ্গলি ডেলিকেসি।'

সেই বেঙ্গলি ডেলিকেসি সেদিন আমার মুখরক্ষা করেছিল। বারো বছর বাদে নিউ ইয়র্কে পেঁৗছে দেখলাম ফে, ওয়ালিরা সেই সুখাদ্যের কথা তখনও স্মরণে রেখেছে। সেদিনের মতই ওই এক যুগ পরেও সেই ঝাল-মিষ্টি বিচিত্র স্বাদের র‍্যাডিস উইথ মোলাসেসের প্রশংসায় তারা মুখর।

* * *

নিউ ইয়র্কে আমার আবাসস্থল মূল মানহাটানে ডোরালস ইনে পেঁৗছেছিলাম মধ্য বিকেলে। হোটেলের রিসেপশন সেণ্টারে গিয়ে নিজের নামধাম, আত্মপরিচয় দিতে টাকমাথা, ঈগলনাসা, কটা নয়ন, সরলবুদ্ধি পূর্ব ইউরোপীয় উদ্বাস্তু প্রৌঢ় ভদ্রলোক বিগলিত হয়ে গেলেন, মুখে বললেন, 'হে মহাকবি, সুস্বাগতম। আপনার পুণ্য পদধূলিস্পর্শে আজ এই সরাইখানা ধন্য হল।'

এ ধরনের উচ্ছ্বাস যে কোনও বুদ্ধিমান লোককেই বোকা বানাতে পারে আর আমি তো খ্যাতনামা নির্বোধ, আমার যে মাথা ঘুরে টলে পড়া উচিত।

কিন্তু ব্যাপারটা কি সেটা তো বুঝতে হবে।

অবশ্য আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভদ্রলোক আমার দিকে একতাড়া কাগজ ও খাম এগিয়ে দিলেন। তার মধ্যে একাধিক চিঠিও রয়েছে।

একটি চিঠি হল নিউ ইয়র্কের সরকারি রিসেপশন সেন্টারের জনৈকা শ্রীযুক্তা এলেনের কাছ থেকে। মহানগরী নিউ ইয়র্কের তরফ থেকে তিনি আমার মতো মহাকবিকে সুস্বাগতম জানিয়েছেন। এ ছাড়া সঙ্গে রয়েছে কিছু মুদ্রিত কাগজপত্র, বিজ্ঞাপন ও ক্যাটলগ। এর মধ্যে তিনটি সুমুদ্রিত পুস্তিকা আজও আমার ব্যাগে রয়ে গেছে।

একটি পুস্তিকা হল, 'শীতে নিউ ইয়র্ক'; প্রকাশক নিউ ইয়র্ক কনভেনশন অ্যান্ড ভিজিটরস বুরো। এই পুস্তিকায় ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এই তিন মাসের যাবতীয় থিয়েটার, নাচগান, খেলাধুলো, প্রদর্শনী সব কিছুর প্রোগ্রাম দেওয়া আছে। দ্রষ্টব্য এবং আকর্ষণীয় স্থানগুলির ঠিকানা, প্রবেশমূল্য, খোলাবন্ধের দিন ও সময় সব কিছুর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে, সঙ্গে চমৎকার সব ছবি।

আর অন্য দুটি প্রচারপত্রও হল নিউ ইয়র্ক পরিদর্শন সংক্রান্ত। একটি হল সচিত্র 'গ্রে লাইন'। এই কোম্পানি তাদের গাড়িতে করে পর্যটকদের বিভিন্ন জায়গা ঘুরিয়ে দেখায়। এদের টিকিটের দামের মধ্যেই রয়েছে দ্রষ্টব্য-স্থানের প্রবেশমূল্য এবং অন্যান্য খরচাদি।

এ ছাড়া তৃতীয়টিও নিউ ইয়র্ক ভ্রমণের আমন্ত্রণপত্র। সেটি একটু বিশেষ ধরনের আমন্ত্রণ। নিউ ইয়র্কের নৈশ প্রমোদের স্থানগুলি পরিদর্শনের বন্দোবস্ত এদের রয়েছে। টিকিটের চড়া দাম, তবে তার মধ্যে পান ভোজনও অন্তর্ভুক্ত করা আছে।

এই সব প্রচারপত্র ও চিঠি ছাড়াও সঙ্গে ছিল নিউ ইয়র্ক মহানগরীর রঙিন মানচিত্র, তদুপরি নিউ ইয়র্কের রাহাখরচ বাবদ সরকারি চেক।

কিন্তু এই সবই যথেষ্ট নয়। আমার বন্ধু নিউ ইয়র্কবাসী নাট্যকার ও অভিনেতা ওয়ালি শান মোটা পিচবোর্ড জাতীয় কাগজে রঙিন কালিতে ভাবাবেগে উজ্জ্বল একটি স্বাগতবার্তা রেখে গেছে। আমার আগমন সংবাদ আগের দিনই তার কাছে পৌঁছেছে এবং সে-ই সম্ভবত হোটেলের রিসেপশনকে বুঝিয়ে গেছে যে আমি একজন মহামানব।

আমি নিউ ইয়র্ক পৌঁছেছিলাম রবিবার। পরে জেনেছিলাম যে আগের দিন সন্ধ্যায় ব্রডওয়েতে তার নাটকের পালা শেষ হওয়ার পরে ওয়ালি সদলবলে এসে হোটেলের কাউন্টারে তালিম দিয়ে যায় আমাকে কি ভাবে অভ্যর্থনা জানাতে হবে।

নিউ ইয়র্কে পৌঁছে হোটেলের ঘরে সব জিনিসপত্র তুলে আমার প্রথম কাজ হল শ্রীমতী ফে লেভিনকে একটা ফোন করা। ছুটির দিন, সে নিজের

বাসায়ই ছিল, ফোন করতেই পেয়ে গেলাম।

আমার ফোন পেয়ে ফে খুবই আবেগভরে বলল যে, সে আমার ফোন আসবে এই আশাতেই বসে ছিল এবং যে কোনও মুহূর্তে আমি ফোন করতে পারি এই আশঙ্কায় সে বাড়ি ছেড়ে বেরোয়নি।

ফে আমার হোটেল থেকে দূরে হলেও খুব দূরে থাকে না। আধ ঘণ্টার মধ্যে সে চলে এল।

ফে লেভিনের বয়েস তখন ত্রিশ-বত্রিশ। আমি তাকে এর আগে শেষ দেখেছি কলকাতায়, তখন তার সদ্য একুশ বছর বয়েস।

এক যুগ পরে দেখা। দেখলাম, সে এখনও তেমনি তন্বী, ছিপছিপে রয়েছে। তেমনি সুন্দরী, মোহময়ী, উদাসীন, আবছা নীল চোখে সতত সঞ্চরমান মৃদু হাসির ছোঁয়া।

হোটেলের লাউঞ্জে বসে নানা কথা, বিশেষ করে কলকাতার কথা, স্মৃতি-বিনিময় হচ্ছিল। ফে বলছিল ইসকনে তার অভিজ্ঞতার কথা, নিউ ইয়র্কে তার চাকরির কথা। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কলকাতার কথা, মিনতির কথা, তাতাইয়ের কথা জানতে চাইল। আমার দাদার মাথা খারাপ হয়েছিল। কলকাতায় থাকতে ফে একবার দাদাকে আমার সঙ্গে নার্সিং হোমে দেখতে গিয়েছিল, নিতান্তই কৌতূহল এবং সৌজন্যবশত দাদার কথা জিজ্ঞাসা করে সে যখন জানল যে দাদা কিছুকাল আগে মারা গেছে, সে বেশ বিষণ্ণ হল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'চলো তোমার ঘরে যাই।'

বিষাদের ব্যাপারটা আমার ভালো লাগে না। আলোচনার মোড়টা ঘোরানোর জন্যেই লিফটে উঠে আমার চারতলার ঘরে যেতে যেতে বললাম, একটু হালকা হেসেই বললাম, 'হোটেলের নির্জন কক্ষে অনাত্মীয় পরপুরুষের সঙ্গে সুন্দরী যুবতীর প্রবেশ করাটা অশোভন হবে না তো?'

মৃদু হেসে ফে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক নয়।'

সত্যিই ফে লেভিনের সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক নয়। সে আমার জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধু, প্রাণসখী।

হোটেলের ঘরে ঢুকে গুছিয়ে বসে ফে কিন্তু একটু পরেই আবার দাদার মৃত্যুর কথায় ফিরে এল। দাদার কি হয়েছিল, মৃত্যুর সময়ে কত বয়েস হয়েছিল এই সব নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল।

কারণটা একটু পরে বুঝতে পারলাম যখন সে বলল তারও মধ্যে মাথা খারাপ হয়েছিল। পুরো মাথাখারাপ, যাকে বলে ধুমপাগল তা অবশ্য নয়, কিন্তু দীর্ঘ দু বছর তাকে মানসিক রোগের চিকিৎসা করাতে হয়েছে। এখনও মাসে দুবার মনঃসমীক্ষকের কাছে যেতে হয়।

সব শুনে আমি বললাম, 'কেন? কি হয় তোমার মনে?'

ফে হেসে বলল, 'সে সব খুব গোপন কথা। ডাক্তার ছাড়া আর কাউকে বলা যাবে না, তোমাকে তো নয়ই।'

আগেই বলেছি আমার দাদায় মাথাখারাপ ছিল। শুধু দাদা নয়, আমাদের

বংশে পাগলামির একটা ধারা পুরুষানুক্রমে ছিল। এমনকি অল্প বয়েসে আমার মধ্যেও অনেকে পাগল হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। স্কুলকলেজে সহপাঠীরা এবং কিছু কিছু গুণমুগ্ধ শিক্ষক মহোদয়ও আমাকে অতিশয় স্নেহভরে 'পাগলা' বলে ডাকতেন। দুঃখের বিষয় তাঁদের সে প্রত্যাশা সম্ভবত আমি পূরণ করতে পারিনি।

তবে আমি এও বুঝি যে আমার আচার আচরণে এমন একটা কিছু ব্যাপার আছে যা অনেক সময়ে মোটেই স্বাভাবিক পর্যায়ে পড়ে না সে জন্যে অনেকে বিনা কারণে আমাকে সমীহ করে।

সেই যে এক পাগল ছিল না, যে নিজের বাড়ির বারান্দায় বড় পিতলের গামলায় জল ভরে তার মধ্যে বড় হুইল ছিপ ফেলে গভীর অভিনিবেশ সহকারে মাছ ধরছিল। সেই লোকটাকে আমি চিনতাম।

একদিন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পাশের ফুটপাথ থেকে উঁকি দিয়ে বারান্দায় তাঁর মাছ ধরা দেখে স্বাভাবিক সৌজন্যবশত জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'স্যার মাছ কিছু কি ধরা পড়ল ?'

আমার প্রশ্ন শুনে লজ্জায় আপ্লুত হয়ে, লম্বা জিব কেটে মৎস্যশিকারি বললেন, 'কি বলছেন ভাই ? বারান্দায় গামলার জলে মাছ আসবে কোথা থেকে ?'

*　　　*　　　*

গল্পটা শুনে ফে কিন্তু মোটেই হাসল না, বলল, 'গল্পটা আমি জানি। অল্প দিন আগেই কোথায় যেন পড়েছি।'

কথায় কথায় চোখে পড়েছিল ফের ডানহাতের নাকি বাঁহাতের পাতায় পাশাপাশি একাধিক কলঙ্করেখা, বেড়ালে আঁচড়ালে যেমন হয় অনেকটা সেই রকম, তবে, তার থেকে অনেকটা চওড়া।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে ?'

ফে যা বলল তা বেশ জটিল। মানসিক অসুখের সময় সে নানারকম ওষুধ খেয়েছিল, কড়া কড়া বড় ডোজের ওষুধ। সেই ওষুধ খেয়ে তার সারা শরীরে র‍্যাশ বেরিয়েছিল, প্রথমে লালচে ছিল তারপরে কালো হয়ে মিলিয়ে যায়। এখন শুধু হাতের পাতায় এই তিনটে দাগ রয়ে গেছে, কিছুতেই মিলিয়ে যাচ্ছে না।

ফে বলল, তার ডাক্তার অবশ্য বলেছে যে ওষুধ খেয়ে এসব র‍্যাশ বেরোয়নি, মানসিক রোগের কারণেই র‍্যাশ বেরিয়েছে, ওগুলো মনের অসুখের বাহ্যিক প্রতিফলন। অধিকাংশ শারীরিক অসুখের জন্মই নাকি মনে।

সে যাই হোক অসুখের চিকিৎসা করাতে যতটা ওষুধ ফেকে খেতে হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ওষুধ খেয়েছে সে র‍্যাশ দূর করার জন্যে।

শীতে ঠোঁট ফাটবে এই আশঙ্কায় 'বঙ্গজীবনের অঙ্গ' খ্যাত একটি বহু-পরিচিত টিউব ক্রিম আমি সঙ্গে এনেছিলাম কলকাতা থেকে, সুটকেস থেকে সেই ক্রিমটা বের করে তর্জনী চূড়ায় লাগিয়ে ফের হাতের পাতায় বুলিয়ে দিলাম।

এবং কি আশ্চর্য, এর ঠিক দুদিন পরে ফের সঙ্গে আবার দেখা হতে সে তার হাতটা উলটে দেখাল, দাগগুলো প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এত ওষুধে, মার্কিন দেশের এত আধুনিক চিকিৎসায় যা সম্ভব হয়নি সামান্য বোরিক অ্যান্টিসেপটিক ক্রিমে তাই হল।

ফে আমাকে একটা মার্কিনি বহুমূল্য কোলড্ ক্রিমের সুদৃশ্য বোতল উপহার দিয়ে আমার তখনকার পাঁচ সিকে দামের ক্রিম টিউবটা নিয়ে নিল। পরে চিঠিতে জেনেছিলাম তার সেই কালো দাগগুলি সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে।

সেদিন বিকেলে হোটেলের ঘরে বসে এক কাপ করে চা খেয়ে তারপর ফে আমাকে নিয়ে নিউ ইয়র্ক দেখাতে বেরিয়েছিল।

কলকাতা আমার কাছে যত নিকট, ফের কাছে নিউ ইয়র্ক তার চেয়ে অনেক বেশি নিকট। আমি পনেরো বছর বয়েস থেকে কলকাতায় রয়েছি এখনও নারকেলডাঙা কিংবা কসবার মত কোনও কোনও প্রত্যন্ত অঞ্চল, এমনকি চেতলা, আহিরিটোলা পর্যন্ত আমার কাছে রীতিমত অচেনা।

ফে নিউ ইয়র্ক শহরেই জন্মেছে, সে ষোলো আনা নিউ ইয়র্কি এবং তার দাবি এই যে, নিউ ইয়র্ক শহর তার আগাগোড়া চেনা। সেটা পরীক্ষা করার ক্ষমতা আমার ছিল না, তবে আমি এটা বুঝতে পেরেছিলাম যে পুরো নিউ ইয়র্ক না হোক মানহাটান, অন্তত লোয়ার মানহাটান তার খুবই চেনা।

রবিবারের সন্ধ্যা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। আগের দুদিন অঝোরে তুষারপাত হয়েছে। রাস্তায় শক্ত হয়ে বরফ জমে রয়েছে, সেই বরফ পথচারীর পক্ষে অতি বিপজ্জনক, পাথরের মত শক্ত, শ্যাওলার চেয়ে পিচ্ছিল। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে হাঁটতে হয়। সেদিন সকালেই ওয়াশিংটনে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার।

সাধারণত চালু রাস্তায় লোক ও গাড়ি চলাচলের ফলে পায়ে পায়ে চাকায় চাকায় বরফ গলে পরিষ্কার হয়ে যায়। খুব বেশি বরফ পড়লে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নগর সংস্থা যন্ত্র গাড়ি দিয়ে পথ পরিষ্কার করে দেয় বরফ সরিয়ে। কিন্তু দেখেছি ফুটপাথের ধারে এবং অলিগলিতে বরফ জমাট হয়ে পড়ে থাকে। সকালবেলায় ওয়াশিংটনে ডু পণ্ট প্লাজার পিছনের রাস্তায় ব্রেকফাস্ট করার দোকানের সন্ধানে বেরিয়ে একটু অন্যমনস্ক অবস্থায় রাস্তায় চিৎপাত হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।

এখনকার এই ভারী শরীর হলে কি হত জানি না, তখন আমার শরীরের ওজন বর্তমানের তিন-চতুর্থাংশ। বিশেষ চোট কিছু লাগেনি। তবে চিত হয়ে পড়ায় ওভারকোটের দুটো বোতাম টান লেগে খুলে গিয়েছিল।

আমি ওভারকোট গায়ে দিয়ে বেরোনোর সময় ফে ওভারকোটের অবস্থা দেখে আমাকে বলল, 'বোতাম দুটো কোথায় ?'

আমি পকেট থেকে বের করে দেখালাম। আমার নিজের জিনিস নয়, সুপ্রিয়দার কোট, কলকাতায় গিয়ে ভালোভাবে ফেরত দিতে হবে, তাই পতনের অব্যবহিত পরেই বরফের ওপর থেকে ছেঁড়া বোতাম দুটো কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে

রেখে দিয়েছিলাম।

ফে বলল, আমরা হাঁটতে হাঁটতে তার অ্যাপার্টমেণ্ট পর্যন্ত যাব। নিউ ইয়র্ক শহর দেখতে দেখতে যাব আমি, আর দেখাতে দেখাতে যাবে সে। তারপর তার অ্যাপার্টমেণ্টে গিয়ে ছুঁচ সুতো দিয়ে আমার ছেঁড়া বোতাম দুটো সেলাই করে দেবে।

আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ফে শুনল না, তার বক্তব্য বোতাম ছেঁড়া বুক খোলা ওভারকোট গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরোনো উচিত হবে না।

আমি অবশ্য তাকে একবারও বললাম না যে, আমার সুটকেসের মধ্যে আরও একটা ওভারকোট রয়েছে।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে রাস্তা দিয়ে এগোতে লাগলাম। রবিবারের বিকেল, তাই বোধ হয় একটু ফাঁকা ফাঁকা। আমার হোটেল উনপঞ্চাশ নম্বর রাস্তায় আর ফে লেভিনের বাসস্থান নয় নম্বর রাস্তায়। উত্তর থেকে দক্ষিণে চল্লিশটা ব্লক যেতে হবে, দুমাইল আড়াইমাইল রাস্তা হবে।

ফে হাঁটতে ভালোবাসে। হাঁটতে আমিও কখনও ক্লান্তি বোধ করিনি। এক সময়ে কলকাতায় আমি আর আমার বন্ধু সুধেন্দু মল্লিক পায়ে হেঁটে ডালহৌসি থেকে বালিগঞ্জে অফিস থেকে ফেরার চেষ্টা করতাম। পরে পয়সার অভাবে সে চেষ্টা থেকে বিরত হই। হাঁটায় বাস এমনকি ট্যাক্সি ভাড়ার চেয়ে বেশি খরচ পড়ে যেত। হাঁটার পথে ডাব, কোকাকোলা, আলুকাবলি, তেলেভাজা ইত্যাদি খেতে খেতে ঘণ্টা আড়াই সময় ব্যয় করে যখন ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত কলেবরে বাড়ি ফিরতাম তখন পকেটের শেষ সম্বলও ব্যয় হয়ে গেছে।

সেদিন আমি ও ফে দুজনে ডোরালস ইনের বাঁদিকে একটু গিয়ে পরে ভুবনবিদিত পার্ক এভিনিউ ধরে যাত্রা শুরু করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একটু বৃষ্টি এসে যেতে একটা দোকানের নীচে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর ট্যাক্সি করে ফের বাড়িতে যাই।

ওটুকু বৃষ্টি উপেক্ষা করে আমরা হেঁটে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার হাতে গোটানো ছিল দুটো তুলোট কাগজে আঁকা ছবি, সে দুটো ভিজে যেত।

কলকাতা থেকে আসার সময় যেসব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিলাম বলে ইতিপূর্বে লিখেছি তার মধ্যে ছবির কথা বোধহয় বাদ পড়ে গিয়েছিল।

এখানে এখন ফে লেভিনের কথা লিখতে গিয়ে মনে মনে ফের অ্যাপার্টমেণ্টের দিকে রওনা হয়ে সে কথা মনে পড়ছে।

কয়েকটা তাতাইয়ের, মনে আমার ছেলে কৃত্তিবাসের হাতে আঁকা ছবি সঙ্গে এনেছিলাম, কলকাতা থেকে আসার সময় আমার বাক্সে। তখন তাতাইয়ের বয়েস বছর বারো। অল্প বয়সের কাঁচা ছবি। আপনজনেদের জন্যে এনেছিলাম।

হোটেলের ঘর থেকে বেরোনোর সময় সুটকেস খুলে ছবিগুলো ফেকে দেখিয়েছিলাম। তার মধ্যে দুটো ছবি ফে বেছে নিয়েছিল। বর্ষার দিনে

ধানক্ষেতে বৃষ্টি হচ্ছে। এই ছবিটার কথা মনে আছে। কালো মেঘ, ফিকে নীল আঁকাবাঁকা বৃষ্টির ধারা, তার নীচ সবুজ ধানক্ষেত।

বারো বছর পরে তাতাই গতবার নিউ ইয়র্কের পথে কলকাতায় আসার সময় ফের অ্যাপার্টমেণ্টে গিয়েছিল। সে দেখে এসেছে সেই অ্যাপার্টমেণ্টের বাইরের ঘরে তার বাল্যবয়েসের আঁকা দুটো ছবিই সুন্দর করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙানো রয়েছে।

আমি অ্যাপার্টমেণ্টে পৌঁছানোর পরে ওভারকোটটা খুলে দিতেই ফে দ্রুত ও নিপুণহস্তে বোতাম দুটো জুড়ে দিল।

কিন্তু বেশিক্ষণ বসা হল না। দূরদর্শনে শোনা গেল, আবহাওয়ার গতিক মোটেই সুবিধের নয়। অ্যাপার্টমেণ্টের কাচের জানলা দিয়ে বাইরে দেখলাম তুষারের ঢেউ উঠেছে।

ফে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলো, আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। সাংঘাতিক দুর্যোগ হবে মনে হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'একটা ট্যাক্সি পেলেই আমি যেতে পারব। তোমাকে যেতে হবে না। ফিরবে কি করে।'

নিউ ইয়র্কের রাস্তায় ট্যাক্সি ধরা কলকাতার মতই কিংবা কলকাতার চেয়েও কঠিন।

কিন্তু ভাগ্য ভালো। হয়তো বিদেশি দেখেই ট্যাক্সিওলা সদয় হয়েছিল। আমার সঙ্গে তার আটতলার অ্যাপার্টমেণ্ট থেকে ফে নিজেও নেমে এসেছিল। আমাকে স্বচ্ছন্দে ট্যাক্সি ধরতে দেখে সে ফিরে গেল।

যখন হোটেলের দরজায় পৌঁছলাম, জোর বরফ পড়ছে চারধারে। কোনও রকমে ট্যাক্সি থেকে নেমে এক ছুটে হোটেলের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লাম।

নিউ ইয়র্কে ট্যাক্সির একটা ব্যাপার দেখেছিলাম, সেটা এখানে বলি। ট্যাক্সির ড্রাইভারের জায়গাটা সম্পূর্ণ শক্ত করে ঘেরা। তার পাশের সিটটা খালি বটে সেখানে বসা যায়, কিন্তু সেই সিট থেকে কিংবা পিছনের সিট থেকে ড্রাইভারকে কব্জা করা কঠিন। কথাবার্তা বলা চলে, তবে ভাড়া লেনদেন করতে গেলে পোস্টাফিসের ঘুলঘুলির চেয়েও সংকীর্ণ একটা কোটর দিয়ে করতে হবে। বলাবাহুল্য ট্যাক্সিওলাদের ছিনতাইবাজদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যেই এই কৌশল। অনেক ঠেকে পুলিশকে এই বুদ্ধি করতে হয়েছে।

কলকাতার ট্যাক্সিওলারাও কম বিপদে নেই। প্রায় নিয়মিতই তারা রাহাজানির শিকার হয়ে খবরের কাগজের সংবাদ হয়। অনেকে খুনও হয়। তাদের নিরাপত্তার জন্যে নিউ ইয়র্কের মতো আলাদা খাঁচা করে দেয়া যায় কি না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারেন।

সে যা হোক হোটেলের ঘরে ঢুকে গলা থেকে মাফলার খুলতে গিয়ে দেখি সেটা গলায় নেই। নতুন ওভারকোট পরা অভ্যেস, সেটার পিঠ থেকে মাফলারটা পড়ে গেছে টেরই পাইনি।

ঠিক টের পাইনি তা অবশ্য নয়। ট্যাক্সি থেকে নামার সময় কাঁধের ওপর

থেকে কিছু একটা পড়ে গেল মনে হয়েছিল। দরজা দিয়ে ছুটে ঢুকতে গিয়ে আর খেয়াল করিনি।

তাড়াতাড়ি হোটেল থেকে বাইরে বেরিয়ে মাফলারটা কুড়িয়ে আনতে গেলাম কিন্তু তখন আর বাইরে বেরোনোর উপায় নেই। রীতিমত তুষারঝড় শুরু হয়ে গেছে।

পরের দিন সকালবেলায় খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে হেডিং দেখলাম।

'শতাব্দীর শীতলতম শীতঋতু'।

তার আগেই, মানে অবশ্য তখনই হোটেলে নিজের ঘরে ফিরে এসে ফে লেভিনের ফোন পেয়েছিলাম, 'প্রচণ্ড তুষার ঝঞ্ঝা শুরু হয়েছে, কোনও কারণেই বাইরে বেরোতে যেয়ো না।'

চমৎকার!

স্বপ্নসম নিউ ইয়র্ক নগরীর প্রমোদ পল্লীর কেন্দ্রস্থলে এসে অদ্য প্রথম রজনীতেই ঘরের মধ্যে আটকে গেলাম।

উনিশ

মাফলার

প্রথম কথা,
তুমি কি আমাদের মতো লোক ?
তোমার কি কাচের চোখ আছে,
বাঁধানো দাঁত, অথবা ক্রাচ,...

—সিলভিয়া প্লাথ

আমার মার্কিন সফরকালে বারংবার ঠিক সিলভিয়া প্লাথের মতো কবিতার ভাষায় না হলেও একই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি, 'তুমি কি আমাদের মতো লোক ?'

আমি তাদের মতো লোক কিনা সেটা নিঃসংশয় হওয়ার জন্যে একেকজন একেক রকম জিজ্ঞাসা করতেন। একজন পরম বিচক্ষণ ভদ্রলোক আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন আমার কয়টি বিবাহ। আরেকজন, তিনি বোধহয় সমাজ-সেবিকা, আমাকে একটি পার্টিতে পেয়ে একপাশে সঙ্গোপনে নিয়ে গিয়ে খোলাখুলি প্রশ্ন করেন আমি কোনও শিশুকন্যা হত্যা করেছি কি না এবং সেটা গলা টিপে নাকি আছড়ে।

আরেকজন পণ্ডিত ব্যক্তি তিনি তাঁর রিসার্চের কাজের সুবিধের জন্যে গরুপুজোর মন্ত্র জানতে চেয়েছিলেন। আমি তাঁকে ভালো করে বুঝিয়ে বলেছিলাম যে, 'রিসার্চ ব্যাপারটা হল গবেষণা, গো+এষণা হল গবেষণা, মানে গরু খোঁজা, তা আপনি যখন সেই গরুই খুঁজছেন মন্ত্রটা আপনাকে বলে দিচ্ছি', বলে কৈশোর স্মৃতির ব্যাকরণকৌমুদী থেকে গো শব্দের প্রথমা স্মরণ করলাম, সেই যে 'গৌঃ-গাবৌ-গাবঃ'।

সরলচিত্তে গবেষক সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এর মানে কি ?' তার আগে অবশ্য তাঁর নোটবইয়ে মন্ত্রটা তিনি টুকে নিয়েছিলেন, কিন্তু ইংরেজিতে গৌঃ লেখা চাট্টিখানি কথা নয়, জি-ও-ইউ না হয় হল, কিন্তু বিসর্গ ? অবশেষে আমার পরামর্শে তিনি বিসর্গের জোর বোঝাতে ইউয়ের শেষে আরেকটা ইউ, পর পর দুটো ইউ করে দিলেন।

তবে মানেটার ব্যাপারে তাঁকে আর ঠকালাম না, আসল মানে বলে দিলাম, 'গৌঃ-গাবৌ-গাবঃ' মানে হল, 'একটি গরু-দুটি গরু-অনেকগুলো গরু।'

শুনে পণ্ডিত মহোদয়ের কেমন যেন খটকা লেগেছিল। আবারও জানতে চেয়েছিলেন, 'কিন্তু এই মন্ত্রের মানে কি ?'

আমি বলেছিলাম, 'সাদা কথার মতো মন্ত্রের মানে করা যাবে না। তার কিছুটা বোঝা যাবে, আর কিছুটা হবে রহস্য। ইঙ্গিতবহ, রহস্যময় পংক্তি না হলে মন্ত্র হবে কি করে ?'

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যিনি আমার বিবাহসংখ্যা জানতে চেয়েছিলেন তাঁকে দুঃখ করে বলেছিলাম, 'বিয়ে তো অনেক করেছি, আপনাদের এলিজাবেথ টেলার মেমসাহেবের চেয়ে ঢের বেশি কিন্তু আমার অধিকাংশ স্ত্রীই পতিব্রতা নয়, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে এর মধ্যে একজন দুজনের বেশি সতী হতে চাইবে না।'

'সতী' শব্দটা শুনে প্রশ্নকারীর চোখ দুটো চকচক করে উঠল, মুখ দিয়ে বারবার বলতে লাগল, 'সাটি, সাটি', আমি হাত দিয়ে থামিয়ে বললাম, 'সাটি নয় সতী, আমার মৃত্যুর পরে আমার সঙ্গে মাত্র দুয়েকজন ছাড়া আমার বউয়েরা আর কেউ সহমরণে যাবে বলে আমার মনে বেশ সন্দেহ আছে। অর্থাৎ বড়জোর একজন কি দুজন সতী হবে।'

আর শিশুকন্যা হত্যার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেছিলাম, খুবই সংক্ষিপ্ত করে বলেছিলাম, 'কেটে খাই। অতি উপাদেয় তন্দুরি হয়,' এই বলে প্রশ্নকারিণীর গৃহের বিপরীত পার্কে প্যারাম্বুলেটরশায়িত শিশুদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম।

হয়তো বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।

হয়তো প্রশ্নোত্তর সত্যিসত্যিই এত নির্মম পর্যায়ে কখনও পৌঁছায়নি। কিন্তু একটা কথা এখানে পরিষ্কার করে বলে রাখি অধিকাংশ মার্কিনি, অধিকাংশ অর্থাৎ শতকরা নিরানব্বুইজন মার্কিনি আমাদের সম্পর্কে কিছুই, একেবারে কিছুই জানে না।

জাদু-ভেলকি, রোপট্রিক, সাপখেলা, বানর আর ভিখিরি ছাড়া ভারতবর্ষের কথা এদের জানা নেই। সেই ভারতে সতীদাহ হচ্ছে প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে, শিশুকন্যা হত্যা হচ্ছে ঘরে ঘরে, বছর বছর দুর্ভিক্ষে অনাহারে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে। বাঘের আর সাপের কামড়েও তাই। যারা একটু লেখাপড়া জানে, দেশ বিদেশের খবর রাখে, তারা অবশ্য তাজমহলের ছবি দেখলে চিনতে পারে। গান্ধীর নাম জানে। তবে গান্ধীকে নিয়েও সমস্যা আছে, রাজীব গান্ধী অবশ্য তখন পাদপ্রদীপের আলোকে আসেননি, অন্য দুই গান্ধী মহাত্মা ও ইন্দিরা এ নিয়ে খটকা অনেক, অনেক ভদ্রজনের মনে। দুজন আলাদা গান্ধী এটা বুঝতে না পারায় অনেককে দেখেছি রীতিমত খটকায়, গান্ধী স্ত্রী না পুরুষ, আটহাতি খাটো ধুতি পরা, টাক মাথা, গোলচশমা চোখে বৃদ্ধ মহাত্মা, নাকি এগারো হাতি শাড়ি পরা সপ্রতিভা ইন্দিরা।

মোটকথা, একজন সাধারণ শিক্ষিত মার্কিনের থেকে একজন সাধারণ শিক্ষিত ভারতীয় অনেক বেশি শিক্ষিত।

আরেকটা দুঃখের কথা, লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমল যে আমরা অনেককাল পার হয়ে এসেছি আমাদের মার্কিনমুখী পণ্ডিতেরা সেটা কৌশলে চেপে যান। আমাদের ক্লেদ, গ্লানি, দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অবিচার যা অল্পবিস্তর সব সমাজেই আছে এবং ছিল এবং হয়তো চিরকালই থাকবে সেই সব নিয়ে বিদেশি বাজারে এঁরা মেধা ও বিদ্যার বাণিজ্য করেন। জেট বিমানে পোর্ট-

ফোলিও ব্যাগে কনফারেন্স হলে বয়ে নিয়ে যান সতীদাহের চিতার অঙ্গার, কুষ্ঠরোগীর পুঁজরক্তমাখা ব্যান্ডেজ। এই ক্লেদবিলাসী, দারিদ্র্যবণিকদের ভারী রমরমা পশ্চিমের বাজারে।

ভ্রমণকাহিনী লিখতে বসে বারবার বড় বেশি অবান্তর কথায় চলে আসছি। কলম শত্রুতা করছে। হালকা, লঘুচাল আসছে না।

তবু স্বস্থানে ফিরে যাই।

সিলভিয়া প্লাথ বলেছিলেন, 'তুমি কি আমাদের মতো লোক?'

শতাব্দীর শীতলতম সপ্তাহে আমার কোটের ওপরে কোট, সোয়েটারের ওপর সোয়েটার পরিধান করা শরীর নিয়ে বারবার টের পেয়েছি আমাকে নিয়ে নিউ ইয়র্কবাসীদের কৌতূহলের অন্ত নেই।

ভিড়ের রাস্তাঘাটে, দোকানে, টিউব ট্রেনে মাঝে মধ্যেই টের পেয়েছি, আমার আশেপাশে কেউ না কেউ খুব সন্তর্পণে আমাকে আঙুল দিয়ে টিপে টিপে দেখছে। উদ্দেশ্যটা অবশ্য খুব খারাপ নয়, সে বুঝতে চাইছে বহিরাবরণ থেকে আমার দেহ কতটা দূরে, কতটা পুরু জামা কাপড় আমি পরেছি। খাঁটি নিউ ইয়র্কারদের দেখেছি প্রবল শীতেও একটা ফুলহাতা সোয়েটার, জ্যাকেট বা উইন্ডচিটার পরেই চালিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং তাদের কাছে আমার শীতবস্ত্রসম্ভার বিস্ময়কর মনে হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

নিউ ইয়র্ক পর্যায়ে এসে সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, খেই রাখতে পারছি না।

যা কিছু মনে পড়ছে, যা কাগজপত্র, চিঠি, ক্যাটালগ, বিজ্ঞাপন হাতের কাছে রয়েছে সব গুছিয়ে লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। কিন্তু সে অবকাশ কোথায়?

আগের দিন, মানে নিউ ইয়র্কের প্রথম দিন সন্ধ্যায় ফে লেভিনের বাসা থেকে ফেরার সময় তুষারঝড়ের মুখে ট্যাক্সি থেকে তাড়াতাড়ি নেমে হোটেলে ঢুকতে গিয়ে গলার মাফলার রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল।

তখন টের পাইনি। পরে ঘরে গিয়ে যখন বুঝতে পারি গলায় মাফলারটা জড়ানো নেই, ঠিক করলাম ঝড় কমলে মাফলারটা কুড়িয়ে নিয়ে আসব। এত বড় বড়লোকের শহর নিউ ইয়র্ক, এর রাজপথ থেকে কে আর এই গরিবের সামান্য মাফলারটা তুলে নেবে। তবে একটা আশঙ্কা মনে দেখা দিয়েছিল মাফলারটা বরফ চাপা যদি পড়ে যায় তা হলে নিশ্চয়ই বরফ গলার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু সেদিন রাতে আর ঝড় থামেনি। আতলান্তিক মহাসাগরের প্রাগৈতিহাসিক ঝঞ্ঝাবাতাস একেকদিন চূড়ান্ত আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে ম্যানহাটানের কোলে, গগনচুম্বী প্রাসাদচূড়ায় আঘাত হানে; উপরে ফেলে দিতে চায়, তুষারে ঢেকে দিতে চায় ভুঁইফোড় নিউ ইয়র্ক মহানগরীকে, অন্ধের মত খুঁজে বেড়ায় বহুদিন আগের এক হারিয়ে যাওয়া মহারণ্যকে।

সেদিন রাতে আর ঝড় থামেনি। হোটেলের বন্ধ কাচের জানালায় বারবার

তুষারঝড়ের করাঘাত শুনেছি।

পরের দিন সকালে ঝড় ছিল না। তবে বিস্তর বরফ জমে আছে রাস্তায়।

কিন্তু মাফলারটা চোখে পড়েনি। ভালো করে খুঁজেছি তাও নয়। এম্পায়ার স্টেট বিলডিং আবিষ্কারের উত্তেজনায় মাফলারটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

বেশি বেলার দিকে মাফলারটার কথা মনে পড়ল। তখন অবশ্য সেটা আর রাস্তায় পড়ে থাকার কথা নয়। রাস্তা সাফাইয়ের গাড়ি সেটাকে বরফসমেত সব কিছুর সঙ্গে তুলে নিয়ে গেছে।

এইবার খুবই চিন্তায় পড়লাম।

এই শীতে মাফলার ছাড়া চলবে কি করে? আমার এই কুখ্যাত কর্কশ কণ্ঠ, ঠাণ্ডা লেগে যদি সেটা ভেঙে যায় তা দিয়ে যে কি আশ্চর্য ধ্বনি বেরোবে, সেই ধ্বনি সহযোগে আমার বাঙাল ইংরেজি, সে যে নিউ ইয়র্কীয়দের কি পরিমাণ মোহিত করবে রীতিমত ভাবনা দেখা দিল।

অবশেষে স্থির করলাম অবশ্যই একটা মাফলার কিনতে হবে। কত আর দাম পড়বে, চার পাঁচ ডলার?

গল্পটা এই পর্যন্ত পড়ে যাঁদের একটু চেনা-চেনা মনে হচ্ছে, আরেকবার আমি তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। দয়া করে অনুমতি দিন, ঘটনাটা উপযুক্ত জায়গায় আরেকবার তা হলে বলি।

তবে এটাও বুঝতে পারছি, এই গল্পটা এই শেষবার লিখছি, এর পরে আর লেখা চলবে না, তা হলে পাঠকেরা লাঠিপেটা করবেন, পাঠিকারা ঝাঁটাপেটা করবেন এবং সম্পাদক মহোদয় আমার রচনা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দেবেন।

সুতরাং মাফলার কাহিনী এই শেষ সুযোগে একটু সবিস্তারে তারিয়ে তারিয়ে বলি। সবচেয়ে বড় কথা ভ্রমণকাহিনীর উপযুক্ত গল্প এটা।

সেই সোমবারের সকালে এম্পায়ার স্টেট বিলডিং পর্ব সমাপ্ত করে হোটেলে ফিরে ভালো করে গরম জলে স্নান করে বেরিয়ে পড়লাম মধ্যাহ্নভোজন সারতে। সেণ্ট্রাল হিটিংয়ের একটা সুবিধে হল, বাইরে যতই ঠাণ্ডা পড়ুক, বরফ পড়ুক, অন্দর মহলে ফিরে এসে শীতবোধ কিছু থাকে না, কলকাতায় এর অর্ধেক শীতেও আমি দিনের পর দিন স্নান করি না। কিন্তু এখানে কোনও অসুবিধে নেই। বরং স্নান করে আরাম লাগল।

মাফলার-বৃত্তান্তের প্রবেশপথে আমেরিকায় আমার একটা মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা সেরে নিচ্ছি। একেবারে শকিং এক্সপিরিয়েন্স যাকে বলে ঠিক তাই।

অভিজ্ঞতাটি হয়েছিল আমার ওই নিউ ইয়র্কের আবাসস্থল ডোরালস ইনেই। প্রথমবার ব্যাপারটা মোটেই বুঝতে পারিনি।

হোটেলে ফিরে ঘরে ঢোকার সময় দরজায় যেই চাবি লাগিয়েছি, সেই খণ্ডিত মুহূর্তে সমস্ত শরীরে একটা দারুণ ঝাঁকি লাগল, ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে পায়ের

চেটো আলোড়িত হয়ে গেল, চোখে অন্ধকার দেখলাম, আমি ভাবলাম হার্ট স্ট্রোক হল বুঝি। দীর্ঘ বিমানযাত্রা এবং প্রবাসের অনভ্যস্ত এবং অনিয়মিত জীবনে হৃদরোগের আক্রমণের মাত্রা একটু বেশি—আমি ভয় পেলাম এই বুঝি হারাতে যাচ্ছি।

কিন্তু তা কিছু হল না। কিছুক্ষণ বাদেই সম্বিত ফিরে পেলাম, কিন্তু কিসে কি হল, কিসের জন্যে এমন হল তা ধরতে পারলাম না। একটু পরে কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হয়ে ঘরে ঢুকে হোটেলের বিছানায় বসে ডাক্তার দেখাতে হবে ঠিক করলাম।

আমেরিকায় ডাক্তার ও চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কিন্তু আমার সঙ্গে ভিজিটর প্রোগ্রাম সার্ভিসের অনুগ্রহে পাওয়া চিকিৎসাব্যয়ের বাধ্যতা-মূলক বিমা রয়েছে। সাধারণ ডাক্তার বা চিকিৎসার ব্যয় মোটেই লাগবে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ডাক্তার দেখানোর হাঙ্গামা পোহাতে হয়নি। দ্বিতীয়বার ঘরে ঢুকবার সময়ই আমার ব্যামোটা আমি ধরে ফেলেছিলাম।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, একেবারে সাধারণ বিজ্ঞানের ব্যাপার, একটা বৈদ্যুতিক সমস্যা।

আমার পায়ে ছিল রবারসোলের জুতো। আবার আমার ওভারশু মানে গালোশটাও ছিল রবারের। হোটেলের সিঁড়ি আর বারান্দা ঢাকা ছিল উলের কার্পেটে। আমি যেই হেঁটে আসি কার্পেটের ওপর দিয়ে, কার্পেটের পশমে আর আমার জুতোর রবারে ঘর্ষণ লেগে তড়িৎতরঙ্গ উৎপন্ন হয়, কিন্তু তার কোনও কার্যকারিতা নেই। তবে যে মুহূর্তে আমি দরজার ধাতব তালায় ধাতব চাবি লাগাচ্ছি বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে আমি প্রচণ্ড শক খাচ্ছি। মারা যাওয়ার মত শক নয়, তবে মারা যাচ্ছি, মারা যেতে বসেছি এরকম ভাবার পক্ষে যথেষ্ট।

শুনেছি বৈজ্ঞানিকরা নাকি হালকা রচনা পড়তে খুব ভালোবাসেন। মহাজ্ঞানী চারলস ডারউইনের আত্মজীবনীতে পড়েছিলাম তিনি তরল রচনার অন্ধ ভক্ত ছিলেন, তিনি এমন কথাও বলেছিলেন যে বিয়োগান্ত দুঃখের গল্প-উপন্যাস রচনা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

সুতরাং আমি ভয়ে আছি। হয়তো বিজ্ঞানজানা কেউ কেউ এ লেখা পড়েন। হয়তো কোনও বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানমনস্ক পাঠক আমার এই অবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পাঠ করে বসবেন। এবং তারপরে হাসবেন। তা হাসুন।

সেদিন দুপুরে মধ্যাহ্নভোজনে বেরিয়ে গলির মোড়েই একটা ছোট খাবারের দোকান পেয়ে গেলাম। আমি সাধারণত আমার হোটেলে খেতাম না। তার একটা কারণ হল হোটেলের চেয়ে রাস্তার দোকানে দাম কম আর নিউ ইয়র্কের রাস্তায় কলকাতার মতই নানারকম দেশবিদেশের মুখরোচক খাবার পাওয়া যায়, সেখানে নানারকম আজব মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। পৃথিবীর সব শহরের সব বড় হোটেলের ডাইনিং রুমের খাদক-খাদিকা একই রকম, এমনকি খাদ্যতালিকা, পরিবেশ, বয়-বাবুর্চি-ওয়েট্রেস সে সবের চেহারাও একই রকম।

কিন্তু রাস্তার দোকানে বৈচিত্র্য রয়েছে। বিবাদিবাগের ঝালমুড়িওয়ালা আর মানহাটানের হ্যামবার্গারওয়ালা দুজনে দুই আলাদা চরিত্র, তাদের খাবারও তাই।

সে যা হোক, সেদিন দুপুরে পথের ধারের দোকানে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে লেক্সিংটন এভিনিউ দিয়ে একটু এগোতেই মোড়ের ওপাশে একটা জামাকাপড়ের দোকান দেখতে পেলাম। বেশ সাজানো গোছানো দোকান। কাচের সুদৃশ্য শোকেসে থরে থরে বস্ত্রসম্ভার সজ্জিত রয়েছে।

কাচের ভেতর থেকে একপাশে দেখতে পেলাম বেশ কয়েকটি সুদৃশ্য মাফলার শিকলের মত করে সাজানো রয়েছে। এর মধ্যে রামধনুর সাতরং খেলানো একটা গলবস্ত্র আমার বেশ পছন্দ হল।

দোকানে ঢুকে গেলাম। বেশ সাহসে ভর করেই। মার্কিন ভূমণ্ডলে এই আমার প্রথম সওদা, প্রথম বিপণিবিহার, অবশ্য খাওয়ার দোকান বাদ দিয়ে।

দোকানে ঢুকতেই সুহাসিনী, সুভাষিণী বিক্রয় বালিকা আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমি তাঁকে বললাম যে, আমি একটা মাফলার কিনতে এসেছি। বলে শোকেসের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালাম।

মেমসাহেব কেমন একটু হকচকিয়ে গেলেন আমার প্রার্থনা শুনে, তারপর একটু থমকে থেকে আমাকে আবার প্রশ্ন করলেন, 'কি চাই ?'

আমি আবার আঙুল দিয়ে শোকেসের দিকে দেখালাম এবং মুখে বললাম, 'মাফলার।'

মেমসাহেব প্রশ্নবোধক প্রতিধ্বনি করলেন, 'মাফলার ?'

আমি আবার জবাব দিলাম, 'মাফলার।'

এবার মেমসাহেব বেশ কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে আমার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করলেন, তারপর বললেন, 'কিন্তু আমাদের এ দোকানে তো মাফলার পাওয়া যাবে না, আপনি বরং উলটো দিকের ওই দোকানে যান।' এই বলে তিনি সামনের ফুটপাথে একটা বড় দোকান দেখিয়ে দিয়ে দ্রুত অন্য এক নতুন খদ্দেরের দিকে ধাবিত হলেন।

আমি আরেকবার শোকেসের মাফলার সমূহের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু সে সুযোগ পেলাম না।

তা ছাড়া আমার নিজেরও কেমন সন্দেহ হচ্ছিল, হয়তো এখানকার দোকানের কেনাকাটার রীতি আমি জানি না তাই ভুল করছি। হয়তো এ দোকানে মাফলার বিক্রি করে না, ওই সামনের দোকানের মাফলার এ দোকানের শোকেসে রাখা আছে তাই ওটা কিনতে হবে গিয়ে ওই দোকানে।

সাবধানে ওপারের ফুটপাথে গিয়ে সামনের দোকানের সাইন বোর্ডটা ভাল করে দেখলাম। ঘরের মধ্যেকার এবং শোকেসের জিনিসপত্র দেখে এটাকে মোটর পার্টসের দোকান বলে মনে হচ্ছে। সাইনবোর্ডেও লেখা আছে, 'উইলিয়াম, উইলিয়াম, উইলিয়াম অ্যান্ড উইলিয়াম অটোমোবিল স্টোরস।'

এই দোকানে মাফলার পাওয়া যাবে ? যথেষ্টই সংশয় হচ্ছিল, তবু আগের

মেয়েটির নির্দেশমত সেই দোকানে ঢুকে পড়লাম।

ঘরটি উইলিয়ামে উইলিয়ামে ভর্তি। সিনিয়ার উইলিয়াম, জুনিয়ার উইলিয়াম, গ্র্যানি উইলিয়াম, মাম্মি উইলিয়াম, এম এস উইলিয়াম, মিস উইলিয়াম। মোটাসোটা, লম্বা-চওড়া, বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা সকলের, খুব সম্ভব পুরনো ব্রিটিশ স্টক। বাড়িসুদ্ধ সবাই মিলে এক সঙ্গে দোকান চালায়। হয়তো ওপর তলাতেই থাকে।

আমি ঢুকতেই সবচেয়ে প্রবীণ এবং বলশালী উইলিয়াম আমার দিকে এগিয়ে এলেন, বললেন, 'কি চাই।'

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আপনাদের এখানে মাফলার পাওয়া যাবে ?'

আমার প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক যেন একটু আহত হলেন তারপর তাঁর বৃষস্কন্ধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'মাফলার পাওয়া যাবে না কেন ? এটা তো মাফলারেরই দোকান।' তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার গাড়িটা কোথায় ? কি রকম মাফলার লাগবে ?'

গাড়ির প্রশ্নে আমি বিচলিত বোধ করলাম, এ দোকানদার ভেবেছেন কি, আমি কি একগাড়ি মাফলার কিনব নাকি ? সুতরাং তাঁর সংশয় দূর করার জন্যে আমি বললাম, 'না, স্যার, আমার কোনও গাড়ি নেই। আমি মাত্র একটা মাফলার কিনতে এসেছি।'

ভদ্রলোক আমার কথা শুনে কেমন যেন ঘাবড়ে গেলেন, মুখে বললেন, 'তোমার কোন গাড়ি নেই ?'

আমি তখন খোলসা করে বললাম, 'না স্যার। আমি বিদেশি মানুষ নিউ ইয়র্ক শহরে আমি গাড়ি পাব কোথায় ? তা ছাড়া আমি গরিব ভারতীয়, দেশেও আমার কোনও গাড়ি নেই।'

আমার কাতরোক্তি শুনে প্রবীণ উইলিয়াম অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লেন। দোকান ভর্তি আত্মীয় পরিজনকে আমার চারপাশে ডেকে আনলেন তারপর সজোরে হাসতে হাসতে বললেন, 'লুক হিয়ার। হিয়ার ইজ এ ফানি গাই ফ্রম ইণ্ডিয়া। ভারতবর্ষ থেকে একজন মজার লোক এসেছে। এর কোনও গাড়ি নেই, কিন্তু এ একটা মাফলার কিনতে চায়।'

উইলিয়াম, উইলিয়াম, উইলিয়াম অ্যাণ্ড উইলিয়ামের পুরো পরিবার আমাকে ঘিরে হো হো করে হাসতে লাগল। আমি বহু কষ্টে তাদের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলাম।

পরে জেনেছিলাম আমেরিকায় মাফলার বলতে বোঝায় গাড়ির সাইলেন্সারকে। আমার গাড়ি নেই অথচ গাড়ির সাইলেন্সার কিনতে গেছি, তাই অত হাসাহাসি।

কুড়ি

শুধু কবিতার জন্যে

'আমাকে চিনতেন তিনি,
দেখা হতে বললেন, কে তুমি ?...
...আমি বললুম,
সেই বারুদ ঝড়ের দিনে একলা
ধানক্ষেতে যে সহাস্যে শুয়েছিল
রক্তমাখা মুখে
আমি তারই বিদেশি যমজ।
তাঁর কালো আলখাল্লায়
সোনালি রোদের বাঁকা সুতো
দাড়ির জঙ্গলে জ্বলে
শতাব্দী ছড়ানো দুই চোখ...
...বললেন, শোনো হে, তুমি,
ভাই-বন্ধু যে হোক সে হোক
বলো দেখি পিতা কে, মাতা কে'?

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতার কারণেই আমার এদেশে আসা। এবার একটু কবিতার কথা, কবির কথা বলব। কবি অ্যালেন গিনসবার্গ, পিটার অরলভস্কির কথা।

কিন্তু তার আগে গোলমালটা মিটিয়ে নিই। গোলমালের গল্পটা মনে আছে তো ?

সেই যে এক ব্যক্তি এক বারে গিয়ে বেয়ারাকে বলেছিল 'ভাই চট করে একটা ডাবল ব্রাণ্ডি দাও তো, গোলমালটা লাগার আগেই।'

বেয়ারা তাড়াতাড়ি একটা জোড়া ব্রাণ্ডি এনে দিতে তিনি কয়েক চুমুকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেটা নিঃশেষ করে দিয়ে আবার বেয়ারাকে বললেন, 'যাও তো ভাই জলদি আরেকটা ডাবল নিয়ে এসো। গোলমাল লাগল বলে, তাড়াতাড়ি করো।'

বিস্মিত বেয়ারা কিসের গোলমাল, কেন তাড়াতাড়ি কিছুই বুঝতে না পেরে দ্রুত আরেকটা ডাবল ব্রাণ্ডি নিয়ে এল। সেটিও দ্রুত নিঃশেষ হল।

এইবার ভদ্রলোক তৃতীয়বার গোলমাল লাগার আগে ডাবল ব্রাণ্ডির অর্ডার দিতে বেয়ারা আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার, বারবার আপনি গোলমাল লাগার কথা বলছেন, কিন্তু আমি যে বুঝতে পারছি না গোলমালটা কিসের ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'যাও তাড়াতাড়ি ডাবল ব্রাণ্ডিটা নিয়ে এসো, তারপর গোলমালটা কি বলছি।'

এবারও পানপাত্রটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ করে রুমালে মুখ মুছে ভদ্রলোক বেয়ারাকে বললেন, 'এইবার গোলমালটা লাগবে।'

বেয়ারা বলল, 'কিসের গোলমাল ? কেন লাগবে ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'গোলমাল লাগবে না ? এই এতগুলো ব্রাণ্ডি খেলাম, আর আমার কাছে একটাও পয়সা নেই, তুমিই গোলমাল বাধাবে।'

মার্কিন দেশে আমার গোলমাল অবশ্য অন্য জাতের ছিল। সেটা পানীয়ের গোলমাল নয়, ভাষার গোলমাল।

এবং সেই গোলমাল শুধু মাফলার-সাইলেন্সারে সীমাবদ্ধ ছিল না। আরও বহু দূর বিস্তৃত হয়েছিল। বিশেষ করে আমার খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে বেশ অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছিল।

তবে ভাষার গোলমাল বলাটা ঠিক হচ্ছে না। প্রথম প্রথম আমেরিকানদের গাঁক-গাঁক ইংরেজি বুঝতে একটু যে অসুবিধা হয়নি তা নয়, তবে ওরা কি বলছে, মোটামুটি সেটা ধরতে পারতাম।

আমার কথা ওরা পরিষ্কার বুঝতে পারত। যথাসাধ্য নেসফিল্ডসম্মত আমার মফস্বলি ইংরেজি, হয়তো আমার গোলমেলে কণ্ঠস্বর বা বাচনভঙ্গির জন্যেই ওরা আমার কথা শুনে বেশ আমোদ পেত।

ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন আমি কথা বলি অত্যন্ত দ্রুত লয়ে এবং আমার কণ্ঠস্বর সাদা বাংলায় যাকে বলে 'হেঁড়ে'। 'হেঁড়ে' শব্দটা এসেছে হাঁড়ি থেকে, হাঁড়ির মধ্যে থেকে যে রকম চোঙার মত গমগমে শব্দ বেরোয় আমার কণ্ঠস্বরও সেইরকম আর কি। সেই সঙ্গে আমি কথাও বলি খুব তাড়াতাড়ি, ফলে যুগ্ম পরিণাম খুব ভয়াবহ।

ইংরেজি ভাষাটা আমার তেমন সড়গড় না হলেও নিতান্তই অভ্যাশবসত আমি সেটাও আমার বাংলার মতই দ্রুততালে বলি। কিন্তু সাহেব-মেমদের খুব অসুবিধে হয়নি সেটা বুঝতে, এমনকি দুয়েকজন উপযাচক হয়ে আমার বাক্যবন্ধের প্রশংসা করেছেন, একাধিক ব্যক্তি আমার কাছে জানতে চেয়েছেন আমি এমন চমৎকার ইংরেজি ঠিক কোথায় শিখেছি।

ইংরেজি কেন, আমার বাংলার ব্যাপারেও সাহেবদের খুব উচ্চ ধারণা। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছেন এডওয়ার্ড ডিমক, প্রাচ্যভাষার খ্যাতনামা অধ্যাপক। বেশ কিছুকাল কলকাতায় ছিলেন, এই তো গত বছর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্বর্ধনা দিলেন।

তা সেই ডিমক সাহেবের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি বটে তবে একদা ভালই আলাপ-পরিচয় ছিল। কলকাতার বিদ্বজ্জন মহলে সেই সময় একথা প্রচলিত ছিল যে, ডিমক সাহেবের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষার মৌখিক পরীক্ষার শেষ ধাপে নাকি পরীক্ষার্থীদের বলা হত, কলকাতায় গিয়ে তারাপদ রায়ের সঙ্গে কথা বলে এসো, তার কথাবার্তা যদি হৃদয়ঙ্গম হয় তা হলেই পাশ, না হলে নয়।

ভাষা নিয়ে পাশ-ফেলের ব্যাপার নয়, আমি নিজে বেকুব বনেছিলাম দ্রব্যনাম নিয়ে। এবং আগেই বলেছি, সেটা শুধু সাইলেন্সার-মাফলার সমস্যায় সীমাবদ্ধ ছিল না। এখানে বলে রাখি আমরা যেমন মাফলারকে কম্ফোর্টারও বলি, আমেরিকানরা সাইলেন্সারকে মাফলারও বলে কম্ফোর্টারও বলে। এতদিন পরে সেই কথাই মনে পড়ছে।

সে যা হয় হল, দ্রব্যনামের সমস্যায় আমি প্রায় বেঘোরে মরতে বসেছিলাম, অনাহারে মরতে বসেছিলাম।

আমার আমেরিকা যাওয়ার সময়ে আমি ছিলাম বোর্ড অফ রেভিনিউয়ের লিয়াজোঁ অফিসার। যে পদের মূল কাজ ছিল কয়লাখনির কয়লা উৎপাদনের ওপরে রয়েলটি বা রাজস্ব আদায় করার চেষ্টা করা। খনিজ পরিভাষায় দ্রবীভূত কয়লা হল কোক, কোক গ্রেড ওয়ান, কোক গ্রেড টু, কোক গ্রেড থ্রি —গ্রেড অনুযায়ী রাজস্বের হার কমে বাড়ে।

কোকাকোলা সংস্কৃতির পীঠস্থান আমেরিকায় পৌঁছে জানলাম কোক মানে কয়লা নয়, কোক হল পানীয়, ওই কোকাকোলা।

মনে আছে দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে এদেশে কোকাকোলা প্রবেশের প্রথম যুগে কোকাকোলা ইংরেজি বানানে তিনটি সি অক্ষরের উপস্থিতি আমাদের মত অসাহেবদের, মানে যারা অভিধান সম্বল করে ইংরেজি শেখার চেষ্টা করেছি, বেশ সমস্যায় ফেলেছিল। চোচাচোলা থেকে চোকাচোলা, কোচাকোলা নানা-রকম উচ্চারণ আমাদের মাথায় খেলেছিল। এখন মার্কিন দেশে এসে দেখলাম কোকাকোলা কোক হয়ে গেছে, কোনও কোনও বোতলের গায়ে লেখাও রয়েছে সি-ও-কে-ই কোক।

কিন্তু কোক নয় বা কোনও পানীয় নয় আমার ঝামেলা হয়েছিল খাদ্যদ্রব্য নিয়ে।

এ বিষয়ে আমার ইংরেজি জ্ঞান কোনও কাজে লাগেনি। দেশে যা শিখেছিলাম এ দেশে এসে দেখলাম সব ওখানে অন্যরকম।

রেস্তোরাঁয় বসে পাশের টেবিলে দেখেছি মোটা মেমসাহেব চুকচুক করে ডাল খাচ্ছেন, সঙ্গে ডুমো ডুমো করে কাটা লোভনীয় আলুভাজা। আমারও খেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পরিবেশিকাকে বোঝাতে পারছি না।

পালস্ বললে আমেরিকানরা নাড়ি বোঝে কি না যাচাই করে দেখিনি কিন্তু ডাল বোঝে না। ডাল হল লেন্টিল, চিনেমাটির বাটিতে লেন্টিল সুপ।

আর আলুভাজা? সে আরও জটিল সমস্যা। পটাটো ফ্রাই বললে কেউ কিছু বুঝবে না। পটাটো চিপস্ বললে চিপস্ই আসবে। আলুভাজা নয়। বহু কসরতের পর বহু ঠেকে অবশেষে অবগত হয়েছিলাম যে, কোনও অজ্ঞাত কারণে খাদ্যদ্রব্যটির নাম ফ্রেঞ্চফ্রাই। অন্যথায় ফিঙ্গার চিপস বলেও চেষ্টা করেছি কিন্তু সাড়া পাইনি।

বেগুনেরও ওই একই অবস্থা। ছোটবেলায় পিকচার বুক পড়ে জেনেছিলাম

বেগন হল ইংরেজিতে ব্রিঞ্জল, কিন্তু আমেরিকান রেস্তোরাঁয় ব্রিঞ্জল শব্দ কেউ জানে না, এগ প্ল্যান্ট বলতে হবে।

ঠিক একইভাবে ফুলকপি মোটেই আমাদের চিরচেনা কলি-ফ্লাওয়ার নয়, চিকন-চিকন রোগা-রোগা সমস্বাদের সমগোত্রের তরকারির নাম ব্রকোলি।

এমনকি ফলের দোকানে স্পষ্ট দেখছি কমলালেবু, চাইছি অরেঞ্জ কিন্তু ফলের ব্যাপারি ভুরু কোঁচকাচ্ছে। পরে, অনেক পরে জেনেছিলাম ওই ফল অরেঞ্জ নয়, অরেঞ্জ বললে হবে না, বলতে হবে ট্যাঞ্জারিন (নাকি ট্যাঙ্গারিন ?)।

সুতরাং খাওয়া-দাওয়া নিয়ে দ্রব্যনাম সঠিক না বলতে পারায় আমি যে সেই প্রবাসে যথেষ্ট অসুবিধায় ছিলাম, সেটা আর ব্যাখ্যা করার বোধহয় প্রয়োজন নেই।

এবার কবির কথায় আসি।

কবির নাম বহুবিখ্যাত, বহু বিতর্কিত অ্যালেন গিনসবার্গ, বিট প্রজন্মের মহানায়ক।

অ্যালেন গিনসবার্গ এবং পিটার অরলভস্কি, এই উভপুরুষ কবি দম্পতি কলকাতায় এসেছিলেন উনিশশো বাষট্টি সালে, সেই সময়ই এঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল ওই বছর জুলাই মাসে জামসেদপুরে এক সাহিত্য সম্মেলনের সময়।

সাহিত্য সম্মেলনের শেষে আমরা সকলে মিলে চাইবাসায় কবি সমীর রায়চৌধুরির বাড়িতে যাই ; আমরা মানে, সুনীল, শক্তি, উৎপল, অ্যালেন, পিটার এবং আমি। তখনই আমাদের হৃদয় বিনিময় হয়। তারই ফসল ফলেছিল তখনকার কৃত্তিবাস পত্রিকার কবিতার পাতায় এবং অন্যত্র।

তখন আমাদের অল্প বয়েস, আমি সদ্য পঁচিশ অতিক্রান্ত, বন্ধুরাও আশেপাশে। অ্যালেন এবং পিটার উভয়েই অবশ্য আমাদের চেয়ে বড়। অ্যালেন গিনসবার্গের জন্মসন ১৯২৬, তার মানে আমাদের সঙ্গে এক দশকের ব্যবধান। পিটার বয়সে অ্যালেনের থেকে ছোট, তবে তার জন্ম তারিখটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

অ্যালেন গিনসবার্গ নোবেল প্রাইজ পাননি। হয়তো আর পাবেনও না। কিন্তু সাহিত্যের অনেক নোবেল লরিয়েটের চেয়ে তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব অনেক বেশি।

অ্যালেনের কবিতায় একটা হৃদয়-নিংড়ানো ব্যাপার আছে, একটা অসহনীয় আন্তরিকতা যা দেশকালের সীমা লঙ্ঘন করে পাঠককে আলোড়িত করে অথচ তাঁর কবিতার একটি পংক্তি, একটি অনুচ্ছেদ পাঠ করলেই বোঝা যায় যে একটি মার্কিন দেশজ কবিতা।

মার্কিন সমাজ, মার্কিন প্রতিষ্ঠান, সরকার সংবাদ মাধ্যম এমনকি হোয়াইট হাউস অ্যালেন গিনসবার্গকে সমীহ করে সমঝে চলে। গত চার দশক ধরে তিনি মার্কিন যুবমানসের প্রতিবাদের প্রতীক।

নাগরিক স্বাধীনতা, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ যুদ্ধ, পরমাণু বোমা, সি আই

এ এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকান সরকারের ভূমিকার বারবার অ্যালেন সরব প্রতিবাদ করেছেন। অ্যালেন গিনসবার্গ, তাঁর জীবনযাত্রা সন্ন্যাসীর মত এলোমেলো, কখনও কখনও নিশ্চয়ই অসামাজিক। কিন্তু অ্যালেন একজন চিরদিনের মুক্তিযোদ্ধা, চিরপ্রতিবাদের বাণীমূর্তি। শুধু আচার-আচরণে, কথাবার্তায়, সভায়, মিছিলে নয় তাঁর কবিতাতেও অবিশ্বাস্য দক্ষতায় সামাজিক ও ব্যক্তিগত বেদনা তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন।

অ্যালেন কিংবা পিটারের সম্পর্কে খুব বেশি লিখে লাভ নেই। কলকাতার কাগজপত্রে গত তিরিশ বছর ধরে অ্যালেন এবং বিট প্রজন্ম নিয়ে ভালো খারাপ নানা রকম লেখা হয়েছে। অ্যালেন পিটারের যা ধরন-ধারণ তাতে তাঁদের সম্পর্কে লোকের প্রতিক্রিয়া একটু প্রখর হওয়াই স্বাভাবিক।

সে যা হোক অ্যালেন গিনসবার্গের সঙ্গে নিউ ইয়র্কে আমি আসার আগেই যোগাযোগ করা হয়েছিল। এবং সেই অনুযায়ী একদিন দুপুরে তাঁর ওখানে যাওয়ার কথা স্থির হল। শুনে খুশি হলাম যে পিটার অরলভস্কিও এখন নিউ ইয়র্কে রয়েছেন, তিনিও একই ঠিকানায় রয়েছেন, ওই দিন দুপুরে তাঁর সঙ্গেও দেখা হবে।

অ্যালেন থাকেন লোয়ার মানহাটানে, বিশ্রুত গ্রিনিচ ভিলেজের পাশে, বোধহয় তাঁদের এলাকাটার নাম ইস্ট ভিলেজ। রাস্তার নম্বর হল টুয়েলভ, পূর্ব বারো।

ইস্ট ভিলেজ হল পুরনো নিউ ইয়র্ক, অনেকটা আমাদের ভবানীপুর বা শ্যামবাজারের মত। ছোটখাটো গলি, চার-পাঁচতলা পুরনো বাড়ি। ইস্ট ভিলেজে সম্ভবত বাড়ি ভাড়া তুলনামূলকভাবে কম। কিছু বিদেশি পরিবারও এ অঞ্চলে বসবাস করেন, তাঁদের মধ্যে ভারতীয় এবং বাংলাদেশিও রয়েছে।

মনে আছে এই পাড়াতেই একটা বাড়ির বাইরের দরজায় অপটু বাংলা হস্তাক্ষরে একটি নোটিস দেখে চমকিত ও পুলকিত হয়েছিলাম। নোটিসে লেখা, 'এখানে গরম ভাত ও গোস্ত পাওয়া যায়।'

গোস্ত মানে হিন্দি-উর্দুতে মাংস কিন্তু পূর্ববঙ্গে ছোটবেলায় দেখেছি গোস্ত বলতে বোঝাত গোরুর মাংস, রান্না অবস্থায় গোরুর মাংসের ঝোল। খাসির গোস্ত বা বকরির গোস্ত এরকম কথাও চলত, কিন্তু গোস্ত বলতে বোঝায় আদি ও অকৃত্রিম গোমাংস, হয়তো এই গো শব্দটি আছে বলেই।

নোটিস দেখে স্পষ্টই বুঝেছিলাম এটা কোনও বাংলাদেশি অধিবাসীর সাইড ইনকামের প্রয়াস, যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতির অভাবে হোটেল করতে পারছেন না, বাড়িতেই ভাতমাংস রান্না করে দরজায় কাগজের বিজ্ঞাপন লাগিয়ে একটু করে খাওয়ার চেষ্টা।

মাংস-ভাতের বিজ্ঞাপন দেখে আমারও বেশ লোভ হয়েছিল। এই সামান্য কয়েকদিনেই যেন মাংসভাতের ব্যাপারটা ভুলতে বসেছিলাম। হয়তো দরজা ঠেলে ঢুকেই যেতাম, কিন্তু আমার অ্যালেনের বাসায় যাওয়ার তাড়া ছিল, তা ছাড়া সেখানেই আমার মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ।

টেলিফোনে অ্যালেন বলে দিয়েছিলেন, তাঁর বাসার সদর দরজায় কলিংবেল নেই, একতলার দরজায় ধাক্কা দিলে বা কড়া নাড়ালেও শুনতে পাবেন না কারণ তাঁর অবস্থান চারতলায়, (নাকি তিনতলায় ?) ।

অ্যালেন নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর বাড়িতে পৌঁছে সদর দরজার উলটো দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অ্যালেন কিংবা পিটার পিটার বলে জানান দিতে ।

কয়েকদিন প্রবল ঝড়-তুষারের পর সেদিন দুপুরবেলায় হালকা রোদ্দুরের মুখ দেখেছিলাম । কিন্তু সে রোদ্দুরে কোনও তাপ নেই, প্রায় জ্যোৎস্নার মত শীতল সেই রোদ্দুর । সাহেবরা যাকে বলে বাসকিং, আমাদের রোদ-পোহানো ওই রোদ্দুরে হবে না ।

অ্যালেনের বাড়ি খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধা হয়নি । সাধারণ মধ্যবিত্ত পাড়া । অ্যালেনদের বাড়িটাও পুরনো, আমাদের কলকাতার যে কোনও পুরনো চার-পাঁচতলা বাড়ির মতো দেখতে । অ্যালেনরা অনেকদিন আছেন এখানে । এটা বিট প্রজন্মের লেখক-লেখিকা এবং অন্যদের প্রায় কমিউনের মতো । যে যখন ইচ্ছে আসছে যাচ্ছে, যা ইচ্ছে করছে । বরং অ্যালেনের নিজেরই একটানা বেশিদিন এখানে থাকা হয় না ।

নির্দেশানুসারে উলটো দিকের ফুটপাথে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতেই অ্যালেন চারতলার বারন্দায় বেরিয়ে এলেন । তারপর আমাকে ডান হাত তুলে অপেক্ষা করতে বলে কাউকে নীচে পাঠালেন । একটু পরে একটি গোলগাল হাসিখুশি মেম তরুণী এসে একতলার দরজা খুলল । পরে শুনেছিলাম মেয়েটি অ্যালেনের ভাইঝি বা ভাগনেয়ি ।

মার্জনাহীন পুরনো সিঁড়ি । বহুদিন চুনকামহীন দেওয়াল, একটু নড়বড়ে জানলা-দরজা । বাড়ির ভেতরটা ভালো করে দেখলাম, বাথরুম ইত্যাদিও ধোপদুরস্ত নয় ।

চারতলায় অ্যালেনের নিজস্ব আবাসস্থলে উঠে আসার পথে নির্বিকার কিছু যুবকযুবতীকে দেখলাম । দুজন ধোঁয়া টানছে, সম্ভবত গাঁজা । একদল বারান্দার কোনায় রান্না করছে । দুটি ছেলেমেয়ে খুব অন্তরঙ্গ হয়ে খুনসুটি ইত্যাদি করছে । এক প্রায় প্রৌঢ় ব্যক্তি মেঝেতে হামা দিয়ে বসে কি সব খুব মনোযোগ দিয়ে লিখছে ।

তবে অ্যালেনের ঘরে দেখলাম এরা বিশেষ কেউ প্রবেশ করে না । তাঁকে এরা যুথপতির মতো সমীহ করে । কিছুটা এড়িয়ে চলে ।

সেদিন অ্যালেনের বাড়িতে আমার সঙ্গে ভিজিটর প্রোগ্রাম সার্ভিসের সেই এসকর্ট জিম অস্টিন সাহেবও ছিলেন । তিনি আমার সঙ্গেই ওয়াশিংটন থেকে নিউ ইয়র্কে এসেছেন ।

অ্যালেন সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমাকে স্বাগত জানানোর জন্যে । সঙ্গে পিটারও রয়েছেন । সরল প্রকৃতির উদার হৃদয় পিটার অরলভস্কি আমাকে দেখে উচ্চগ্রামে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, আমার আশ্চর্য ইংরেজি ডাকনাম ধরে

'হ্যালো টর্পেডো', 'হ্যালো টর্পেডো', বেশ কয়েকবার বললেন।

কিন্তু মুশকিল হল জিম অস্টিনকে নিয়ে। অ্যালেন প্রথম থেকেই জিম-সাহেবকে ভালো চোখে দেখেননি। ওরকম ফিটফাট, চোস্ত লোক তাঁর খুব পছন্দসই নয়। তারপর যখন শুনলেন জিমসাহেব আমার এসকর্ট, ভিজিটর প্রোগ্রাম সার্ভিস থেকে বন্দোবস্ত হয়েছে এবং আমার সঙ্গে প্রথম থেকেই আছেন, অ্যালেন খুবই উত্তেজিত হয়ে গেলেন। তিনি জিমকে প্রায় বাড়ি থেকে বার করেই দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু যখন আমি বললাম যে জিমসাহেব খুব ভালোমানুষ, অ্যালেন অত চরম ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে আমাকে ঘরের মধ্যে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিম প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানতে চাইলেন।

অ্যালেন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই জিমসাহেব কি সব সময় তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকছে?'

আমি বললাম, 'সব সময়ে না হলেও প্রায় অনেক সময়েই।'

আমার কথা শুনে অ্যালেন স্টেট ডিপার্টমেণ্টের নাকি ভিজিটর প্রোগ্রাম সার্ভিসের কোন এক কেষ্টবিষ্টুকে তখনই ফোন করতে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে থামালাম।

অ্যালেন বললেন, 'তুমি জানো, লোকটা তোমাকে ওয়াচ করছে। তোমার সম্পর্কে, তুমি কোথায় যাচ্ছ কি করছ, কি বলছ সব রিপোর্ট করবে।'

আমি বললাম, 'তা বোধহয় নয়, আর তাই যদি হয়, আমার তাতে কি আসে যায়?'

যাই হোক অ্যালেন মনে মনে গজরাতে লাগলেন, জিমসাহেবও কেমন চুপসে গেলেন।

দুপুরের খাওয়াটা তেমন জমল না, জমায় কথাও নয়। অ্যালেন এবং পিটার সাহেবের মাথায় তখন ন্যাচারাল ফুডের বাতিক ঢুকেছে, জানি না সে বাতিক এখনও আছে কি না, কিন্তু বাতিকটা অতিথিদের পক্ষে বিপজ্জনক।

ন্যাচারাল ফুড, প্রাকৃতিক খাদ্য মানে হল তেল, মশলা, সম্ভব হলে নুন-মিষ্টি বর্জিত খাবার। ধান প্রভৃতি সিদ্ধ করে তার থেকে খোসা কচলিয়ে সরাসরি গলা ভাত, মধ্যে চাল পর্ব নেই, কারণ তাতে পুষ্টির খামতি হয়। কিছু ফলমূল, সেই সঙ্গে আধসেদ্ধ তরকারি। তা-ই অ্যালেন আর পিটার সোনা মুখ করে খেলেন।

বিব্রত হয়ে খাওয়ার সময় খাদ্যের চেহারা দেখে জিমসাহেব কিছু খেলেন না, মুখে বললেন, 'আমার খিদে নেই এইমাত্র খেয়ে এসেছি,' কিন্তু কথাটা সত্যি নয়।

আমাকে খুঁটে খুঁটে একটু খেতে হল, বলা উচিত খাওয়ার অভিনয় করতে হল।

অ্যালেন ব্যাপারটা টের পেয়েছিলেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তাকের ওপরে বইয়ের আড়াল থেকে একটা কাচের বোতল বার করে আনলেন, বললেন, 'এর

মধ্যে আমের আচার আছে। সে বছর বেনারসে বাঙালিটোলা থেকে কিনে এনেছিলাম।'

সে বছর মানে উনিশশো একাত্তর সাল, সাত বছর আগের কথা। পুরো বোতলের ভেতরটা ব্যাঙের ছাতার মতো সাদা হয়ে রয়েছে। তার মধ্যে চামচ গলিয়ে এক টুকরো আম আমার পাতে দিয়ে অ্যালেন স্নেহভরে বললেন, 'খেয়ে নাও। এ জিনিস কখনও আমেরিকায় পাবে না।' খেয়েছিলাম, শুধু কবিতার জন্যে সেই আচার খেয়েছিলাম।

একুশ

নিউ ইয়র্ক

'ইউরোপে আমার অনেক লোকের সঙ্গে
দেখা হয়েছিল, এমনকি আমার
নিজের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল।'

—জেমস বল্‌ডউইন

'ইউরোপে গিয়ে বল্‌ডউইন সাহেবের অনেক লোকের ভিড়ে নিজের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। আমার নিজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ভিড়ে ভরা নিউ ইয়র্কে।

আসলে কথাটা হয়তো ঠিক নয়। যত ভিড়ভাট্টাই থাক, নিজের সঙ্গে শুধু নির্জনতায় দেখা হয়, জনতার মধ্যে নয়। সেই যে 'একদিন উদাসীন' বাঙালি কবি লিখেছিলেন, 'পৃথিবী বান্ধবহীন, বিজনে নিজের সঙ্গে দেখা,' সেটাই সঠিক। তবে ভিড়ের ভিতরেই একটা নির্জনতা থাকে। কবিতার ভাষায় বলা যায় জনতার মধ্যে নির্জনতা। সেখানেও নিজের সঙ্গে দেখা হয়।

নিউ ইয়র্ক শহরে আমি যে খুব বেশি দিন ছিলাম তা নয়, এক সপ্তাহের এদিক-ওদিক সময় মাত্র। কিন্তু লিখতে বসে এত কথা মনে আসছে যে সব গুছিয়ে লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তা ছাড়া অন্যান্য শহরগুলো রয়েছে, সেগুলোর বিষয়েও কিছু কিছু লেখার আছে। এর মধ্যেই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছি।

সুতরাং নিউ ইয়র্ক পর্বটা দ্রুত গুটিয়ে ফেলতে চাই। এরপর আমাকে যেতে হবে কানাডা সীমান্তে তুষার রাজ্য বাটাভিয়ায়। সেখান থেকে দক্ষিণ উপকূল হয়ে পশ্চিম উপকূলে।

সঙ্গত কারণেই এই পর্বের নামকরণ করলাম 'নিউ ইয়র্ক'।

নিউ ইয়র্কে থাকাকালীন প্রায় প্রতিদিনই ফে লেভিনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ঝঞ্ঝাতাড়িত প্রথম দিনের সন্ধ্যা ছাড়াও ফে আমাকে আরেক দিন নিউ ইয়র্ক শহরে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল, বিখ্যাত বাড়িঘর, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, মণি-মাণিক্যের দোকান, পুরনো জিনিসপত্রের অ্যান্টিক বিপণি। এ সব দেখে অভিনব মনে হয়েছিল কিন্তু খুব একটা চমৎকৃত বা বিমোহিত বোধ করিনি।

তবে অ্যান্টিক বস্তুর দোকানে একটা শিবলিঙ্গ দেখে বেশ বিচলিত বোধ করেছিলাম। কালো কুচকুচে কষ্টিপাথরের দেবতা, অনেকটা আমাদের গ্রামের বাড়ির গৃহদেবতার মতো। কিন্তু সেই শিবলিঙ্গ তো তখনও ছিল আমাদের মন্দিরে, এখনও আছে, এবারও দেখে এসেছি।

হয়তো অন্য কারও গৃহদেবতা, কারা চুরি করে নিয়ে এসেছে সাত সমুদ্র তেরো নদীর এপারে এই ম্যাডিসন এভিনিউয়ের ভুবনবিদিত দোকানে। বীণাবাদিনী চতুর্ভুজা সরস্বতী, শ্বেত পাথরের অতিকায় গণেশ মূর্তি।

প্রলয়নাচন রত নটরাজ, সৌম্য প্রশান্ত বুদ্ধ—ভারতীয় উপমহাসাগরের গ্রামগঞ্জ, মন্দির, চৈত্য, বিহার থেকে গোপনে চোরাই পথে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।

এদিক-ওদিকে সাজানো, ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে সব ধাতুমূর্তি, পাথর প্রতিমা।

আমি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি নই। দিনান্তে কেন বৎসরান্তেও কোনও মন্দিরে যাওয়া হয় না। পুজো দেওয়া হয় না। কিন্তু আজ আমার গৃহদেবতার, বহুদূরে এক ছেড়ে আসা গ্রামের পুরনো মন্দিরের বাল্য স্মৃতি ফিরে এল। বেল-তুলসী-চন্দনের গন্ধ, ধূপের ধোঁয়া, শঙ্খের আওয়াজ ম্লেচ্ছ মহানগরীর মধ্যদুপুরকে আপ্লুত করে দিল।

ঠাকুর দেবতাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার কেমন মায়া হল। পাবনা, দিনাজপুর, বর্ধমানের কোন গ্রাম্য মন্দিরের ভাঙা বেদিতে, বেল-অশথ-আমগাছের ছায়ায় সহজিয়া নদীতীরের পৃথিবীতে এরা কতকাল ছিল, গৃহস্থের কত ভালোবাসা, কত বেদনা এদের অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো রয়েছে, সেই জগৎ থেকে এরা চিরকালের জন্যে নির্বাসিত হয়েছে। বহুকাল এদের স্নান খাওয়া হয়নি, পুজো প্রসাদ হয়নি; এখানে এই শীতনিয়ন্ত্রিত বন্ধ কাচের ঘরে বন্দি হয়ে রয়েছে।

ভক্ত নই। বোধহয় ঈশ্বরবিশ্বাসীও নই। তবু মায়াভরে দেবতাবিক্রির উপাখ্যান নিয়ে একটি পদ্যও রচনা করেছিলাম। দুঃখের বিষয় আমার অধিকাংশ লেখার মতো ওই কবিতাটিও বিশেষ উতরোয়নি।

একদিন গিয়েছিলাম ইলেকট্রো হারমনিক্স নামে এক হিজিবিজি আলোর কারখানায়। খোদ নিউ ইয়র্ক শহরের বুকে একটা ছোট গলির মধ্যে একটা লম্বা চওড়া পুরনো চার-পাঁচতলা বাড়ির কয়েকতলা জুড়ে সেই কারখানা।

খুবই ব্যস্ত এবং চালু প্রতিষ্ঠান সেটা। ফে কাজ করত এখানে, বেশ বড় কাজ, প্রেসিডেন্টের সহকারীর পদ। ভালো মাইনে পেত, সেই উনিশশো আটাত্তরেই দু'হাজার ডলার মাইনে ছিল।

এই ইলেকট্রো হারমনিক্সে শাড়ি পরা দুঃস্থ চেহারার কয়েকটি ভারতীয় মহিলাকেও কাজ করতে দেখেছি, সামান্য অদক্ষ শ্রমিকের কাজ।

ইলেকট্রো হারমনিক্স ছিল, হয়তো এখনও আছে, নিতান্তই অকাজের কারখানা। কোনও দরকারি প্রয়োজনীয় জিনিস এখানে তৈরি হতে দেখিনি। কাচের বাক্সে টুনি বাল্‌ব-জাতীয় ছোট ছোট নানা আকারের নানা রঙের আলো, জ্বলছে নিভছে একটা ছন্দ ধরে উঠছে, নামছে, বাঁয়ে ডাইনে বৃত্তাকারে ঘুরছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মাথা ঝিমঝিম করে। নেশা-নেশা ভাব আসে।

মনে পড়ছে ফে-র প্রেসিডেন্টের নাম ছিল মাইক। শক্তসমর্থ চেহারা। প্রবল শীতে একটা হাতকাটা সোয়েটার পরে ঘুরছে। সে-ই কোম্পানির

মালিক, ছোটখাটো কোম্পানি নয় অন্তত শ-খানেক লোক কাজ করে।

সামান্য আলাপে মাইককে আমার ভালই লেগেছিল। একটা গ্রাম্য, গোঁয়ার গোঁয়ার ভাব, একটু আত্মম্ভরিতাও আছে স্বভাবে। তা থাকতেই পারে, বয়েস ত্রিশ-বত্রিশের বেশি নয়। সে নিজের চেষ্টাতেই এই ব্যবসাটি দাঁড় করিয়েছে।

মাইকের অনুরোধে ফে আমাকে একটি ওই বিচিত্র আলোকযন্ত্র উপহার দিয়েছিল। খুবই চমকপ্রদ কলাকৌশল ছিল ওই যন্ত্রে, একটি নীল আলোর বিন্দু ওপরে উঠতে উঠতে বড় হচ্ছে তারপর সহসা লাল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে সহস্র ধারায় ছড়িয়ে পড়ছে। একটু পরেই সব আলো নিবে ঘন অন্ধকার। ক্রমশ আকাশের তারার মত বা খালি মাঠে জোনাকির মত ইতস্তত ছোট ছোট আলোকবিন্দু জ্বলছে, নিভছে।

নিতান্ত খেলনা ব্যাপার হলেও, জিনিসটার মধ্যে যে বৈদ্যুতিক মজা ছিল সেটা আকর্ষণীয় তবে একটু পরেই একঘেয়ে হয়ে যায়।

ওই আলোর খেলাযুক্ত কাচের বাক্সটি আমি খুশিমনেই গ্রহণ করেছিলাম। অনেক রকম জিনিস ছিল, একেকটার একেক কায়দা, একেক কলাকৌশল। অনেক বাছাই করে, কারিগরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সবচেয়ে ভালো যন্ত্রটাই ফে আমাকে দিয়েছিল।

কিন্তু তার পরিণাম মোটেই সুখের হয়নি। প্রথমত দেশে ফেরার পথে কাস্টমসের সাহেবেরা জিনিসটিকে সুনজরে দেখেননি।

এর রহস্যময়তা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, বোধহয় এ জিনিস তাঁরা বেশি দেখেননি, অন্তত তখন পর্যন্ত। সাংকেতিক বার্তাবহ কোনও আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাচক্রের রিসিভার বা ওই রকম অন্য কিছু যন্ত্র কি না তা নিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ ফিসফাস করলেন।

আমার কাগজপত্র দেখে এবং যন্ত্রটির কাগজের প্যাকেটের ওপর বিজ্ঞপ্তি ও বর্ণনা পাঠ করে অবশেষে তাঁরা এই জটিল চিন্তা থেকে নিরস্ত হলেন। কিন্তু উচ্চ মূল্য ধার্য করে চড়া হারে শুল্ক দাবি করলেন।

সে যা হোক, ওই যন্ত্রটি, যার নাম ছিল হেভেন অ্যান্ড হেল, কোনও রকমে শুল্কসাহেবদের কাছ থেকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে আসি। এবং সবচেয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে তখনই।

বাসায় এসে বাক্স-প্যাটরা খুলে সব জিনিসপত্র নামানো মাত্র, আমার ছোট ভাই বিজন ওই হেভেন অ্যান্ড হেলের প্লাগটি লাগিয়ে দেয় আমাদের পণ্ডিতিয়া বাড়ির বাইরের ঘরের সুইচ বোর্ডে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাড়ার আলোগুলো থির থির করে কেঁপে ওঠে, তীক্ষ্ণ হুইসিলের মত হুঁ-উ-স করে একটা শব্দ হয় এবং চারপাশের সমস্ত আলো নিভে যায়। পণ্ডিতিয়া অঞ্চলে সেই প্রথম লোডশেডিং। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির আবাস ছিল বলে কিংবা কী এক কারণে আমাদের এলাকায় লোডশেডিং হত না।

একদিন সন্ধেবেলা ফে-র মা আমাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি ক্লাবে।

ভদ্রমহিলা অধ্যাপিকা, নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। তবে তাঁর উপাধি ফে-র মতো লেভিন নয়। বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। এই দ্বিতীয় ভদ্রলোকও অধ্যাপক, তাঁর সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল।

এই নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি ক্লাবের চেহারা অনেকটা পুরনো আমলের সার্কিট হাউসের মতো। বড় করিডোর, হলঘর। বারান্দার দুইপ্রান্তে পুরুষ ও মহিলাদের টয়লেট।

এখানেই একটা আশ্চর্য খাদ্যদ্রব্য আমি খেয়েছিলাম। খাবারটার নাম ছিল এই জাতের। 'গ্রিন ওনিয়ন লিফ ইন মেপল সিরাপ' কিংবা এরই কাছাকাছি। এটাই ছিল সেদিনের স্পেশ্যাল আইটেম।

আমেরিকার নানান জায়গায় দেখেছি বহু হোটেল-রেস্টুরেন্ট-ক্লাবে সেদিনের স্পেশাল আইটেম বলে একটা চমকপ্রদ কিছু থাকে মেনুতে। সমুদ্রের কাছাকাছি সি ফুড রেস্তোরাঁগুলোয় থাকে 'টুডেস ক্যাচ' মানে আজকে সমুদ্র থেকে যা সদ্য ধরা হয়েছে তারই খাবার।

সে যা হোক ওই ইউনিভার্সিটি ক্লাবের টু-ডেস স্পেশাল আইটেমটার একটু বর্ণনা করি। এর মধ্যে একটু প্রকৃতির পরিহাস ছিল।

গ্রিন ওনিয়ন লিফ ইন মেপল সিরাপ আর কিছুই নয়, কচি সবুজ পেঁয়াজ কলির পাতা খেজুরের রস জাতীয় তরল পদার্থে চোবানো। শুনেছিলাম, বহুমূল্য খাদ্য এটি। ভেনেজুয়েলা না নিউজিল্যান্ডের ডেলিকেসি। ওই অখাদ্য পানসে কাঁচা পাতা চিবোতে চিবোতে বারবার আমার র‍্যাডিশ উইথ মোলাসেসের কথা মনে পড়ছিল। জেনেশুনে, বুঝেসুঝে ফে এই খাবারের অর্ডার দিয়েছিল কি না সে সংশয় কিন্তু আমার আজও যায়নি।

পুরো নিউ ইয়র্ক কাহিনী নয় শুধু ফে লেভিনের কথা লিখতে গেলেই লেখা ফুরোবে না।

একদিন ফে-র অ্যাপার্টমেণ্ট থেকে ফেরার পথে সে তার খাওয়ার টেবিলের ওপরের ফলপাত্র থেকে আমার হাতে একটা লেবু তুলে দেয়। কমলালেবু জাতীয়, কিন্তু কমলালেবু নয়। খোলা ছাড়িয়ে খাওয়া যায় না। ফালি দিয়ে কেটে চুষে খেতে হয়, অথবা রস করে খেতে হয়, অনেকটা আমাদের মৌসাম্বি বা সরবতি লেবুর মতো।

সেদিন গভীর মধ্যযামে আমার হোটেলের ঘরে একটা ফোন এসেছিল, ফে খোঁজ নিয়েছিল আমার কাছে কোনও ছুরি আছে কি না। না হলে আমি কী করে লেবুটা কেটে খাব। তারপর বলেছিল ছুরি না থাকলে পরদিন সকালে অফিস যাওয়ার পথে সে আমাকে একটা ছুরি দিয়ে যাবে; তার একাধিক ছুরি আছে।

ফে-কে কিন্তু আমার বলা হয়নি যে সন্ধ্যাবেলাতেই হোটেলের ঘরে ফিরবার পথে লাউঞ্জে একটা ফুটফুটে ফর্সা, গোলাপি ঠোঁট কিশোরীকে ওই লেবুটি উপহার দিয়েছিলাম, সে মিষ্টি হেসে বিনা বাক্যব্যয়ে ওই সোনালি

রঙের সুডৌল ফলটি আমার হাত থেকে নিয়েছিল। এর আগে কিংবা পরে ওই মেয়েটিকে আর চোখে পড়েনি। হোটেলের করিডোরে, লাউঞ্জের ভিড়ে অনেক খুঁজেছি তাকে।

ফে-র সেই ছুরিটি কিন্তু আজও আমার কাছে আছে ; শাণিত, উজ্জ্বল, এখনও ঝলমলে।

অনেক হল। ফে-র কথা আর নয়। বুদ্ধদেব বসুকে একটু ঘুরিয়ে স্মরণ করি ঃ

'হাজার ভয়, সংশয়ের
অন্ধ অজানাতে
আমি তাকে রেখে এলাম
ঈশ্বরের হাতে।'

অতঃপর ফে লেভিনের বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠী ওয়ালি শানের কথায় আসি।

নিউ ইয়র্ক শহরে দুটো নেমন্তন্ন খেয়েছিলাম ওয়ালির কল্যাণে।

আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, স্থূলকায়, লম্বোদর এবং খেতে ভালোবাসি। ভালো খাব বলে হাজারো কাজের চাপের মধ্যেও নিজের হাতে বেছে বেছে বাজার করি। কিন্তু তথাপি আমার পেটুক বা ঔদরিক বলে খ্যাতি বা কুখ্যাতি নেই।

ওই কথাগুলো আসছে এই সূত্রে যে বারবার আমি নেমন্তন্নের কথা তুলছি। তার একটা কারণ অবশ্য এই যে, নেমন্তন্নের কথাটা আমার বেশ মনে থাকে, খাওয়ার আগে এবং খাওয়ার পরেও। তা ছাড়া আমি নেমন্তন্ন খেতে ভালবাসি, এবং লোকে আমাকে কারণে-অকারণে নেমন্তন্ন করেও থাকে।

আগেই বলেছি ওয়ালি শান বা ওয়ালাস শান হল নিউ ইয়র্কার পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক ওয়াল্যাস শানের ছেলে। দুজনেই ওয়ালাস শান, সিনিয়র এবং জুনিয়র।

সিনিয়র ওয়ালাস কৃতবিদ্য ব্যক্তি, নিউ ইয়র্ক শহরের প্রধান নাগরিকদের একজন। সাংবাদিক জোনাথান শেল এবং লেখক বেদ মেহেতা তাঁর ওখানেই কাজ করেন, তখন করতেন।

নিউ ইয়র্ক শহরের গণ্যমান্য লোকেরা অধিকাংশই অভিজাত ইহুদি, ওয়ালাস শানও তাই। মার্কিন সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এঁদের প্রভাব অপরিসীম।

আমার বন্ধু ওয়ালি ভারতবর্ষ থেকে দেশে ফিরে তাঁর বাবা-মাকে আমাদের কথা, আমার কথা নিশ্চয় বিস্তর বলেছিল।

সিনিয়র শান তাঁর নিউ ইয়র্কের বাড়িতে আমার জন্যে একদিন পার্টি দিলেন। আমার হেন গৌণ চরিত্রের পক্ষে এটা বেশ বড় ব্যাপার।

ফে-র মতো ওয়ালিও আমাকে নিউ ইয়র্কে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল। মেসির সাতমহলা দোকান, ব্রডওয়ের থিয়েটার পাড়া, ওয়ারলড ট্রেড সেন্টারের হাডসন নদীর পারের জোড়া বাড়ির ছাদের রেস্তোরাঁ। এই ট্রেড সেন্টারেই

বোধহয় ওয়ালি আমাকে দেখিয়েছিল প্রবেশপথে পৃথিবীর আরও নানা ভাষার সঙ্গে বাংলাতেও নমস্কার না স্বাগতম কী যেন লেখা আছে। কিন্তু তখনই বুঝেছিলাম, বাংলা ভাষার, আমার মাতৃভাষার এই মর্যাদা সেটা কোনও ভারতীয় ভাষা বলে নয়, বাংলাদেশের জাতীয় ভাষা বলে। তবে সেটাও সুদূর প্রবাসে বঙ্গবাসীর পক্ষে কম গৌরবের নয়।

ওয়ালি আমাকে তাঁর বাবার কাগজ নিউ ইয়র্কারের অফিসেও নিয়ে গিয়েছিল। ওখানেই বেদ মেহেতা এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ হল। সিনিয়র শান পুত্রবন্ধুকে খুব খাতির করলেন। ছবির বই, কবিতার বই উপহার দিলেন। তদুপরি উইকএণ্ডে, শুক্রবার সায়াহ্নে তাঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন।

খুব এলাহি ব্যাপার সেটা ছিল না। কিন্তু সেই শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্ক শহরের অনেক এক নম্বর লোক সেই ভোজসভায় এসেছিল। তাঁদের সকলের নাম মনে নেই, যাঁদের নাম মনে পড়ছে সে সব লিখলে লোককে বিশ্বাস করানো কঠিন হবে।

ওয়ালির মার সঙ্গে পরিচয় হল। অতিশয় স্নেহশীলা সাধ্বী ইহুদিনি, তখন প্রৌঢ়া। ওয়ালিকে যে অনেকদিন আগে তার অল্প বয়েসে আমরা বন্ধুত্ব ও আতিথ্য দিয়েছিলাম, তার জন্যে মিসেস শান কৃতজ্ঞতা জানালেন। মিস্টার শান আমাকে একটা কবিতা পড়তে বললেন, আমার সঙ্গে কোনও কবিতা ছিল না, থাকার কথাও নয়। কিন্তু বেশি ঝুলোঝুলির মধ্যে না গিয়ে আমি এক টুকরো কাগজ চেয়ে নিয়ে অনেকদিন আগে আমার লেখা একটা পুরনো কবিতা, সেই যে কবিতাটায় বাবার রাঙা পিসেমশায়ের কথা ছিল, যিনি পাখির রঙিন পালক জমাতেন, আমার 'পাতা ও পাখিদের আলোচনা' নামক বিস্মৃত কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা, স্মরণ থেকে উদ্ধার করে প্রথমে বাংলায় লিখলাম। তারপরে যথাসাধ্য চেষ্টায় সম্ভবপর ইংরেজি তর্জমা বানালাম।

সে যে কী জিনিস হয়েছিল, একমাত্র ঈশ্বর এবং সেই রাতের নিমন্ত্রিতেরা জানেন। কিন্তু কী এক অজ্ঞাত কারণে জ্ঞানীগুণীরা প্রায় সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন, সেটাই নিউ ইয়র্কীয় সৌজন্য।

প্রচুর সুখাদ্য এবং মাত্রা-পরিমাণ পানীয় পরিবেশিত হয়েছিল সেই সন্ধ্যায়। নিউ ইয়র্কের জগৎবিশ্রুত তাজমহল হোটেল থেকে মহার্ঘ মোগলাই খানা আনা হয়েছিল, নিশ্চয়ই আমাকেই উপলক্ষ করে।

এই ভোজসভাকালেই একটা ঘটনা ঘটেছিল যেটা মনে পড়ছে। শান বাড়ির রান্নাঘরে ইলেকট্রিক শর্ট-সার্কিট হয়ে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠেছিল। ক্ষণিকের একটা বিদ্যুৎঝলক। বেশ পুরনো বাড়ি, ইলেকট্রিকের লাইনও অনেক কালের, সুতরাং ওরকম হতেই পারে।

নিউ ইয়র্কের মেয়র কিংবা অন্য কোনও কর্তাব্যক্তি সেদিন নিমন্ত্রিতের মধ্যে ছিলেন, তিনি দমকলে ফোন করেছিলেন। তড়িৎ গতিতে দমকলের গাড়ি এসে গেল। কিন্তু সেই গাড়ি থেকে যারা নামল, তাদের দেখে আমি অবাক।

দমকল কর্মীরা সবাই যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান, গাট্টাগোট্টা হাত-পা। কিন্তু তাদের সাজসজ্জা, অস্ত্রশস্ত্র দেখে সংয়ের পার্টি মনে হয়। যেন আমাদের দেশের যাত্রাদলের নাজির-উজির। রঙিন মধ্যযুগীয় পাইরেটের ইউনিফর্ম, চমকপ্রদ শিরোভূষণ, তদুপরি তাদের হাতে প্রাগৈতিহাসিক সব অস্ত্র। কুঠার-শাবল, গদা জাতীয় কাষ্ঠদণ্ড, এমনকি তীক্ষ্ণফলা ত্রিশূল।

অবশ্য পরে বুঝেছিলাম এই জামাকাপড়, শিরস্ত্রাণ, অস্ত্রশস্ত্রাদি সবই আগুন নেবানোর বাস্তব প্রয়োজনে, সঙ্গে অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জামও অবশ্যই রয়েছে।

একটু পরেই দমকলের লোকেরা চলে গেল। রান্নাঘরে তার সারাই হয়ে গেল। আবার ভোজসভা জমে উঠল।

মধ্যে থেকে আমার একটা নতুন মজার অভিজ্ঞতা হল।

ওয়ালি আমাকে হোটেল থেকে তাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। সে-ই আমাকে পৌঁছে দেবে। সে অবশ্য এ বাড়িতে থাকে না। সে আর তার সহবাসিনী দেবী আইজেনবার্গ কিছু দূরে একটা ঘর ভাড়া করে থাকে।

ভোজসভার শেষে সবাই একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমি আর ওয়ালি সবচেয়ে পরে বেরোলাম।

বেরোনোর মুখে আমি স্বাভাবিক ভদ্রতাবশত ওয়ালির বাবা-মাকে ধন্যবাদ জানালাম এবং বললাম, 'আপনারা একবার কলকাতায় আসুন।'

আমার আমন্ত্রণ পেয়ে শানদম্পতি কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গেলেন, মুখে বললেন, 'কী করে যাব ? আমরা তো নিউ ইয়র্কের বাইরে কোনও দিন কোথাও যাই না, যেতে পারি না।'

রাস্তায় নেমে এসে ওয়ালিকে বললাম, 'কী ব্যাপার ? তোমার মা-বাবা নিউ ইয়র্কে গৃহবন্দি কেন ?'

ওয়ালি বলল, 'কোনও রাজনৈতিক কারণে নয়। নিতান্তই পারিবারিক কারণ। আমার এক বোন আছে, মানসিক প্রতিবন্ধী, এই বাড়িতেই আছে। আজকে তাকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে আলাদা করে রেখে দেয়া হয়েছিল। আমার মা-বাবা তাকে ফেলে কোথাও যেতে পারে না। দুজনে একসঙ্গে কোনও পার্টিতে পর্যন্ত বেরোয় না।'

বাইশ

পুনশ্চ নিউ ইয়র্ক

…'এত ভিড় কিলবিল ক্ষুধাভয় অন্ধতা তাড়িত
এত গোল দিশাহারা ধূলি ধূম্র আকাশ বধির
জর্জর হৃদয় তবু কি বিশ্বাসে সব কিছু সয়
হিজিবিজি এ প্রলাপ এরও হবে প্রাঞ্জল অন্বয়।'…

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

কলকাতায় যখন ওয়ালি শান অথবা ফে লেভিনকে দেখি, দুজনকে সদা সর্বদাই এক সঙ্গে দেখেছি। খুবই ঘনিষ্ঠ তখন দুজনে। অবশ্য একসঙ্গে থাকেনি; ফে উঠেছিল মিডলটনে ওয়াই ডাবলু সি এ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থার মহিলাসদনে, আর ওয়ালি ছিল ফ্রি-স্কুল স্ট্রিট এলাকার একটি সাধারণ ট্যাস হোটেলে।

ওয়ালি এবং ফেকে আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা বলেই জেনেছিলাম। এও ভেবেছিলাম যে ভবিষ্যতে নিশ্চয় ওরা পরিণয়পাশে আবদ্ধ হবে।

জুটি হিসেবেও দুজনায় ছিল চমৎকার। দুজনাই নিউ ইয়র্কীয়, ইহুদি বংশজাত উদ্বাস্তু পরিবারের। সহপাঠী, সহমর্মী। শিল্প এবং সাহিত্যের জন্যে দুজনারই আন্তরিক ভালোবাসা রয়েছে।

কিন্তু বিয়ে ব্যাপারটা অত সোজা নয়। তাছাড়া মার্কিনদের বিয়ে তার কোনও মাথামুণ্ডু নেই। কেন যে বিয়ে হয়, একদিনের পরিচয়ে, প্লেনে বা ট্রেনে পাশে বসে আলাপে—কেন যে বিয়ে ভাঙে, একজনের ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠবার জন্যে অ্যালার্ম ঘড়ির দরকার, অন্যজনের অ্যালার্ম ঘড়ির আওয়াজ শুনলেই মাথায় আগুন, জানলা দিয়ে ঘড়ি ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেয়, ব্যস, বিয়ে শেষ। সে সব আমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন।

সে যা হোক, ফে আর ওয়ালির বিয়ে তো হয়ইনি, বরং বন্ধুত্ব ভেঙে গিয়েছিল। কলকাতায় পরিচয়ের বারো বছর পরে আমি যখন নিউ ইয়র্কে গিয়ে ওদের দেখা পাই, দুজনের মধ্যে সামান্যতম যোগাযোগ নেই, মুখ দেখাদেখি, কথা বলা বন্ধ।

ওয়ালি শান নিজে নট ও নাট্যকার। সেই সময় তার রচিত, পরিচালিত ও অভিনীত নাটক 'ম্যানড্রেক' ব্রডওয়ের থিয়েটার পাড়ায় নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

শুনেছি এখন দূরদর্শনে চরিত্রাভিনয় করে ওয়ালি মার্কিন মুলুকে যথেষ্টই সুপরিচিত এবং জনপ্রিয়।

সরাসরি মার্কিন দূরদর্শন দেখবার সুযোগ আমার নেই। কিন্তু এই অল্প কিছুদিন আগে কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে একটি সিনেমা দেখতে গিয়ে

দেখি পার্শ্বচরিত্রে চমৎকার ওয়ালি শান।

ওয়ালির অবশ্য সাইড রোল ছাড়া নায়কের রোল পাওয়া অসম্ভব। সে মোটেই লম্বা নয়, আমার চেয়েও বেঁটে, আমেরিকান বা বলা উচিত শ্বেতাঙ্গ অর্থাৎ সাহেবদের মাপে সে খুবই ছোটখাটো ব্যাপার। তা ছাড়া তার চোখে চশমা, মাথায় কেশের অপ্রতুলতা—এ সবই নায়ক হওয়ার পথে অন্তরায়, বিশেষ করে ফিটফাট হলিউডে।

অবশ্য ওয়ালিদের আগের জেনারেশনের, আমাদের সমবয়সী উডি অ্যালেন, তার চেহারাও নায়কোচিত নয়। তবে সে নিজেই নিজের বইয়ের পরিচালক ও নায়ক এবং সেটা সম্ভবপর হয়েছে নিউ ইয়র্কে, হলিউডে নয়।

ওয়ালি শানেরও কাজকারবার নিউ ইয়র্কেই। তবে ওই কিছুদিন আগে কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে কয়েক বছর আগের পুরনো একটা হলিউড সিনেমা, নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না, দেখতে গিয়ে ওয়ালিকে দেখে রীতিমত খুশি ও চমকিত হই। সামান্য নয়, পার্শ্ব চরিত্রটি বেশ মুখ্য, গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। বইয়ের শেষে চরিত্রলিপিতেও দেখি বেশ বড় বড় অক্ষরে গুরুত্ব দিয়ে লেখা রয়েছে 'ওয়ালি শান'।

আমরা কলকাতাবাসীরা যেমন কলকাতা নিয়ে কারণে অকারণে গর্ব করি, সে দোষ কিংবা গুণ নিউ ইয়র্কীয়দেরও রয়েছে। তারা রাগ করে, গালাগালি দেয় আবার আমাদের কলকাতার মতই তাদের নিউ ইয়র্ককে তারা ভালোও বাসে। এ জিনিস ওয়াশিংটনে বা লস এঞ্জেলসে দেখিনি, প্রায় সকলেরই কেমন একটু ছাড়া ছাড়া ভাব। তবে পরবর্তী কালে, সানফ্রানসিসকোতে নিউ ইয়র্কের মতই নগর-আহ্লাদিদের দেখেছিলাম।

সেই যে স্কুলপাঠ্য বইতে একটা ইংরেজি কবিতা ছিল না, 'কোথাও কি এমন কোনও মৃত আত্মা আছে যে কখনও বলেনি যে এই আমার, আমার নিজের জায়গা।' শহর ভালোবাসার ব্যাপারটাও ঠিক তাই, প্রায় জাতীয়তা-বাদের মত।

ওয়ালির নিউ ইয়র্কের প্রতি ভালোবাসা খুবই গভীর। কারণও আছে, জন্মকর্ম সবই ওই শহরে, তদুপরি জন্মসূত্রে নিউ ইয়র্ক নাম জড়িত নিউ ইয়র্কার মানে নিউ ইয়র্কবাসী নামক বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকের ছেলে সে।

এই সময় একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিলাম, নিউ ইয়র্কের মূল বাসিন্দারা তাদের শহর বিদেশি বন্ধুদের ঘুরে দেখাতে ভালোবাসে। ঠিক যেমনটি হত আমাদের সেই ছেলেবেলায়, কলকাতায় বেড়াতে এলে আত্মীয়স্বজন অভিভাবকেরা আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবেন চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, পরেশনাথের মন্দির, নাখোদা মসজিদ, সেন্ট পলস ক্যাথেড্রল। আমরা পরিপাটি চুল আঁচড়ে সাদা মোজা আর ফিতে বাঁধা কালো নটি বয় শু পরে গুরুজনদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম। কয়েকদিন পরে আমাদের সাতনদী পেরুনো ছোট মফস্বল শহরে ট্রেনে-স্টিমারে ফিরে যেতাম, তখনও কানে বাজত

পরেশনাথ মন্দিরের আরতির ঘণ্টা, হঠাৎ হঠাৎ ঘ্রাণে পেতাম চিড়িয়াখানার বাগানের ফলফুল, লতাপাতা, জীবজন্তুর এলোমেলো বুনো গন্ধ।

নিউ ইয়র্কে এসে আমি আবার সেই বাল্যদশা প্রাপ্ত হলাম। প্রথমে পড়েছিলাম শ্রীমতী ফে লেভিনের হাতে। ফে-র সঙ্গে নগর পরিক্রমা শেষ হতে না হতে ওয়ালি আমাকে লুফে নিল, এবং শুধু ওয়ালি একা নয় সেই সঙ্গে তার দীর্ঘকালের সহবাসিনী বান্ধবী শ্রীমতী দেবী আইজেনবার্গ।

অবশ্য এর পরেও টম হায়েসের পাল্লায় পড়েছিলাম, সে বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়, সপ্তাহান্তে সে এসেছিল আমাকে নিউ ইয়র্ক পর্যটনে সাহায্য করতে। তার কথা একটু পরেই আসবে। আগেও সামান্য লিখেছি।

আপাতত ওয়ালি ও দেবী উপাখ্যান শেষ করি।

নিউ ইয়র্কের ওই বরফ শক্ত হওয়া ঠাণ্ডা ও তুষার ঝড়েও ওয়ালি আর দেবী ওই শহরের রাস্তায় রাস্তায় পথে পথে হাঁটিয়ে আমার ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিল। এ যদি এদিকে নিয়ে যেতে চায় তো, ও ওদিকে নিয়ে যায়, দুজনে একত্র হলে তো কথাই নেই। ওয়ালি যদি বলে তো থিয়েটার পাড়ায় চলো, দেবী বলে চলো রকফেলার সেণ্টারে, আবার দুজনায় একত্রে হয়ে বলে চলো বিয়াল্লিশ নম্বর রাস্তায় পাবলিক লাইব্রেরিতে যাই, জায়গাটা কাছেই।

বলা বাহুল্য এই সব জায়গাতেই দেখেছি এদের চেনা-জানা বন্ধু-বান্ধবী লোকজন আছে।

এবং তা তো হবেই। কলকাতায় যেমন এমন কোনও স্থান বা প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে খারাপ-ভালো অন্তত দুয়েকজনকে দীনাতিদীন আমি চিনি না। আমার গোলমেলে স্বভাবের জন্যে তাঁরা প্রয়োজনমত আমাকে না চিনবার ভান করেন, কিন্তু নিউ ইয়র্ক শহরে যেন সেরকম দেখলাম না।

বরং দেখলাম যে আমাকে নিয়ে গিয়ে যে মুহূর্তে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, তিন রকম পরিচয় আমার, পর্যটক, কবি এবং ভারতীয় কিন্তু এসব ছাপিয়ে আমি যে পুরনো বন্ধু এই পরিচয়ে সবাই স্বতঃস্ফূর্ত স্বাগতম, ওয়েলকাম জানাচ্ছে আমাকে।

পথ পরিক্রমার মধ্যে একদিন ওয়ালি শান আমাকে দুপুরবেলায় তার বাড়িতে নিয়ে গেল।

বলল, আজ দেবী তোমাকে রান্না করে খাওয়াবে। লাঞ্চ বা লাঞ্ছনা নয়, মধ্যাহ্নভোজন নয়, নিতান্ত ব্রাঞ্চ, স্রেফ দেবীর হাতের তৈরি ব্রাঞ্চ। দেবী মানে সত্যজিৎ রায়ের বা প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের দেবী নয়, এমনকি দেবশর্মণের স্ত্রীলিঙ্গে দেবীও নয়, দেবী আইনজেনবার্গ, ওয়ালির বান্ধবী, দার্শনিকা, পরিচালিকা এবং সর্বোপরি সহবাসিনী।

আগের অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ওই ব্রাঞ্চ শব্দটির এই সূত্রে একটু ব্যাখ্যা করি। খুব নতুন না হলেও আধুনিক ইংরেজি শব্দ, সবাই মানে জানবেন এমন নাও হতে পারে। আমিই তো জানতাম না।

ধোঁয়া আর কুয়াশা মিলিয়ে বাংলায় যেমন ধোঁয়াশা, স্মোক আর ফগ

মিলিয়ে ইংরেজিতে যেমন স্মগ, দুটো শব্দ একত্র হয়ে দুটো শব্দেরই মানে রয়েছে। এ হল পোর্টম্যান্টো শব্দ, পোর্টম্যান্টো হল সেই বাক্স যার ডালা আর ভেতরটা আলাদা, দুটো জুড়ে একটা বাক্স। যেমন কলকাতা চিড়িয়াখানায় বাঘ আর সিংহ মিলিয়ে বাংহ, যেমন হাঁসজারু, তেমনিই ব্রাঞ্চ, ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ মিলিয়ে। সকালের পরে দুপুরের আগে, জলখাবার নয়, আবার ভরপেটও নয়, মাঝামাঝি। ইংরেজরা এদেশে এটাকেই ছোটা হাজরি বলত।

ওয়ালি আর দেবী তখন থাকত, সম্ভবত এখনও থাকে, থিয়েটার পাড়ার কাছেই একটা ছোট রাস্তায়। দোতলায় না তিনতলায় ছোট ঘুপচিমতন ফ্ল্যাট, একটু অগোছালো, আসবাব জিনিসপত্রও তেমন কিছু নেই। কিছু বই, কিছু উলটো পালটা জিনিস, থিয়েটারি সরঞ্জাম, একটা আমাদের তক্তপোশ জাতীয় বিছানা, ওই ওরা যাকে বলে ফোর পোস্টার বেড, চার কোনায় চারটে বাজু লাগানো।

শয়নঘরই ভোজনঘর। একটা ছোট কাঠের টেবিল, বইপত্র দোয়াত কলমে ঠাসা। সেটাকে পরিষ্কার করে খাটের পাশে টেনে আনা হল। একটাই চেয়ার নড়চড়ে, সেটায় বসেই টেবিলে ওয়ালি বা দেবী লেখাপড়া করে। সেই চেয়ারটা টেবিলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। সেটাই আমার আসন হল। ওয়ালি আর দেবী বসল খাটের ওপরে।

ওয়ালিদের আর্থিক অবস্থা তখন ভাল নয়। বোঝাই যায় যে বেশ টানাটানি চলছে। এক তরুণ নট ও নাট্যকারের জীবনসংগ্রাম তখন শুরু হয়েছে, কাঁধের ওপরে থিয়েটারের দলের বোঝা আর একপাল বাউণ্ডুলে বন্ধু।

ওয়ালির বাড়ির অবস্থা ভাল, খুবই ভাল। নিউ ইয়র্কার কাগজের সম্পাদকের ছেলে, সচ্ছল পরিবেশেই সে বড় হয়েছে। তার নিউ ইয়র্কের পারিবারিক বাড়িতে থাকবার জায়গা, দায়িত্বশীল জনক এবং স্নেহময়ী জননী রয়েছে। কিন্তু ওদেশে যুবক-যুবতী প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাওয়ার পরে আর পিতৃগৃহে থাকে না, অনেকে সাবালক হতে না হতেই আলাদা সংসার পাতে, ওখানে সেটাই দেশাচার, কালাচার।

আর একটা কথা মনে পড়ছে। ওয়ালির আর্থিক অবস্থা দেখে, আমার যা স্বভাব, আমি গায়ে পড়ে পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, তুমি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, অধ্যাপনা করছ, নাটক লেখো, সাহিত্যচর্চা কর তুমি তোমার বাবার কাগজ নিউ ইয়র্কারে একটা কাজ নিচ্ছ না কেন। ওয়ালি বলেছিল, অসম্ভব। কারণ মনোপলি নিবারক কি এক একুশে আইনে আমেরিকায় অথবা নিউ ইয়র্ক রাজ্যে বাবার প্রতিষ্ঠানে ছেলের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

দেবী আইজেনবার্গের অবস্থা আরও শোচনীয়। তার কোনও কাজ নেই। মাঝে মাঝে মাস্টারি যোগাড় করার চেষ্টা করে, কখনও-কখনও বিভাগীয় বিপণিতে সেলস গার্লের কাজ করে।

ওয়ালিদের ফ্ল্যাটের রান্নাঘর, বাথরুম কিছুই তেমন ভালো নয়। একবার

হাত ধুতে গিয়ে বাথরুমের অবস্থা দেখলাম, আমাদের কলকাতার পুরনো ভাড়াটে বাড়ির বাথরুম যেমন হয়, ভবানীপুর-কালীঘাটে শ্যামবাজারে তার থেকে বিশেষ আলাদা নয়। মেজে স্যাঁতসেঁতে, বেসিন থেকে জল চুঁইয়ে পড়ে।

ব্রাঞ্চের ব্যবস্থা ছিল খুব সাদাসিধে। দেবী স্যালাড কুটতে কুটতে আমার সঙ্গে গল্প করছিল আর ওয়ালি গিয়েছিল ডিম আনতে। তিনজনের জন্যে ঠিক তিনটে ডিম, একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি নিয়ে গিয়েছিল যাতে ডিমগুলো তার মধ্যে বসিয়ে যত্নে আনতে পারে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। আনতে আনতে একটা ডিম ভেঙে গিয়েছিল। সেই ভাঙা ডিমের সঙ্গে আর দুটো আস্ত ডিম ভেঙে মিলিয়ে তার মধ্যে আমেরিকান বেসন না ময়দা আর গুঁড়ো মশলা দিয়ে বেশ বড়বড় গোল গোল পাঁচটা বড়া বানাল দেবী।

স্যালাড আর সস্ দিয়ে খেতে বেশ ভালো লাগল। ওয়ালি আর আমি দুটো দুটো করে খেলাম। আর দেবী একটা, সেটা আবার আকারেও একটু ছোট। দেখলাম শ্রী অমর্ত্য সেনের থিয়োরি আমেরিকাতেও সমান লাগসই, খাবারের কম অংশটাই মেয়েরা পায় কিংবা নিজেদের ভাগে নেয়। এ সমস্যা সম্ভবত পৃথিবীর চিরন্তনী নারী প্রকৃতির। এর মধ্যে সাংসারিক সামাজিক বঞ্চনা যতটা আছে তার সঙ্গে মমতা, ভালোবাসার দিকটাও আছে। আমার ঠাকুমা টিনভর্তি নারকেলের নাড়ু বানাতেন। একবার আমাকে নাড়ু ফুরিয়ে যাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এবার নারকেলের নাড়ু কেমন হয়েছিল রে?'

আমি বলেছিলাম, 'কেন তুমি খাওনি?'

ঠাকুমা বলেছিলেন, 'কই আর খাওয়া হল?'

বাড়িসুদ্ধ লোকজন, অতিথি অভ্যাগত, আসেজন-বসেজন পনেরোদিন ধরে ওই নাড়ু খেয়েছে, ঠাকুমা নিজেই দিয়েছেন, শুধু তাঁরই খাওয়া হয়নি। আসল অসুবিধে হল, অর্থনীতিবিদেরা, সমাজবিজ্ঞানীরা যাই বলুন, বঞ্চনা ও ত্যাগের মধ্যে পার্থক্য করা, দেয়াল তোলা খুব কঠিন।

দেবী আইজেনবার্গ চমৎকার মেয়ে। একটু রুক্ষ, একটু স্থূল ধরনের চেহারা। কিন্তু মুখের হাসিটি মিষ্টি, চোখের তারা দুটি ফিকে নীল, মাথার বুদ্ধিটি পরিষ্কার। সর্বোপরি সে হৃদয়বতী। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে, যদি সে রমণী হৃদরবতী ও বুদ্ধিমতী হয়।

দেবী ও ওয়ালি একসঙ্গে থাকে, ওদের বিয়ে হয়নি, এতকাল এক সঙ্গে আছে, ছাড়াছাড়িও হয়নি।

এ বছরই নিউ ইয়র্কে গিয়ে তাতাই ওয়ালিকে ফোন করেছিল। খুব ছোট বয়েসে, তাতাই তখন সদ্য হাঁটতে শিখেছে, পোলারয়েড ক্যামেরায় ওয়ালি তার অনেকগুলো ফটো তুলেছিল, পরে কি একটা ইংরেজি ছবির বই পাঠিয়েছিল। কুড়ি বছর বাদে একটা ধন্যবাদ দেওয়ার জন্যে ফোন করেছিল।

ওয়ালি বাড়ি ছিল না, দেবী ফোনটা ধরেছিল। তাতাইয়ের গলা শুনেই দেবী একটু ইতস্তত করে বলেছিল, 'কে তারাপদ, কলকাতা থেকে?' তাতাই

খুব বিস্মিত হয়নি, তার কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গি ঠিক আমারই মত। তবু এই দূর দেশে একজন বিদেশিনির এই ভ্রমাত্মক প্রশ্ন!

আমি কিন্তু এই ভ্রমের ব্যাপারে সুযোগ নিই কলকাতায়। তাতাই যখন থাকে। এমন কেউ হয়তো ফোন করল, ফোনটা আমিই ধরেছি, কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, বিরক্ত লাগছে, বলে দিই, 'বাবা বাড়ি নেই।' ওদিক থেকে কখনও কখনও জবাব আসে, 'তাতাই তোমার গলার স্বর ঠিক তোমার বাবার মত হয়েছে। চট করে বোঝাই যায় না।'

আমি জবাব দিই, 'সবাই তাই বলে। বাবাও তাই বলে।'

দেবীও নিউ ইয়র্কেরই মেয়ে, সচ্ছল ইহুদি বংশোদ্ভবা। সে স্বেচ্ছায় এক উদাসীন নটের সঙ্গে তার এই জীবন বেছে নিয়েছে। দেবী তার পুরনো আমলের, বোধহয় তার ঠাকুমা বা দিদিমার কাছ থেকে পাওয়া লাল চামড়ার তোরঙ্গ থেকে বার করে স্বচ্ছ নীল মোড়কের কাগজে জড়িয়ে আমাকে একটা উপহার দিয়েছিল, যাকে ইংরেজিতে বলে মেমেণ্টো, নিউ ইয়র্কের স্মৃতিচিহ্ন।

পুরো আমেরিকা ভ্রমণ করে অমন মূল্যবান মেমেণ্টো আমি আর সংগ্রহ করে আনতে পারিনি।

দেবীর রঙিন মোড়কের মধ্যে ছিল তিনটে পিকচার পোস্টকার্ড। সব কটিই তিরিশের দশকের শেষ কিংবা চল্লিশের দশকের গোড়ার। এর মধ্যে একটা ব্যবহৃত, নিউ ইয়র্ক থেকে বার্লিনে দেবীর ঠাকুমাকে তার এক বান্ধবী ইস্টারের শুভেচ্ছা জানিয়েছিল। তার সামনের পিঠে নিউ ইয়র্ক সেণ্ট্রাল পার্কের ছবি। অন্য দুটি ছবিও নিউ ইয়র্কের। তার মধ্যে একটি আবার সে যুগের মহামহিম এম্পায়ার স্টেট বিলডিংয়ের, যার নীচে ইটালিকসে লেখা আছে, 'পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্য'। মোটা শক্ত কার্ডে গত যুগের কালার প্রিণ্ট, পিকচার পোস্টকার্ড-গুলো হাতে নিলে কেমন একটা নিকটদূর ভাবনা আসে মনের মধ্যে। কবেকার নিউ ইয়র্ক, কবেকার বার্লিন, সেই বার্লিন ভাঙল, জোড়া লাগল। এম্পায়ার বিলডিংয়ের মহিমাসূর্য অস্তমিত হল। এরই মধ্যে মহাযুদ্ধ, মহাধ্বংস, মহাহত্যা। পৃথিবী, জগৎ সংসার কত বদলাল। কিংবা একটুও বদলালো না।

ওই পিকচার পোস্টকার্ডগুলো খুব যত্নে আমি রেখে দিয়েছি আমার কাছে।

দেবী আমাকে নিয়ে গিয়েছিল রকফেলার সেণ্টারে। সে এক মহা বড়লোকি ব্যাপার, ঢুকতেই আড়াই ডলার লাগে। সৌজন্যবশত আমি দামটা দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু কপর্দকশূন্যা দেবী কোথা থেকে যেন সেদিন একটা টেনার সংগ্রহ করেছিল, নিশ্চয়ই ওয়ালি দিয়েছিল, সে আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেই তাজ্জব জাদুঘর দেখাল।

রকফেলার সেণ্টারে সর্বসমেত একুশটা বাড়ি। এরই মধ্যে রয়েছে ভুবনবিদিত রেডিয়ো সিটি মিউজিক হল। রয়েছে রুফ গার্ডেন, স্কেটিং রিঙ্ক, দেয়ালচিত্র, প্রমিথিউসের মূর্তি—আর সব মনে পড়ছে না। মনে আছে দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাছাড়া দ্রষ্টব্য জিনিস ঘুরে ফিরে দেখা

আমার চরিত্রে নেই। তবে রকফেলার সেণ্টারের সত্তর তলার ছাদ থেকে ম্যানহাটানের দৃশ্য, দূরে আতলান্তিক, পূর্বী নদীর ওপরে চারটি ব্রিজ, এম্পায়ার স্টেট, প্যানআম সমেত সব মাথা উঁচু বিখ্যাত বাড়ি—দৃশ্যগুলো এখনও মনে পড়ছে।

নিউ ইয়র্ক ভ্রমণের আর বিস্তারিত বিবরণে যাব না। একদিন অ্যাকাডেমি অফ আমেরিকান পোয়েটস-এ যাওয়ার কথা ছিল, শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হয়নি। খুব কাছে গিয়েও স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখা হয়ে ওঠেনি।

তবে ওয়ালি একদিন সকালে জাতিসঙ্ঘের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। নদীর ধারে, বেশ বড় একটা অফিসবাড়ি, সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থার খুব কড়াকড়ি, সব সময়ে কিনা জানি না তবে সেই সময়ে ছিল। এই বাড়িতে একটি আসবাবহীন নির্জন কক্ষ রয়েছে, প্রার্থনা কক্ষ। কক্ষের মধ্যে, একটি বেদি আছে, কিন্তু সেই বেদিতে কোনও দেবতা নেই, দেয়ালে একটি বিমূর্ত ছবি আছে। যে কোনও ধর্ম ও জাতির মানুষ এই ঘরে এসে প্রার্থনায় বসতে পারে, ধ্যানে মগ্ন হতে পারে। এখানে কাউকে বিরক্ত করা চলবে না। হৃদয়হীন রক্তপাতময় আধুনিক পৃথিবীর রাষ্ট্রনেতারা, আতঙ্কবাদীরা নিজেদের বিবেকের কাছে এ ঘরে নিশ্চিন্তে বোঝাপড়া করতে পারে, অনুশোচনায় নিমগ্ন হতে পারে।

আর নয়। নিউ ইয়র্ক অনেক হল। আর শুধু দুজনের কথা উল্লেখ করব।

প্রথম হল প্রবাল দাশগুপ্ত। ভাষাবিদ, মানসীদি ও অরুণদা অধ্যাপক দম্পতির ছেলে তখন নিউ ইয়র্কে পড়াশুনো করে। সে আমার অনবরত খোঁজ নিত, দেখাশুনো করত। সবচেয়ে বড় কথা নিউ ইয়র্কের রাজপথে ওভারকোট গায়ে বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে সহাস্য তারাপদ রায়ের একটা ফটো তুলেছিল সে, সেটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্র, আমি যে অত সুন্দর দেখতে তা আগে জানতাম না।

পরের জনের প্রসঙ্গও আমার প্রশংসা সূত্রেই। সে হল টম হায়েস। ওয়ালিদের বন্ধু। সে আমাকে নিয়ে ওয়ালির 'ম্যানড্রেক' নাটক দেখাতে যায়, ওয়ালিরই আমন্ত্রণে সে আমার জন্যে বস্টন থেকে এসেছিল দুদিনের জন্যে। আমি চলে আসার পর 'নিউ ইয়র্কার' পত্রিকায় সে আমাকে নিয়ে একটা উপনিবন্ধ লিখেছিল, 'এ ফ্রেন্ড ফ্রম ক্যালকাটা'। তার শেষ পংক্তিতে ছিল 'আমাদের সেই কলকাতার বন্ধু, তাকে আমরা যেমন মনে রেখেছিলাম, সে এখনও সেই রকমই আছে।'

এই জীবনে এমন নির্জলা বন্ধুকৃত্য, আমার ভাগ্যে আর কখনও ঘটেনি।

তেইশ

স্বর্গ কোনদিকে

স্বর্গ কোনদিকে ভাবি।
ঈশ্বর আছেন ওই
বাজারের পাশের ডুমুর
গাছটার নীচে।
সকলেই হাত পেতে পয়সা নেয়।
আমিও নিয়েছিলুম
যেন অন্ধ এক।...
...ভাবি প্রশ্ন করি দূর পথের বন্ধুকে...
জানি যে কোনও একটি লোক
মুহূর্তেই সব বলে দেয়।'

—আলোক সরকার

নিউ ইয়র্ক পর্ব প্রায় শেষ। এবার নিউ ইয়র্ক থেকে বেরিয়ে যাব আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে। তার আগে হিম উত্তরে একটু যেতে হল। আকাশপথে নিউ ইয়র্ক থেকে গিয়েছিলাম বাফালোয়, ওই নিউ ইয়র্ক রাজ্যের মধ্যেই, তারপরে আরও উত্তরে একেবারে কানাডা সীমান্তে।

অবশ্য বাফালো যাওয়ার আগে সপ্তাহান্তে একবার নিউ ইয়র্ক শহরের বাইরে গিয়েছিলাম, জার্সি-সিটিতে।

'পশ্চিমবঙ্গের পুরনো শহরগুলিতে অনেকদিন আগে একটা করে বাঙাল-পাড়া থাকত। কার্যব্যপদেশে, জীবিকা বা বৃত্তির প্রয়োজনে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সব পরিবার এই সব শহরে এসে বসবাস করত এই সব পাড়া ছিল তাদেরই। এই এলাকার লোকাচার-দেশাচার, উৎসব সামাজিক প্রথা ইত্যাদি স্বাভাবিক কারণেই বেশ অন্য রকম হত।

জার্সি সিটির একটা এলাকা নিউ ইয়র্কের এই রকম বাঙালপাড়া। অবশ্য বাঙাল বলতে শুধু পূর্ববঙ্গীয়, বাংলাদেশি বা পশ্চিমবঙ্গীয় নয়, প্রবাসী ভারতীয় এমনকি পাকিস্তানিরাও আসছে।

সমস্যাটা মার্কিন দেশেও রয়েছে। কোনও-কোনও অঞ্চলে ভারতীয়দের হেনস্তাও কম নয়। নিউ ইয়র্কের শহরতলিতেই গড়ে উঠেছিল সেই কুখ্যাত ডট-বাস্টার সংঘ। ডট মানে বিন্দি, গুজরাতি এবং অন্যান্য ভারতীয় মেয়েরা কপালে যে টিপ লাগায়, আমাদের সিঁদুরের ফোঁটা, মহাকবি মাইকেল যার সপ্রশংস বর্ণনা দিয়েছিলেন মেঘনাদবধ কাব্যে, সিন্দুর বিন্দু শোভিল ললাটে, গোধূলি-ললাটে আহা! তারা রত্ন যথা! বিন্দি তারই রকমফের।

মেয়েদের ললাটে সেই বিন্দি বা ফোঁটা দেখলে ডট বাস্টারদের মাথায় রক্ত উঠে যায়, নিরীহ রমণীর ওপরে আক্রমণ ও নির্যাতনের ঘটনার নজির অনেক

রয়েছে। এক বা একাধিক মহিলা বোধহয় হঠাৎ আক্রমণে মারাও গিয়েছেন।

রাগের কারণটা কিন্তু স্পষ্ট। সমাজের প্রান্তসীমার এই সব শ্বেতাঙ্গেরা অনেকেই দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করে, এরা ঈর্ষা করে ভারতীয় সফলতাকে। প্রবাসী ভারতীয় মাত্রেই সফল না হলেও অধিকাংশই সচ্ছল ও সফল।

সে যা হোক সপ্তাহান্তে জার্সি সিটিতে এলাম। নিউ ইয়র্কে গেলে জার্সি সিটিতেও কলকাতার লোকেরা একবার যায়, কারণ সেখানে সবারই পরিচিত আত্মীয়স্বজন, বন্ধু আছে, কাছাকাছি এলাকায়। অনেক বাঙালি পরিবার একই এলাকার মধ্যে রয়েছে। অসুখে-বিসুখে, আপদে-প্রয়োজনে এতে একটা সুবিধে সকলেরই অবশ্যই হয়। সবাই সবার দেখাশোনা করে। খোঁজখবর নেয়।

কারও কারও বৃদ্ধা মা হয়তো একা একা কলকাতা থেকে আসছেন, বিমানে নামবেন অফিসের দিন দুপুরবেলায়। সেদিন যার কাজ নেই বা অপেক্ষাকৃত কম কাজ আছে কিংবা যে কাজ থেকে ছুটি নিতে পারবে সেই আনতে গেল অন্যের মাকে। এক দম্পতি পার্টিতে যাবে, বাজার করতে যাবে, উইক এন্ডে যাবে, বাচ্চাগুলো রেখে গেল অন্য বাড়িতে। কারও অসুখ করল অন্য একজন এসে দেখাশোনা করল। বাচ্চা দেখাশোনা করা যাবে বলে বেবি সিটিং যে রকম ব্যয়সাধ্য, হাসপাতালে বা নার্স দিয়ে চিকিৎসা শুশ্রূষা করার খরচাও অকল্পনীয়।

এই সব নানা কারণে পরস্পর নির্ভরশীল একটা প্রবাসী সমাজ গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া দোল-দুর্গোৎসব আছে, সরস্বতীপুজো আছে, রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে, সাহিত্যসভা আছে, প্রবাসীরা যথাসাধ্য সবকিছুরই আয়োজন করে।

তবে সেই সঙ্গে অবশ্যই আছে বাঙালি স্বভাবের চিরন্তন কুটকচালি, নিন্দেমন্দ, দলাদলি, ঝগড়া-ঝাটি সব কিছুই। তবে তাতে মেল বন্ধনে খুব একটা চিড় ধরে না।

শনিবার বিকেলে জয়ন্ত এসে আমাকে জার্সি সিটিতে নিয়ে গেল।

জয়ন্ত, ভালো নাম বোধহয় বীরেশ বিশ্বাস, একদা আমার ছাত্র ছিল। জয়ন্তের মা স্নেহশীলা চিনুদি, সেই ছোটবেলায় টাঙ্গাইল থেকে দেখছি পরে অশোকনগরে প্রতিবেশী ছিলেন। এই সব সূত্রে জয়ন্ত আমাকে মামা বলে।

জয়ন্তের সঙ্গে টিউব রেলে করে হাডসন নদীর নীচে দিয়ে পাথ স্টেশন হয়ে জার্সি সিটির করবিন অ্যাভিনিউয়ে গেলাম। সেখানে আমার নিমন্ত্রণ শঙ্করী আর বীরেনের বাড়িতে। বীরেন ভট্টাচার্য এঞ্জিনিয়ার। শঙ্করী আমার ভাগিনেয়ি।

এখানে একটা পারিবারিক তথ্য জানাতে হয়। জয়ন্তের কাকিমা আর শঙ্করীর মা দুজনেই আমার পিসতুতো বোন। আমার পিসিমা বিধবা হওয়ার পরে আমরা সকলেই এক সঙ্গে টাঙ্গাইলের বাড়িতে বড় হয়েছি।

জার্সি সিটিতে শঙ্করীদের বাড়িতে আমি যাওয়ার পরে অনেক লোকজন এল। তখন তো আমি লিখি নিতান্ত কবিতা আর ডোডো-তাতাই জাতীয় বাচ্চাদের লেখা। যাঁরা এলেন তাঁদের অধিকাংশেরই আমার সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। এখনও হয়েছে কি না জানি না। জীবনশেষে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করেছিলেন যে তাঁর রচনা গেলেও বিচিত্রপথে, হয় নাই সে সর্বত্রগামী। এর পাশে আমার ছিঁচকে দুঃখ খুবই বেমানান হবে।

ভিতরের একটা ঘরে বসে কথাবার্তা হচ্ছিল। কলকাতার কথা। আমেরিকার কথা। অমুকের মেজদাকে আমি চিনতাম কি না। আগে আমি খুব রোগা ছিলাম কি না। হাজরার মোড়ে সাঙ্গুভ্যালিতে আমি আড্ডা দিতাম কি না। এখনও দিই কি না।

এরই মধ্যে দুতিনটে নবযুবক খুবই উত্তেজিতভাবে এল। তাদের হাতে চাঁদার খাতা। সামনেই সরস্বতী পুজো।

এখানে পুজো হয়, তিথি অনুসারে নয়, বার অনুসারে। তবে তাতে তিথির সায় থাকে। পুজোয় তো আর ছুটি থাকে না, তাই যে সপ্তাহে পুজোর তারিখ থাকে তারই উইক-এন্ডে পুজো হয়। সর্বজনীন পুজো, সবাই যাতে যোগদান করতে পারে তাই এই ব্যবস্থা।

আমেরিকার সর্বত্রই এই ব্যবস্থা। বাঙালিরা নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। অনেক লোক না হলে সর্বজনীন পুজো হয় না। কোনও-কোনও পরিবার পুজোয় যোগদান করতে একশো মাইল বা তারও বেশি পথ উজিয়ে আসে। তবে একশো মাইল আমেরিকান হাইওয়েতে কোনও ব্যাপার নয়, সপ্তাহান্তে অনেকেই এর থেকে কমবেশি পথ প্রায় নিয়মিত আত্মীয়বন্ধু সমাগমে যায়।

আবার এই সব পুজো শুধুই বাঙালি হিন্দুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রবাসী ভারতীয়ের গুজরাতি, মাড়োয়ারি যাই হোক, এমনকি বাংলাদেশি বা পাকিস্তানি মুসলমান পরিবার, সিংহলি বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান সাহেব-মেম বন্ধু-বান্ধবী তারাও অনেক সময়ে এই সব ধর্মীয় উৎসবে যোগদান করে, ততটা ভক্তি-সহকারে না হলেও কৌতূহলভরে এবং তদুপরি সামাজিকতার দাবিতে।

আরও একটা কথা, যেহেতু পুজোর তারিখ ফেলতে হয় শনি-রবিবারে, দুর্গোৎসবের দীর্ঘ চার-পাঁচদিনের ঘটাকে ছেঁটে কমিয়ে বোধন থেকে বিসর্জন সবই ওই সপ্তাহ শেষের দুদিনে সারতে হয়।

তবে একটা মজা হয় অনেক সময়ে। এই রকম যে কোনও বছর হয়তো পুজো কোনও সপ্তাহের মঙ্গলবার থেকে এক এলাকায় পুজো হল আগের শনি-রবিবারে, অন্য এলাকায় পরের শনি-রবিবারে। ফলে পরপর দু-সপ্তাহ পুজোর ফুর্তি করার সুযোগ মিলে যায় একটু কাছে-দূরে করলেই।

এগুলো সব দুর্গাপুজোর ব্যাপার। আমি গিয়েছিলাম সরস্বতীপুজোর সময়। অবশ্য জার্সি সিটিতে আমার সরস্বতীপুজো দেখা হয়নি। সরস্বতী-

পুজোর সময়ে আমি একেবারে অপর প্রান্তে কয়েক হাজার মাইল দূরে পশ্চিম উপকূলে।

আমাদের যেমন কলকাতা-বোম্বাই, মার্কিনদের সেই রকম ইস্ট কোস্ট, ওয়েস্ট কোস্ট। আটলান্টিকের কূলে ইস্ট কোস্ট ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক আর প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে ওয়েস্ট কোস্ট সানফ্রানসিসকো, লস এঞ্জেলস। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল অল্পকালের সফরেও এই দুই কূলের সব বড় শহরগুলোতেই যেতে পেরেছিলাম। তুষারশীতল নিউ ইয়র্ক থেকে চির-বসন্তের ক্যালিফোর্নিয়া। আমার মনে হয়েছিল, শুধু আবহাওয়া বা ভূপ্রকৃতির, দুই মহাসাগরের তীরের তফাতই নয় মার্কিন দেশের এই দুই মুখ্য অঞ্চলের রীতিনীতি। চলন বলনে যথেষ্টই ফারাক।

জার্সি সিটিতে আমার সরস্বতীপুজো দেখা হয়নি বটে, তবে সেই পুজোর আঁচ টের পেয়েছিলাম। একেবারে কলকাতার আঁচ।

সেদিন সন্ধ্যায় শঙ্করী-বীরেনদের বাড়িতে যে যুবকেরা চাঁদার খাতা নিয়ে এল, দেখলাম স্পষ্টতই তারা খুব উত্তেজিত। তারা অবশ্য ভদ্রতা করে আমার কাছে কোনও চাঁদা চায়নি।

তাদের উত্তেজনার কারণ শুনে বেশ মজা বোধ করলাম।

কে এক মিস্টার চৌধুরি না চক্রবর্তী, 'ফালতু পার্টি', এবারও মাত্র পনেরো টাকা চাঁদা দিয়েছে, সে টাকা না নিয়ে এরা মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এখন বলতে এসেছে যে ওই ফালতু পার্টির স্থূলকায়া ও ন্যাকা অর্ধাঙ্গিনীকে যেন কোনও কারণেই সরস্বতীপুজোর ফাংশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে না দেওয়া হয়।

যতদূর মনে পড়ছে, এই ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত একটা সুষ্ঠু মীমাংসা হয়েছিল। সেই সন্ধ্যাতেই কিছুক্ষণ পরে আমার কল্যাণেই ওই ফালতু পার্টি শ্রী চক্রবর্তী বা চৌধুরি সস্ত্রীক শঙ্করীদের ওখানে এসেছিলেন। ভদ্রলোক চাঁদা আদায়কারীদের মুখ চোখ দেখে এবং খুব সম্ভব আমার উপস্থিতির কারণেই সঙ্গে সঙ্গে পঁচিশ টাকা কবুল করলেন এবং পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে ব্যাপারটা চুকিয়ে দিলেন। তবে টাকা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মধ্যে যে একটা অসভ্যতা আছে সে কথাও একটু তিক্তভাবেই বললেন।

ওখানকার বাঙালিদের দেখেছি ডলারকে টাকাই বলেন, হাফ ডলারকে আধুলি, কোয়ার্টারকে সিকি। জার্সি সিটিতেই শঙ্করীদের প্রতিবেশী আমাদের পূর্বপরিচিতা শ্রীমতী তনুশ্রী দত্ত (ভট্টাচার্য) এই কথাটা আমাকে বলেছিলেন, আমিও মিলিয়ে দেখেছিলাম ঠিকই। তা ছাড়া সেই সময়ে আমি হিসেব করেও দেখেছিলাম ডলার আর টাকার আপেক্ষিক স্বদেশি ক্রয়মূল্য প্রায় একই, যদিও তখন মুদ্রা লেনদেনের বাজারে ডলারের দাম আটগুণ। এখন অবশ্য ডলার টাকার ত্রিশগুণ, এর অনেকটাই কিন্তু অতি ফাঁপানো, বিশ্বব্যাঙ্কের আন্তর্জাতিক তহবিলের সহযোগিতায় ধনী দেশগুলোর কারসাজি।

সে যা হোক, ডলারকে টাকা আমি সজ্ঞানেই লিখেছি, এটা কোনও স্লিপ অফ পেন বা স্লিপ অফ টাং নয়।

পরের দিন রবিবার বিকেলে জার্সি সিটি থেকে নিউ ইয়র্কের হোটেলে ফিরলাম।

তার আগে সকালবেলায় জার্সি সিটিতে বীরেন, জয়ন্ত এবং আরও কারও কারও সঙ্গে পাড়া বেড়িয়েছিলাম। দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে গেলে যেমন হয় প্রায় তাই, কাছাকাছির মধ্যে অনেক চেনাজানা লোক, এর বাড়িতে এক কাপ চা, ওর বাড়িতে একটা ওমলেট। সিগারেটের ধোঁয়া, কলহাস্য, কিছু স্মৃতি বিনিময়, কিছু জিজ্ঞাসা, ধন্যবাদ, দেখা হবে, আবার আসবেন। সেই সকালটা আমার মনে আছে, চমৎকার কেটেছিল।

শক্ত, জমাট বরফে ঢাকা রাস্তা, জনহীন। নিরেট ঠাণ্ডা, কিন্তু ঝোড়ো কনকনে বাতাসের ঝাপটানি নেই। শঙ্করীর বর বীরেন বারবার হাঁটার সময় আমাকে সতর্ক করে দিচ্ছিল, 'সাবধান, পায়ের নীচে পিচ্ছিল জমা বরফ,' এই করতে করতে সে নিজেই একটা কালভার্টের থেকে নামার মুখে দশ ফুট স্লিপ করে চিত হয়ে পড়ে গেল।

না। আমি পড়িনি। ওয়াশিংটনেই আমার উচিত শিক্ষা হয়েছিল। আমি পা টিপে টিপে হাঁটছিলাম, যেটা অবশ্য আমার পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক।

বিকেলে শঙ্করীরা আমাকে তাদের গাড়ি করে নিউ ইয়র্কে পেঁছে দিল। সদর মানহাটানে গাড়ি নিয়ে যাওয়া গেল না, সেখানে গাড়ি রাখার জায়গা নেই। রাস্তার ধারে গাড়ি রাখলে পুলিশ ধরবে।

জার্সি সিটি থেকে টুকটাক কিছু উপহার পেয়েছিলাম। হোটেলের ঘরে আগের দিন আমার গ্যাটাভাটারের রদ্দি সেফটি রেজার দেখে জয়ন্ত আমাকে একটা মূল্যবান জিলেটের দাড়ি কামানোর সেট কিনে দিয়েছিল। সেটা দিয়ে এখনও দাড়ি কামাই।

জিলেটের সেটটা পেয়ে পুরনো পাঁচটাকা দামের যন্ত্রণাদায়ক সেফটি রেজারটি ডোরালস ইনের ঘরেই ফেলে আসি। কিন্তু তাতে পরিত্রাণ পাইনি। তিনমাস বাদে আমার কলকাতার ঠিকানায় জাহাজডাকে রেজারটি ফেরত আসে, হোটেলের কর্তৃপক্ষ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

শঙ্করীদের সঙ্গে সেই যে নিউ ইয়র্কে ফিরলাম সেটাই আমার সেই শহরে শেষ সন্ধ্যা।

নিউ ইয়র্কে এসে পুরনো যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, যাদের সঙ্গে সদ্য আলাপিত হয়েছিলাম, সবাইকে সেই সন্ধ্যায় আমার হোটেলের ঘরে আমন্ত্রণ জানিয়ে দিলাম। সামান্য বাদাম আর পানীয়, তার মধ্যে উষ্ণ পানীয়ই বেশি।

সবাই এসেছিল, ফে-ওয়ালি-টম, ওয়ালির ভাই, প্রবাল এবং প্রবালের মেমবান্ধবী, অন্ধ ভারতীয় লেখক বেদ মেহেতো তাঁর আমেরিকান সঙ্গিনী-সহ। শঙ্করী, বীরেন আর জয়ন্ত এবং শেষাশেষি পিটার এবং আরও কেউ কেউ, যথা জোনাথন শেল নামে সাংবাদিক, এলিজা নামে এক তরুণী অভিনেত্রী,

যাদের সঙ্গে ওই কদিনেই আমার গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল।

বহুজাতিক কলহাস্যে, কোলাহলে মানহাটান দ্বীপের প্রাচীন হোটেলের ক্ষুদ্র বাসকক্ষ সেদিন আলোড়িত হয়েছিল। বারান্দা দিয়ে যাওয়ার পথে এবং লাউঞ্জ থেকে অন্যান্য অধিবাসীরা কৌতূহলভরে দেখছিলেন।

তবে সেই জন্যে নয়, পরের দিনে ভোরে আমাকে বাফালো যেতে হবে তাই আড্ডা জমতে না জমতে ভেঙে গেল।

বাফালোয় মইদুল আসবে বাটাভিয়া থেকে। ডাক্তার মইদুল ইসলাম খান আমার টাঙ্গাইলের বাল্যবন্ধু। কত কাল ধরে সে আমাকে লিখেছে, 'নায়াগ্রা প্রপাতের খুব কাছে আছি, একবার চলে আয়। নায়াগ্রাটা দেখে যা।'

নায়াগ্রায় কিন্তু আমার যাওয়া হয়নি। কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার মতই ভূপ্রকৃতির অত্যাশ্চর্য দ্রষ্টব্যের তালিকার শীর্ষে রয়েছে নায়াগ্রা জলপ্রপাত। শীতের ঠাণ্ডায় বরফ জমে সেও নাকি নিথর হয়ে যায়, সে আরও চমকপ্রদ দৃশ্য।

প্রাকৃতিক কারণেই নৈসর্গিক সেই দৃশ্য আমার দেখা হয়নি। তখন যাওয়ার রাস্তাই ছিল না। দুর্ঘটনা এড়াতে বাটাভিয়া থেকে কানাডামুখী রাস্তা বন্ধ করে রাখা ছিল। জমাট বরফে ঢাকা পিচ্ছিল অসমতল রাস্তায় গাড়ি স্কিড করবেই এবং সেই জন্যেই দুর্ঘটনা অনিবার্য। কি একটা ঘোরা পথ ছিল, মইদুলের এক শালা সেই পথের খবরও এনেছিল, কিন্তু বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করে জানা গেল, সে বছর শীতে সেই পথও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং নায়াগ্রা জলপ্রপাত আমার দেখা হয়নি। কিন্তু সেই জন্যে নায়াগ্রার গল্পটা বলতে নিশ্চয়ই বাধা নেই।

গল্পটা আমাকে বলেছিলেন বাফালো থেকে যাওয়ার পথে, আটলাণ্টাগামী বিমানে এক বাঙালি ভদ্রলোক। আমেরিকায়, আমেরিকায়ই বা কেন যে কোনও বিদেশে অন্তর্দেশীয় বিমানে দুজন বাঙালি সহযাত্রী প্রায় অসম্ভব ঘটনা।

নাম ভুলে গেছি ভদ্রলোকের, অনাদি চক্রবর্তী কিংবা অনাথ ভট্টাচার্য, ওই কাছাকাছি নাম। বাংলাদেশি হিন্দু, সাবেকি পূর্ব পাকিস্তানি, গঙ্গা-পদ্মা অববাহিকায় বারেন্দ্র বঙ্গের মানুষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ষাটের দশকের রসায়নের ছাত্র।

ভদ্রলোক বহুদিন ধরে কাজ করছেন একটি মার্কিন সংস্থায়। রাসায়নিক দ্রব্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে যে সব পদার্থ লাগে, তাই উৎপাদন করে তাঁর কোম্পানি। তিনি কোম্পানির হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা করেন।

ভদ্রলোক নিজেই কবুল করলেন, পুরোপুরি সেলসম্যানের কাজ, তবে মাইনে খুব ভালো, আর তা ছাড়া পোস্টের একটা গালভরা নাম আছে। চিফ একজিকিউটিভ, সায়েন্স অ্যান্ড এডুকেশন।

অনাদি কিংবা অনাথ, বরং বলা যাক, অবাবু। কি করে যেন তিনি টের পেয়েছিলেন আমি বাঙালি। হয়তো এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে আমার আর

যাত্রীদের বঙ্গীয় কথোপকথন তিনি শ্রবণ করেছিলেন।

ডেল্টা এয়ারলাইন্সের ছোট বিমান। সিট নম্বরের কড়াকড়ি নেই, যে যেমন উঠবে বসবে। খাদ্যপানীয়ের ব্যবস্থাও প্রায় নেই। কি এক চুক্তির কারণে বিনামূল্যে পানীয় পরিবেশন নিষিদ্ধ, তবে কেউ নিজের পয়সায় কিনে খেলে বাধা নেই। তার জন্যে কাউন্টার খোলা রয়েছে।

সে যা হোক, অবাবুর গল্পটা বলি।

প্লেন ছাড়ার মুখে সিটবেল্ট বাঁধতে বাঁধতে নিজের পরিচয় দিয়ে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। তারপর একটু বাদেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'নায়াগ্রা দেখলেন?'

আমি জানালাম দেখা হয়নি, কেন দেখা হয়নি তাও জানালাম।

অবাবু এবার তাঁর মামার নায়াগ্রা দর্শনের গল্প বললেন। অবাবুর মাতুলমহোদয় থাকেন বাংলাদেশেরই উত্তরের কোনও জেলা রংপুর বা বগুড়ার এক গঞ্জ শহরে। আত্মীয় স্বজন সবাই প্রায় পশ্চিমবাংলায়, তিনি একা একাই থাকেন।

অল্প বয়েসে মামার কাছে অনেক সাহায্য পেয়েছেন অবাবু। সেই সব কথা মনে রেখেই বৃদ্ধ মাতুলকে একবার ফেরত বিমান টিকিট পাঠিয়ে আমেরিকা বেড়াতে এনেছিলেন তিনি।

সেই বৃদ্ধ বাঙাল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মার্কিন দেশে এসে যা কিছু দেখেছেন একেবারে তাক লেগে গেছে। শিশুর মত সরল কৌতূহলে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন, জানতে চেয়েছেন।

অবশেষে নায়াগ্রার জলপ্রপাত দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। জল পড়ছে তো পড়ছেই, রাশি রাশি অকূল, অতল জল হাজার হাজার পাগল হাতির মত ঝাঁপিয়ে পড়ছে চড়াই থেকে উতরাইয়ে। সে জলযাত্রার কোনও বিরাম নেই।

ব্যাপারটা কিন্তু বিশ্বাস হয়নি সন্দেহপ্রবণ মাতুল মহোদয়ের। ফেরার পথে গাড়িতে বসে চালক ভাগিনেয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা, তোমাদের ওই নায়াগ্রা, ওটা কি রাতেও চলে, নাকি সন্ধ্যা হওয়ার পরে বন্ধ করে দেয়?'

চব্বিশ

বরফের দেশে

'কোন্ গ্রাম কোন্ নগর কিংবা
কোন্ প্রান্তরে ভাসছি
জানালার কাচ ঠেলে তুলে দিই
হঠাৎ কি ভেবে হাতড়ে
তীক্ষ্ণ আদরে চোখে মুখে লাগে
সাইবেরিয়ার স্পর্শ
ফেলে দাও কাচ, ফেলে দাও কাচ
ঠাণ্ডা।...

—নবনীতা দেব সেন

এই অধ্যায় নিতান্ত ব্যক্তিগত। আমেরিকাবাসী আমার নিজের ছোটবেলার এক বন্ধুর কথা। কেউ ইচ্ছে করলে এই পর্ব টপকিয়ে যেতে পারেন, মূল কাহিনীর কোনও হেরফের হবে না তাতে।

নিউ ইয়র্কে প্রবেশ করেছিলাম তুষার ঝঞ্ঝা মাথায় করে রেলপথে, বেরিয়ে গেলাম লা গার্টিয়া বিমান বন্দর দিয়ে অন্তর্দেশীয় উড়োজাহাজে, সেও এক তুষারতাড়িত প্রভাতবেলায়। আমার নিউ ইয়র্কের স্মৃতি বরফের মধ্যে রয়েছে বলেই বোধহয় ফ্রিজের মধ্যে রাখা জিনিসের মতই এখনও সজীব রয়েছে।

নিউ ইয়র্ক থেকে বিমানে গিয়ে নামলাম বাফালো শহরে, সেও আমেরিকার প্রধান শহরগুলোর মধ্যে একটা। লোহা, ইস্পাত, মদ আর জাহাজ তৈরির কারখানায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল, তা ছাড়া বাফালো বিশ্ববিদ্যালয়েরও খ্যাতি আছে।

বাফালোতে আমার জন্যে ঘর রাখা ছিল নায়াগ্রা স্কয়ারে স্ট্যাটলার হোটেলে, কিন্তু সেখানে আমাকে উঠতে হয়নি।

আমার বন্ধু মইদুল আমাকে এয়ারপোর্টে নিতে এসেছিল। আমার গন্তব্যস্থল বাটাভিয়া মইদুল যেখানে থাকে।

দীর্ঘ কুড়ি বাইশ বছর পরে মইদুলের সঙ্গে দেখা হবে। আমার আশঙ্কা ছিল মইদুল আমাকে অথবা আমি মইদুলকে দেখলে চিনতে পারব না।

কিন্তু আমার সে আশঙ্কা মোটেই সত্যি হয়নি। এয়ারপোর্টের করিডোরে বহু দূর থেকে মইদুল আমাকে দেখে হাত নাড়ছিল।

আমারও তাকে এক দৃষ্টিতেই চিনে উঠতে মোটেই অসুবিধে হয়নি। তার প্রধান কারণ অবশ্য এই যে আমাদের প্রজাতির আর কোনও ব্যক্তি পুরো চত্বরে ছিল না। বহু সাহেব, কিছু কৃষ্ণাঙ্গ, আর শুধু মেম। বলে রাখি, মেম আর মেম, মেম দেখে দেখে চোখে অরুচি ধরে গিয়েছিল। দোকানে মেম, রেস্তোরাঁয়

মেম, রেলে মেম, বিমানে মেম, অফিসে-কাছারিতে হাটে-বাজারে মেম। মইদুলের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম সেখানেও এক মেম। শুধুমাত্র শয়নে এবং স্বপনে ছাড়া সর্বত্র মেম। মেম এবং মেম।

বাফালো থেকে বাটাভিয়া অনেকটা দূরের পথ। মাইল কিলোমিটারের অংকে সঠিক বলতে পারব না, তবে মনে করতে পারছি যে বাফালো বিমানবন্দর থেকে মইদুলের গাড়িতে বাটাভিয়ায় তার বাড়ি পর্যন্ত যেতে ঘণ্টাখানেক সময় লেগেছিল।

অবশ্য একটু বেশি সময়ই লেগে থাকতে পারে। তার দুটো কারণ ছিল।

রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। অত বড়লোকদের দেশ আমেরিকায় এমন রাস্তা যে থাকতে পারে সেটা কল্পনা করাও কঠিন। মনে হয় অনেকদিন সারানো হয়নি। বরফে-বৃষ্টিতে এবড়ো-খেবড়ো ভাঙাচোরা। বড়-ছোট গর্ত, পটহোল। রীতিমত বাজে রাস্তা, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি থেকে কুচবিহার কিংবা আরামবাগ থেকে পুরুলিয়ার সড়কের চেয়ে বেশি না হলেও সমান খারাপ, প্রায় জিটি রোডের বা স্ট্র্যান্ড রোডের সঙ্গে তুলনীয়।

দ্বিতীয় কারণটা বরফ।

বরফে বরফে সাদা হয়ে আছে চার পাশ। তারই মধ্যে ঘন নীল আকাশে সূর্য উঠেছে, রোদের আলোয় ঝলমল করছে চারদিক, দশ দিগন্ত। আমার মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আগন্তুকের চোখে এ এক অপূর্ব দৃশ্য।

রাস্তার দুপাশে কোনও লোকালয় নেই। পথে পথচারী নেই। ক্বচিৎ এক আধটা গাড়ি। তাও বেশ সাবধানে চলছে। মইদুলও একটু সাবধানেই চালাচ্ছে, একে ভাঙা রাস্তা, তার ওপরে বরফের পিছল আস্তরণ।

বার বার, বারম্বার মইদুল, মইদুল করছি।

মইদুল শব্দটার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার।

মইদুল মানে, ডাক্তার মইদুল ইসলাম খান, এম বি বি এস, এম ডি, পি এইচ ডি, এফ আর সি পি। ইত্যাদি। একজন সফল এন আর বি, নন রেসিডেণ্ট বাংলাদেশি। মইদুল মানে আমার ছেলেবেলা, আমার গতজন্ম।

আজ থেকে ঠিক চল্লিশ বছর আগে, উনিশশো তেতাল্লিশ সালের জানুয়ারির দোসরা, কিংবা পরবর্তী কাছাকাছি কোনও তারিখে আমি আর মইদুল, আমরা একসঙ্গে টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী বয়েজ হাই ইংলিশ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলাম। ইস্কুলের নামের মধ্যে ওই বয়েজ কথাটা জরুরি, কারণ ঠিক ওই নামে আমাদের সেই ছোট শহরে একটা গার্লস স্কুলও ছিল. বিন্দুবাসিনী গার্লস হাই ইংলিশ স্কুল।

বিন্দুবাসিনী স্কুলে ক্লাশ থ্রি থেকে উনিশশো একান্ন সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পর্যন্ত আমি আর মইদুল একসঙ্গে পড়েছি। তবে এরও সিকি শতক আগে উনিশশো আঠারো থেকে উনিশশো ছাব্বিশ সাল, তৃতীয় শ্রেণী থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত মইদুলের বাবা ভোলা মিঞা এবং আমার বাবা জটু রায়, (এই ডাক-নামেই তাঁদের আমাদের ছোট শহরের লোকেরা চিনতেন,

এখনও মনে করতে পারেন), একসঙ্গে বিন্দুবাসিনী স্কুলে পড়েছিলেন।

ম্যাট্রিক পাশ করে আমি কলেজে পড়তে চলে আসি এই কলকাতায়, মইদুল ঢাকায়। পঁচিশ বছর পূর্বে আমাদের পিতৃদ্বয়ও যথাক্রমে তাই করেছিলেন।

ঢাকা থেকে ডাক্তারি পাশ করে যথাসময়ে মইদুল পাড়ি দেয় আমেরিকায়। এই মহানগরীর কর্দমাক্ত জলাশয়ে আমি আটকে পড়ি, আবদ্ধ হয়ে যাই।

কলেজে পড়ার সময় প্রতি বছর পুজোর ছুটিতে, গরমের ছুটিতে আমি বাড়ি যেতাম সাতান্ন সালের শেষে এম-এ পরীক্ষা পর্যন্ত। মইদুলও বাড়ি আসত। দেখা হত, কথাবার্তা হত। একেকদিন কথা ফুরোত না, রাত হয়ে যেত। খালের ওপারে কাঠের সাঁকো পেরিয়ে আমি মইদুলকে এগিয়ে দিতে যেতাম, বাড়ি পর্যন্ত পেঁৗছে, আবার মইদুল আমাকে এগিয়ে দিতে আসত। রাত বেড়ে যেত, জ্যোৎস্না কিংবা অন্ধকার ঘন হত। আমাদের মায়েরা যে যাঁর রান্নাঘরে থালায় ভাত বেড়ে হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়ে বসে থাকতেন। অবশেষে বাড়ি ফিরলে উষ্মা প্রকাশ করতেন।

অতঃপর একটু সামনের দিকে যাই।

সেটা উনিশশো পঁয়ষট্টি সাল। সেপ্টেম্বর মাস। আগস্টের মাঝামাঝি নিয়মানুযায়ী ভাদ্রমাস শুরু হয়েছে। ভাদ্রমাস শুরু হওয়ার আগেই বিজন গেল টাঙ্গাইলে আমার মাকে নিয়ে আসার জন্যে।

সেই সময়ে আমি একটা কবিতায় লিখেছিলাম, 'আমার প্রথম মেয়ে মরিয়ম সেবার জন্মাল।' আসলে মরিয়ম নয় আমার ছেলে কৃত্তিবাস ওরফে তাতাই সেবার জন্মাল। আমাদের খাস্‌ কালীঘাট বাড়িতে বাচ্চা জন্মানোর সময় মিনতির কাছে মা থাকবে সেই জন্যেই বিজন মাকে আনতে গিয়েছিল।

ব্যাপারটা খুবই ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, কিন্তু মইদুল প্রসঙ্গে মনে পড়ছে।

বিজনের সেবার গ্রহের ফের ছিল। বিজন যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধটা বেশ কিছুদিন হল অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু আমরা ভাবতাম এরকম কিছু হবে না। চারদিকে সাজ-সাজ রব, গুজব, ব্ল্যাক আউট, তারপর সীমান্তের সংঘর্ষ দুদেশের অভ্যন্তরে পেঁৗছাল, অবশেষে প্রকৃতই যুদ্ধ ঘোষণা। দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল। বিজন আটকে পড়ল টাঙ্গাইলে।

শুধু আটকে পড়া নয়। রীতিমত যুদ্ধবন্দি, পাকিস্তানের ভারতীয় পি-ও-ডাবলু, প্রিজনার অফ ওয়ার।

মার আসা হল না। এদিকে মাসের পর মাস সবরকম যাতায়াত, চিঠিপত্র, তার-ফোন বন্ধ। কিন্তু সে জন্যে তো আর গর্ভস্থ সন্তান অপেক্ষা করবে না, সে যথাসময়ে সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে কলকাতার হাসপাতালে জন্মাল।

এ খবরটা, দুর্দিনের এই সুসংবাদ কি করে জানাই মা-বাবাকে।

মইদুল তখন মিনিয়াপোলিসে থাকে। তার ঠিকানাটা কাছে ছিল। তাকে চিঠি দিলাম। সে জানিয়ে দিল টাঙ্গাইলে। তার চিঠিতেই বিজনের খবরও পেলাম।

সেই চিঠিতেই জেনেছিলাম, বাচ্চা জন্মানোর সংবাদ আমেরিকায় আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশীদের জানানোর সময় চুরুট উপহার দিতে হয়, সেই চুরুটে লেখা থাকে 'ইটস্ এ বয়', কিংবা 'ইটস্ এ গার্ল', চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নবজাতকের কল্যাণ কামনা করে সুহৃদেরা।

এই ঘটনার সাত বছর পরে ইতিহাসের অন্য এক অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধ-বাংলাদেশ স্বাধীন হল। সেখানে সবরকম যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। টানটান উত্তেজনার দিন। স্থলপথে কাদের বাহিনী টাঙ্গাইলে ঢুকছে, আকাশপথে ভারতীয় ছত্রিবাহিনী নামছে। আমার বাবা-মা, আত্মীয়জন এর কয়েকমাস আগেই কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। মইদুলের বাবা-মা টাঙ্গাইলে, শহরে থাকতে পারেননি, কাছাকাছি একটা গ্রামে।

একদিন ভরসন্ধ্যায় মইদুলের তার এল। বাবা-মা আর সবাই কে কেমন আছে জানাও। টাঙ্গাইলের মুক্তিযোদ্ধা এবং রাজনীতিকেরা যাঁরা তখনও কলকাতায়, তাঁদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম, সবাই ভালো আছে।

পুরো ব্যাপারটা বড় সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে। যে-কোনও বোকা মানুষের আত্মকথা যেমন হয়।

আপনারা যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে, কিংবা ফোন করে অথবা হার্ড পেনসিলে সংক্ষিপ্ত পত্র নিক্ষেপ করে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ভ্রমণকাহিনী লেখার ছলে আত্মকাহিনী বা রম্যরচনা লেখা অমার্জনীয় অপরাধ, তাঁদের সকলের কাছে কৃপা ভিক্ষা করে, আরেকবার একটু হালকা হই। কি করব, এ আমার স্বভাবদোষ।

তবে এবার আমার সঙ্গে আছেন ডি এল রায় আর সুকুমার রায়।

এই সূত্রে আমার নিজের একটা গোলমেলে পুরনো গল্পের উল্লেখ করি।

গল্পটা অকারণে মারাত্মক।

এই কিছুদিন আগেও এক দৈনিক পত্রিকায় চিঠিপত্রের কলমে দেখলাম গল্পটির উল্লেখ করে পত্রলেখক আমার জবাবদিহি চেয়েছেন।

গল্পটা বলে ফেলাই ভাল। পুরনো কাসুন্দি, পুরনো মদ, পুরনো স্ত্রীর মতই পুরনো গল্পও ফেলনা নয়।

অনেকদিন আগের কথা। এক বিদেশি ভদ্রলোক, সংস্কৃতির ব্যাপারি, কলকাতায় এসে বেশ কিছুদিন ছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তা ছাড়া চর্চার দৌলতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুকুমার রায়, ডি এল রায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এমন অনেক রায় উপাধিধারীর নামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

অবশেষে কেমন করে যেন আমার সঙ্গেও তাঁর দেখা হয় এবং হৃদ্যতার সূত্রপাত হয়। তিনি আমিও রায় জেনে আমাকে কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের এই কলকাতা-শহরে এত রায় এল কোথা থেকে?'

এই প্রশ্নের পর আমি কিছুই উত্তর না দিয়ে ওই সাহেবকে একটা ট্যাক্সি

করে হাজরার মোড়ে আমাদের পুরনো পাড়ায় নিয়ে যাই। সেখানে পাশেই একটা গলিতে আমার এক জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্রের লেদ মেশিনের কারখানা, বলা বাহুল্য কারখানার নাম, 'রায় ম্যানুফাকচারিং কোম্পানি'। টিনের সাইনবোর্ডে হরফে বড় বড় করে লেখা।

সাহেবকে সেই সাইনবোর্ড দেখিয়ে বললাম, 'ওই দ্যাখো, কোথা থেকে এত রায় আসে, বুঝতে পারছ?'

এখানে ডি এল রায় এবং সুকুমার রায়কে উল্লেখ করেছি অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

মইদুলের স্ত্রীর নাম এরিকা। এরিকার সঙ্গে তার আমেরিকাতেই প্রণয় ও পরিণয়।

আমি কিন্তু শ্রীমতী এরিকাকে দেখে প্রথমে বেশ একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। কলকাতায় আমার বন্ধুপত্নীরা রোগা (তখনও), ফরসা ছোটখাট। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জবানিতে ছোট পরিবার, সুখী পরিবার, সাবেকি অর্থে পরিবার মানে স্ত্রী।

জার্মান বংশোদ্ভবা এরিকা স্বাস্থ্যবতী, দীর্ঘাঙ্গিনী। একেবারে যাকে বলে গাট্টাগোট্টা, তাই। বাঙালি মাপে মইদুল বেশ লম্বা, সুন্দর এবং সুদেহী। এরিকাও সুন্দরী, বেশ বড়সড় সুন্দরী।

তবে আমি এরিকাকে দেখে ঠিক থতমত খাইনি। আমি ভড়কে গিয়েছিলাম তার ভাইদের দেখে। এরিকার সাত ভাই। লম্বাচওড়া, হৃষ্টপুষ্ট, দশাসই চেহারা। কলকাতা শহরের পথে ওরকম একজনা রাস্তায় হাঁটলে পথচারীরা মাথা ঘুরিয়ে তাকাবে।

আর এখানে একজন নয়। পরপর সাতজন। জার্মানির বাভারিয়া জেলার দানিয়ুব অঞ্চলের লোক। ওদের দেখে মনে হল দানো শব্দটা দানিয়ুব থেকে এসেছে। একেকজনের হাতের গোছার বেড় আমাদের উরুর সমান, উচ্চতা ছয়ফুট ছাড়িয়ে। যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানির বাভারিয়া থেকে শিশুকালে পরিবারের সকলে চলে এসেছে উত্তরোত্তর আমেরিকার বাটাভিয়ায়।

এরিকাসহ ভাই সাতজনই হাসিখুশি, আমুদে এবং প্রাণোচ্ছল। তবে তাদের কথা বোঝা দায়।

আমাকে দেখে গাঁক গাঁক করে উচ্ছ্বসিত হয়ে তারা সরব অভ্যর্থনা জানাল। কি বলল ঠিক বুঝতে পারলাম না, তবে অনুমান করতে অসুবিধে হল না যে, তারা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা এবং স্বাগতম জানাচ্ছে।

মইদুলের এই সাত না আট শালাকে দেখে যতটা আতঙ্ক হয়েছিল এখন ওদের হাবভাব, আচার-আচরণে একটু আমোদই হল।

ডি. এল. রায় লিখেছিলেন না আট শালার কথা। সেই যে যেদিন সুনীল জলদি হইতে-র দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। মনে আছে, আপনাদের মনে আছে ডি. এল. রায়কে। আমি তো কেমন ভুলে গেছি।

ভয়ে ভয়ে আট শালার উদ্ধৃতিটা দিচ্ছি। ভুল হতে পারে। সম্প্রতি

বাসাবদলের সময় বইটই সব অগোছালো, অবিন্যস্ত হয়ে গেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলি খুঁজে পাচ্ছি না, মিলিয়ে দেখার উপায় নেই, কিন্তু আবছা আবছা মনে পড়ছে যেন,

'সেই যে আমার আট মামায়
মানে বাবার আট শালায়
ভর্তি করে দিলে আমায়
হরি ঘোষের পাঠশালায়।'

এদের দেখে মইদুলকে এই পংক্তি দুটো শোনাতে সে হেসে ফেলল। মইদুলের শালারা কিন্তু বুঝতে পারল তাদের সম্বন্ধেই কিছু বলেছি, তারা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তবে বিশেষ জোরজবরদস্তি করল না কি বলেছি সেটা বোঝানোর জন্যে। অবশ্য জবরদস্তি করলেও কিছু বোঝাতে পারতাম না, এই তরল সোনা আমেরিকান ছাঁচে ঢালবার কারিগরি বিদ্যা আমার নেই।

কিন্তু আমার সবচেয়ে সহায় হলেন মহামতি সুকুমার রায়। জীবনের বহু বিচিত্র ও জটিল মুহূর্তে তিনি আমার সহায় হয়েছেন, বিপদের মুখে বেদমন্ত্রের মতো অভ্রান্ত তাঁর বাক্যমালা আমাকে মনোবল জুগিয়েছে।

হঠাৎই মনে পড়ে গেল আবোল তাবোলের লড়াই ক্ষ্যাপার কথা, মইদুলকে বললাম,

...ফাঁদ পেতেছ ?
জগাই কি তায় পড়ে ?
সাত জার্মান, জগাই একা,
তবুও জগাই লড়ে।'

দেখলাম মইদুলের কুড়ি বছর হিম প্রবাসে ডাক্তারি করার পর এখনও পরিষ্কার ঝরঝরে মনে আছে সুকুমার রায়, সে একটু হেসে আমাকে শুনিয়ে দিল,

...'শোন রে জগাই,
ভীষণ লড়াই হল।
পাঁচ ব্যাটাকে খতম করে
জগাই দাদা ম'ল।'

কিন্তু স্বীকার করা ভাল ব্যাপারটা একেবারেই বিপজ্জনক হয়নি। এরা সবাই সজ্জন, পরিশ্রমী যুবক, দিলখোলা চরিত্রের। এদের পদভরে মেদিনীসহ মইদুলের ছবির মতো সুন্দর বাংলো কম্পিত হচ্ছে। ছুটির দিনের সকালে তারা বোনের বাড়িতে এসেছে, তাদের জামাইবাবুর বন্ধু আসছে স্বস্তিকাচিহ্নের দেশ ভারতবর্ষ থেকে।

একটু পরে চা-জলখাবার দিল এরিকা। নোটবুকে দেখছি বাখরখানি লেখা আছে, ঢাকাই বাখরখানি। স্মরণ হচ্ছে, ঠিক বাখরখানি নয়, তবে ওই রকমই মুচমুচে এবং নোনতা একটা পরোটা-জাতীয় খাদ্যদ্রব্য বিশাল একটা

কাগজের প্যাকেটে করে এরিকার এক ভাই নিয়ে এসেছিল। ছবিটা দেখছি মনে আছে, একটু আগে আকাশ ঘোলা হয়ে আবার বরফ পড়া শুরু হয়েছে, দীর্ঘদেহী যুবকটির হাতে বিশাল ঠোঙা, তার চুলে, উইণ্ড চিটারে বরফের গুঁড়ো, সে হাসতে হাসতে আসছে।

প্রাতরাশের পর মইদুল আমাকে নিয়ে তার গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়ল। এদের এ অঞ্চলে তুষারপাত আমাদের বৃষ্টিপাতের মতো। এটা কোনও দুর্যোগ নয়।

বাটাভিয়া ছোট শহর। ছড়ানো, ছিটোনো, ফিটফাট ছবির মতো শহর। নিউ ইয়র্ক রাজ্যের একেবারে শেষ সীমায়। কানাডার টরণ্টো নগর এখান থেকে হাইওয়েতে এক ঘণ্টার পথ। এখানে আরও একটা বড় শহর কাছে আছে। নাম লণ্ডন।

কিন্তু এ লণ্ডন সে লণ্ডন নয়। উত্তর আমেরিকার এই এক মজা। ক্রমাগত নতুন নতুন বসতি স্থাপন করতে গিয়ে তারা নামের ঝুলি উজাড় করে ফেলেছে। পৃথিবীর নানা জায়গার খ্যাত অখ্যাত নাম ব্যবহার করছে। এই যে বাটাভিয়া শহর, এর নামটাও এসেছে ইন্দোনেশিয়া থেকে, আমাদের দেশে বাতাবি লেবু কথাটাই বাটাভিয়া থেকে, বাটাভিয়ায় উৎপন্ন লেবু। শুনেছি আমেরিকায় ঢাকা, ক্যালকাটাও নাকি আছে। হঠাৎ চিঠি গোলমাল হয়ে গেলে শুধু শুধু ডাক বিভাগের ঝামেলা বাড়ানো।

সে সময়ে মইদুলের এক দশকের বেশি বাটাভিয়ায় বাস হয়েছে। জনপ্রিয় ডাক্তার, হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞ ডক্টর খান বলে সবাই এক নামে চেনে, মান্য করে।

মইদুল তার কর্মস্থলে নিয়ে গেল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চেম্বার। সঙ্গে কয়েকটি বেডের নার্সিং হোম, শুধু গুরুতর রোগীদের জন্যে।

কোনও রোগী এলে তাঁকে প্রথমে সামনের ঘরে সহকারিণীর সম্মুখীন হতে হয়। মহিলা বিশদভাবে সব শোনেন এবং কার্ডে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেন। তাতে শুধু বর্তমান উপসর্গই নয়, রোগীর মানসিক ও শারীরিক ধারাবাহিক ইতিহাস, পূর্বপুরুষদের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত, কি চিকিৎসা করিয়েছেন, কি ওষুধ খাচ্ছেন সব কিছু লেখার জন্যে নির্ধারিত ঘর আছে।

রোগী ডাক্তারের কাছে পৌঁছনোর পর ডাক্তার সেই বিবরণী খুঁটিয়ে দেখেন, তারপর সব রকম পরীক্ষা। ডাক্তারের চোখের সামনেই দেওয়ালে টিভি সার্কিটে অন্দরস্থ রোগীদের হৃদস্পন্দনের তাৎক্ষণিক ছবি ফুটে উঠছে। রোগী দেখতে দেখতেই ডাক্তার সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন সেদিকে।

শুধু সেখানেই নয়, চলন্ত গাড়িতে এবং বাসাতেও নিরন্তর মনিটরিং চলছে দূরভাষ যন্ত্রের মাধ্যমে। ডাক্তারের মনোযোগে বিরতির অবকাশ নেই। তবু হৃদরোগে সহস্র সহস্র আমেরিকান দিনের পর দিন মারা যাচ্ছে।

খুব সোজা করে মইদুল ব্যাপারটা আমাকে বলেছিল, 'এরা মারা যাচ্ছে খাওয়ার দোষে। বেশি খেয়ে, বেশি মোটা হয়ে রক্তে চর্বি জমে দম বন্ধ হয়ে মরে যাচ্ছে।'

দুপুরে মইদুলের শ্যালকদের সঙ্গে তিনটে গাড়িতে ভাগ হয়ে মধ্যাহ্নভোজন করতে গেলাম অনেক দূরে হাইওয়ের পাশে এক নির্জন ফাস্ট ফুড সেণ্টারে। চিরকাল ছবিতে যেমন দেখেছি ঘরের ছাদে তুষার, গাছের পাতায় তুষার। সাহেবরা যাকে বলে হোয়াইট ক্রিস্টমাস, সাদা বড়দিন। যদিও বড়দিন এর এক মাস আগে চলে গেছে।

সেই বরফ জমা হিমশীতল দিনে এরিকা আর ভাইয়েরা মনের সুখে ঠাণ্ডা মাংস আর ভরপেট আইসক্রিম খেল।

আমি, মইদুল আর মইদুলের ছেলে মুনির, মুনির ইসলাম খান, তখন তার বয়েস আট বছর আমরা এই তিনজনে গরম গরম সুপ, মাংসভাজা আর রুটিকাঠি খেলাম।

পঁচিশ

বরফ থেকে বেরিয়ে

কেউ বলে পৃথিবী শেষ হবে আগুনে,
কেউ বলে বরফে,
আমি যা দেখেছি
তাতে আমি আগুনেরই দলে।

—রবার্ট ফ্রস্ট

মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে ফিরবার পথে মইদুল আমাকে একটা বাজারে নিয়ে গেল। ছোট শহরের সীমান্তে ছোট সুপার বাজার। কিন্তু সেখানে পাওয়া যায় না এমন কোনও জিনিস নেই। আমার জন্যে ঘুরে ঘুরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে অনেক দামি দামি জিনিস কিনল মইদুল, সেই সঙ্গে একটা সুদৃশ্য চেনওয়ালা ব্যাগ, যাতে ওই জিনিসগুলো নিয়ে যেতে অসুবিধে না হয়।

এ দেশে এসে আমি উপহার পেলাম অনেক। এর আগে যথাস্থানে সে সব বলেছি, কিন্তু তার মধ্যে অনেক কিছুই বাদ পড়ে গেছে। অ্যালেন গিনসবার্গের কথাই বলা হয়নি। অ্যালেন তাঁর নিজের সমস্ত বই, অনেকগুলিই একাধিক কপি করে, সেই সঙ্গে অন্যের বই, পত্রপত্রিকা ঘরে যা কিছু ছিল উজাড় করে আমাকে দিয়েছিলেন। পিটার হুমড়ি খেয়ে ঘরের কোনা থেকে, টেবিলের নীচে থেকে হাতড়ে হাতড়ে বই পত্রিকা খুঁজে বার করে এনে অ্যালেনের হাতে দিচ্ছেন, সেটা দেখে বাছাই করে অ্যালেন আমার হাতে একে একে তুলে দিচ্ছেন, ছবিটা মনে আছে।

সেই সমস্ত বই দুটো বড় কাগজের বাক্সে ভরে নিউ ইয়র্ক থেকেই জাহাজ-ডাকে পাঠিয়েছিলাম। কলকাতায় ফিরে এসে যখন দেখলাম সেগুলো আসেনি ধরে নিয়েছিলাম হারিয়ে গেছে। কিন্তু হারায়নি, জাহাজ-ডাক বেশ দেরি করেই আসে। বেশ কিছুদিন পরে বইগুলো এসেছিল।

কিন্তু এসবের বিনিময়ে আমি কি দিয়েছিলাম, তাতাইয়ের আঁকা অনিত্য ছবি, রাইটার্স ওয়ার্কশপ কৃত ইংরেজি অনুবাদে আমার সামান্য কাব্যগ্রন্থ, বড়জোর তালপাতার বাঁশি কিংবা শস্তার ধূপকাঠি, পেতলের ছোট গণেশ-মূর্তি।

তবে মইদুলের জন্যে নিয়ে গিয়েছিলাম, বারো বছর আগে প্রকাশিত আমার সেই ব্যক্তিগত মুক্তিযুদ্ধের দলিল, 'ছিলাম ভালোবাসার নীলপতাকা তলে স্বাধীন।'

আমার এই স্বল্পপঠিত কবিতার বইটি যুগ্মভাবে আমি উৎসর্গ করে-ছিলাম আমার দুই জন্মের দুই বন্ধু মইদুল এবং সুধেন্দুকে, এখন মাননীয় বিচারপতি শ্রীসুধেন্দুনাথ মল্লিক।

মইদুল কলকাতায় আমাদের বাড়ির প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা করে প্রচুর জিনিস দিয়েছিল, তার মধ্যে একটি স্টারলিং সিলভার পার্কার কলম, সেই কলমে এখনও লিখছি, এই রচনাও সেই স্টারলিং সিলভারে লেখা। কলম আমার খুব প্রিয় জিনিস, আমার হারেমে বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন দেশের নবীনা-প্রাচীনা, তন্বী-পৃথুলা, কালো-সাদা বিস্তর লেখনী-সুন্দরী রয়েছে। সুতরাং একটু গলা নিচু করে বলি এদের মধ্যে ওই স্টারলিং সিলভার শ্রীমতী পার্কারকেই আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ।

কিন্তু শুধু প্রিয়তমা পার্কার নয়, বাটাভিয়ার অন্য একটি উপহার আমার তোরঙ্গে আমি যত্নে রেখে দিয়েছি। সেটি মইদুলের ছেলে শ্রীমান মুনিরের আঁকা আত্মপ্রতিকৃতি। লাল নীল পেন্সিলে ছোট একটুকরো কাগজে আট বছরের বালকের সেই ছবি, তার নীচে নিজের সই, ইংরেজিতে মুনির লেখা—সেও আমার কাছে কম মূল্যবান নয়।

সুপার মার্কেট থেকে ফিরে এসে ঠিক ছিল মইদুল আমাকে নিয়ে বেরোবে। পাড়াপ্রতিবেশীদের সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় হবে, আড্ডা-মজলিশ হবে।

কিন্তু সেটা সম্ভব হল না।

বিকেলের পর থেকে ঘনাতিঘন তুষারপাত শুরু হল। সে এক নিঃশব্দ শ্বেতসন্ত্রাস। মইদুল আর এরিনার সঙ্গে দোতলায় হলঘরে বসে চা খেতে খেতে আমি কাচের জানলার বাইরে বরফ পড়া দেখছিলাম। আগামীকাল নিউ অরলিনস চলে যাব, সেখান থেকে পশ্চিম উপকূলে, সে সব জায়গায় এ সুযোগ পাব না। আর আমি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গরিব মানুষ, আমার জীবনে বরফ দেখার সুযোগ কোথায়? সামান্য যা সুযোগ ছিল শিলং, দার্জিলিং বা কাশ্মীরে সেও তো গোলমালে ভরা। প্রাণ হাতে নিয়ে সে দৃশ্য উপভোগ করা যথার্থ কঠিন।

সে দিন সারা রাত আকাশ উজাড় করে তুষার ঝরে পড়েছিল। জানলার কাচ প্রথমে ঝাপসা তারপর একদম সাদা হয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

মুনির এতক্ষণ কিঞ্চিৎ ব্যবধান রেখে সমীহ ও সম্ভ্রমভরে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে ঘনিয়ে এল।

আমি তাকে এই তুষারতাড়িত জগৎ থেকে বহু দূরে এক ঘনশ্যাম বৃষ্টি-বিহ্বল পৃথিবীর কথা বললাম, যেখানে তার পৈতৃক নিবাস।

এই রকম শীতের সন্ধ্যাবেলায় যেখানে বাড়ির পিছনের পুকুর থেকে হাঁসেরা চই-চই ডাক শুনে দল বেঁধে উঠে আসে, প্যাঁক-প্যাঁক করতে করতে তারা তাদের বাঁশের খাঁচায় রাতের নিশ্চিত আশ্রয়ে চলে যায়। পুকুরের নিস্তরঙ্গ জলে আর তার ওপরে আকাশের তারার ছায়া, নীল কুয়াশা আর টলমল জোনাকি, সুপুরির সারির ফাঁক দিয়ে এক টুকরো চাঁদ ওঠে আকাশে, আর ঠিক তারই আগে পর পর চারটে শেয়াল পুকুরঘাটের পাশে বাবু হয়ে বসে সুপুরি গাছের ফাঁকে যেখানে চাঁদটা উঠতে যাচ্ছে সে দিকে কটমট করে

তাকিয়ে ক্রমাগত চেঁচিয়ে যায়, 'কি হচ্ছেটা কি, কি হচ্ছেটা কি?'

রূপকথা হলেও সত্যি এই কাহিনী শুনতে শুনতে নব প্রজন্মের মার্কিন শিশু সোফার ওপরে আমার কোলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তাকে ঘুম থেকে তুলে ঘুম চোখে খাইয়ে আবার শোয়ানো সেই একই পরিচিত দৃশ্যাবলি এরিকার সৌজন্যে আবার দেখলাম। বুঝলাম মাতৃলীলা সর্বত্র একই রকম।

পর দিন সকালে শিশুলীলা দেখলাম।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি বরফ পড়া বন্ধ হয়েছে, যেমন আমাদের এখানে হয়, সারা রাত অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শেষে হঠাৎ ভোরবেলা উঠে দেখি মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, আম গাছের ভেজা সবুজ পাতায় ঝলমল করছে প্রভাতকিরণ।

এ ক্ষেত্রে আমাদের খুশি হওয়া, আহ্লাদিত হওয়া ছাড়া কিছু করার নেই, কিন্তু বরফের দেশে কিঞ্চিৎ কায়িক পরিশ্রম প্রয়োজন।

সদর দরজা খোলা যাচ্ছে না, দরজার বাইরে বরফ জমে স্তূপাকার হয়ে আছে, হাজার ঠেললেও দরজা খুলবে না। গ্যারেজের দরজাও তাই, সে দরজা খোলা যাবে না বরফপুঞ্জ না সরিয়ে। তা ছাড়া ওই যাকে বলে ড্রাইভওয়ে মানে উঠোন থেকে বড় সড়কে ওঠার রাস্তা, সেও তো তুষারে তুষারে ধূল পরিমাণ।

এই পুঞ্জীভূত, দ্রবীভূত শৈত্যের হাত থেকে পরিত্রাণের সহজতম এবং প্রাচীনতম উপায় কোদাল।

মইদুলদের বাড়িতে কোদালের অভাব নেই।

মইদুলের জন্যে স্ট্যান্ডার্ড কোদাল। সাত কিংবা আট নম্বর সাইজ। জুতো কিংবা গেঞ্জির মতো এই বরফের রাজ্যে কোদালেরও সাইজ নম্বর আছে।

বাল্যলীলার কথা বলেছিলাম। দেখলাম ছোট একটা কোদাল হাতে মুনিরের কীর্তি, বাপের পাশে দাঁড়িয়ে দ্রুতবেগে কোদাল চালিয়ে বরফ কাটছে।

যেমন হয়, এরিকার বাথরুমে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, সে যখন বেরোল তার রণরঙ্গিনী মূর্তি, স্কার্ফ দিয়ে মাথা ও কান ঢাকা। পায়ে গামবুটের মত কি একটা জিনিস। হাতে রঙিন কোদাল, সেটা নাকি লেডিস কোদাল। কোদালের ফলা নীচের দিকে রক্তলাল, ওপরের দিক আকাশনীল। কাঠের হাতলে রামধনুকের সাত রং।

আমার ভাগ্যেও একটা কোদাল জুটেছিল, সেটা গেস্ট স্পেড। কিন্তু সেটা নিশ্চয় এরিকার ভাইদের কারও জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। জিনিসটির ওজন অন্তত দেড় মণ, লম্বা সাড়ে চার ফুট। এরিকার প্রশ্রয়ে সেই অতিকায় কোদালটি হাতে নিয়ে আমিও নেমে পড়লাম বরফ কাটতে। ওই ভারী কোদাল দিয়ে অনভ্যস্ত হাতে বরফ কাটতে আমার সুবিধে হচ্ছিল না। আর ইংরেজি প্রবাদে যতই বলুক কোদালকে কোদাল, ওই অতিকায় বস্তুটিকে আমি কিছুতেই কোদাল বলতে পারছিলাম না।

সে যা হোক, সমবেত প্রচেষ্টায় বরফ সাফ হল। মইদ্দুলের গাড়ি করে বেরিয়ে তার সঙ্গে তার নার্সিংহোম থেকে একটু ঘুরে এলাম।

তারপর সারা দিন বসে টানা গল্প। স্মৃতি ও বর্তমান বিচরণ। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর একটু বিশ্রাম করে মইদুল আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাফালো বিমানবন্দরের উদ্দেশে।

নিউ ইয়র্কের লা গার্ডিয়া বিমানবন্দর থেকে এসেছিলাম আমেরিকান এয়ারলাইনসের প্লেনে। এবার আমার টিকিট ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের। এখন থেকে যাব আটলান্টা, সেখানে বিমান বদল করতে হবে। আটলান্টায় আমি থাকব না, স্বল্প সময় বিরতির পরে ডেলটা কোম্পানির বিমানে যাব নিউ অরলিনসে। আপাতত সেটাই আমার গন্তব্য।

নিউ অরলিনসে বেশি নয়, চার-পাঁচ দিন থাকতে হবে। সোমবার গভীর রাতে পৌঁছলাম, বেরিয়ে এলাম বৃহস্পতিবার সকালে। এর মধ্যে এক দিন আবার যাবে মর্গান সিটিতে, সেখানে গ্রাম দেখতে যাব, এবং সেটা পরের দিনই, মঙ্গলবার।

নিউ অরলিনস মার্কিন যুক্তরাজ্যে দক্ষিণ উপকূলের লুইসানিয়া রাজ্যের মুখ্য শহর। ভূগোল-বিদিত মিসিসিপি নদীর দেশ এটা।

কলকাতার থেকে সামান্য বয়েসে ছোট এই শহর ফরাসিরা স্থাপন করেছিল আঠারো শতকের গোড়ার দিকে। এখনও এর ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের আকর্ষণে সারা পৃথিবী থেকে ভ্রমণকারীরা এখানে ভিড় করেন। গত শতকে মার্ক টোয়েন ছিলেন এ শহরে অনেক দিন।

কয়েক বছর আগে কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণে এসে নিউ অরলিনস শহরে বেশ কিছু দিন ছিলেন। এই শহরের মেয়র সমরেন্দ্রকে এক সামাজিক অনুষ্ঠানে নিউ অরলিনসের নাগরিক হিসেবে অভিষিক্ত করেন এবং শহরের একটি চাবি তাঁকে উপহার দেন।

নিউ অরলিনস মিসিসিপি নদীর তীরে, পণ্টচারটরেইন হ্রদের ধারে যত্নে গড়ে ওঠা চমৎকার শহর। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেখাপড়া, আমোদপ্রমোদ সব কিছুতে উচ্ছল নিউ অরলিনস।

শহরের নামকরণ ফরাসিরা করেছিল ডিউক অফ অরলিনসের সম্মানে। পরে মার্কিন যুক্তরাজ্যে প্রবেশের আগে হাতবদল হয়ে জায়গাটা স্প্যানিশদের হাতে চলে যায়।

মার্কিন দেশের সবচেয়ে বড় বন্দর শহরগুলির মধ্যে নিউ অরলিনস একটা। খ্যাতনামা বাণিজ্য ও উৎপাদন কেন্দ্র, ও দেশের বৃহত্তম তুলোর বাজার এখানে, চিনি ও তেল পরিশোধনের বড় বড় কারখানা শহর ও শহরতলিতে।

কিন্তু সেটা একদিকের ব্যাপার। অন্যদিকে খোলামেলা পুরনো ধাঁচের শহরের পাশে গড়ে উঠেছে নতুন ঝলমলে নিউ অরলিনস। তবে শহরের কোনও

কোনও অঞ্চলে বিশেষ করে ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারে শাসনকর্তাদের বিনা অনুমতিতে নতুন বাড়ি বানানো বা পুরনো বাড়ি অদলবদল করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শহরের প্রাচীন ঐতিহ্যকে যথাসাধ্য ধরে রাখার প্রয়াস এখানে স্পষ্ট। উরসুলিনস স্ট্রিট বলে একটা রাস্তায় গিয়েছিলাম যে রাস্তা গত একশো বছরে একটুও বদলায়নি। সেই কালো ইট বসানো কবলড্ রোড, পাশে লম্বা সারি দেওয়া বারান্দাওলা টানা একতলা বাড়ি। কোনওটার ছাদে চারচালা নিচু ঘর।

কলকাতার মতোই নিউ অরলিনসে এখনও ট্রামগাড়ি রয়েছে, এরা বলে স্ট্রিট কার। প্রত্যেকটা স্ট্রিট কারের আলাদা আলাদা সুন্দর নাম রয়েছে। একটা গাড়ির নাম তো টেনেসি উইলিয়ামসের সৌজন্যে সারা পৃথিবীর লোক জানে একটা হলিউডি সিনেমার দৌলতে। কামনা নাম্নী এক সড়ক-শকটী। 'এ স্ট্রিট কার নেমড ডিসায়ার', একদা ভুবনবিখ্যাত হয়েছিল।

শুনেছিলাম কামনা নামের গাড়িটি এখনও রাস্তায় চলে। আমার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। আমার দেখা হয়েছিল বেদনা ও স্মৃতির সঙ্গে। স্মৃতির রথে আমি উঠেও ছিলাম।

নিউ অরলিনসে আমি ছিলাম একেবারে শহরের প্রাণকেন্দ্র ক্যানাল স্ট্রিটে ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে। তার সামনেই সেন্ট চার্লস অ্যাভিনিউ দিয়ে স্ট্রিট কার যায়। যতদূর মনে পড়ছে ওই একটা রাস্তাতেই তখন স্ট্রিট কার চলত।

স্ট্রিট কার চড়ার কিন্তু বায়নাক্কা অনেক। তিরিশ সেন্ট ভাড়া, বাঁধা ভাড়া, দূরত্ব কম বেশির সঙ্গে ভাড়া কম বেশি নেই। খুচরো তিরিশ সেন্ট হাতে নিয়ে উঠতে হবে। দরজায় পয়সা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে। এক দরজা দিয়ে ওঠা, আরেক দরজা দিয়ে নামা।

এই স্ট্রিট কারে চড়ে তুলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম বুধবার দিন, পয়লা ফেব্রুয়ারি। আগের দিন ছিলাম মর্গান সিটিতে।

তুলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পিটার কুলির বিষয় হল ক্রিয়েটিভ রাইটিং। ভিজিটর প্রোগ্রাম সার্ভিসের সূত্রে তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর ক্লাশ শুনতে। সেদিনের বিষয় ছিল দক্ষিণ-উত্তর আমেরিকার এবং উত্তর আমেরিকার মহিলা ঔপন্যাসিকদের গৃহসজ্জা বর্ণনার তুলনামূলক আলোচনা। এ বিষয়ে আমার কোনও জ্ঞান নেই, কৌতূহল নেই। রামকৃষ্ণই তো বলেছিলেন, 'বিষয় না বিষ', পুরো এক ঘণ্টা শ্রেণীকক্ষে বন্দি হয়ে থেকে সে দিন মহাপুরুষের এই আপ্তবাক্য অনুধাবন করতে পেরেছিলাম।

শ্রেণীকক্ষে কফি পানের বন্দোবস্ত রয়েছে। তবে নিজে করে খেতে হয়, নিজের পয়সা দিয়ে। ঘরের এক কোনায়, একটা নিচু টেবিলে ইলেকট্রিক কেটলিতে গরম জল, পাশে কফির কৌটো, চিনির কিউবের বাক্স, দুধের বাটি রয়েছে। আর সামনে রয়েছে একটি তোবড়ানো টিনের মুখ খোলা কৌটো। তার মধ্যে পঞ্চাশ সেন্টের একটা কয়েন ফেলতে হবে নিজের পেয়ালায় কফি ঢালার আগে। মনে হল অধ্যাপক সাহেবের কড়া নজর রয়েছে এ দিকে। হয়তো এটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবসাও হতে পারে।

ব্যবসার কথা থাক। আনন্দের কথা বলি।

আমার সৌভাগ্য আমি মারদিগ্রাসের সময় নিউ অরলিনসে ছিলাম।

মারদিগ্রাস আমাদের দুর্গাপুজোর উৎসবের সঙ্গে তুলনীয়। কলকাতার শারদীয় উচ্ছলতা 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' ম্যাগাজিনের দৃষ্টি আজও আকর্ষণ করেনি কিন্তু মারদিগ্রাসকে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বলেছিল বিশ্বের গ্রেটেস্ট শো, ফ্রি শো, তার কারণ দেখতে পয়সা লাগে না। প্রকাশ্য রাজপথে শোভাযাত্রা বেরোয়।

বিচিত্র, বর্ণাঢ্য পোশাকে উজ্জ্বল সেই শোভাযাত্রা দেখে আমাদের বিজয়া দশমীর প্রতিমা বিসর্জনের কথা মনে পড়ল। ওই একই রকম হইচই, গীতবাদ্য।

এমনিতেই নিউ অরলিনস গীতবাদ্যের জন্যে বিখ্যাত। সমঝদার লোকেরা এই শহরের নামকরণ করেছেন জাজ সঙ্গীতের বাসভূমি। কোনও জাজবাদকই সমাজে কলকে পাবে না যদি না নিউ অরলিনস তাকে পাত্তা দেয়।

পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের এমনকি ভারতের জাজবাদকদের স্বপ্নশহর হল নিউ অরলিনস। দু-একজন বহুকাল ধরে রয়ে গেছেন। এক বৃদ্ধের সঙ্গে পরিচয় হল। সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে আছেন, গোয়া থেকে এসেছিলেন, আমাদেরই মত ভারতীয় চেহারা, তবে পর্তুগিজ নাম, কার্ভালো না গঞ্জালো, কি যেন।

নিউ অরলিনসের মারদিগ্রাস উৎসবের উদ্যোক্তা হল কয়েকটি কারনিভাল সোসাইটি। এগুলি অনেকটা আমাদের সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির মতো কিন্তু সব সদস্য পুরুষ। তবে এখন নাকি গোপনে কিছু কিছু মহিলাকেও সদস্য করা হচ্ছে। সর্বজনীন হলেও সদস্যদের নামধামের ব্যাপারে যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। আমাদের মত পুজো সুভেনিরের প্রথম পৃষ্ঠায় নামের দীর্ঘ তালিকা থাকে না।

পথের শোভাযাত্রা যে কেউ দেখতে পারেন কিন্তু এদের যে বলা হয় সেখানে প্রবেশ অবাধ নয়, শুধু সদস্য ও তার পরিবার যেতে পারে, খুব বিশেষ ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত মান্যজন বা বিদেশি কেউ।

মারদিগ্রাসের কারনিভালের শেষ কথা হল রাজা ও রানি নির্বাচন। পুরনো কারনিভাল সমিতিগুলো যাঁদের নির্বাচন করে তাঁরা নিজেরা বিশেষ সম্মানিত বোধ করেন, সারা জীবন গর্ব করে এই ঘটনা স্মরণ করেন, উল্লেখ করেন।

রাজা-রানি নির্বাচনে অবশ্য আর্থিক সচ্ছলতার থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় বংশমর্যাদাকে, সামাজিক কৃতিত্বকে। এই সব রাজা-রানি সাধারণত নির্বাচিত হয় বংশ মর্যাদা ও ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাচীন পরিবারগুলো থেকে।

মারদিগ্রাস চলে বহুদিন ধরে। শুরু বড়দিনের পরেই কিন্তু আসল পালা শুরু হয় জানুয়ারির শেষে, চলে ফেব্রুয়ারির প্রথম পর্যন্ত। খ্রিস্টীয় পার্বণ অ্যাশ ওয়েডনেসডে'র আগের দিনকে বলা হয় ফ্যাট টুইসডে, সেই মোটা মঙ্গলবারই মারদিগ্রাসের তিথি।

দুর্গাপুজোর মতোই চারদিন শনি রবি সোম মঙ্গল প্রায় কোনও কাজ হয় না। একটা ব্যাঙ্কের তালা বন্ধ দরজায় হাতে লেখা নোটিস দেখলাম, 'বিশেষ যদি দরকার হয়, সামনের অমুক নম্বর বাড়ির দোতলায় ক্যাশিয়ার সাহেবের বাসা, সেখানে যোগাযোগ করুন।'

আরেকটা জিনিস দেখলাম। কিংবা বলা উচিত, শুনলাম।

কলকাতার মতোই মাইকে মাঝে মাঝে কি সব যেন ঘোষণা হচ্ছে। একে মাইকের বজ্রনির্ঘোষ, তদুপরি মার্কিনের দাক্ষিণদেশি উচ্চারণ, যার মধ্যে ফরাসিদের, স্প্যানিশদের এবং কালোদের জিভ জড়িয়ে রয়েছে, আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শোনার পরে বুঝতে পারলাম মোটামুটি হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশের ঘোষণা, নিরুদ্দিষ্টের প্রতি নির্দেশ, তা ছাড়া দু-একটা বিজ্ঞাপনও রয়েছে বলে মনে হল, কিছু খুচরো রসিকতা এবং সর্বোপরি রয়েছে ট্রাফিক বিজ্ঞপ্তি—নেপোলিয়ন অ্যাভিনিউ থেকে ক্যানাল স্ট্রিট পর্যন্ত স্ট্রিট কার বিকেল পাঁচটা থেকে বন্ধ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এরই মধ্যে শুনতে পেলাম কলকাতা নগরোচিত একটি ঘোষণা, 'জুলিয়া, জুলিয়া মার্কস, তুমি যেখানেই থাকো এখনই মোড়ের মাথায় লিও মিলারের দোকানের সামনে চলে যাও, সেখানে তোমার বাবা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

আমার পাশেই একটি ছোট সাত আট বছরের টুকটুকে মেয়ে চোখ গোল গোল করে বিশেষ মনোযোগ সহকারে শোভাযাত্রা দেখছিল। তার পরনে উৎসবের দিনের পোশাক—সোনালি গাউন, ফুলকাটা গোলাপি স্কার্ফ, মাথায় চুলে লাল রিবন।

এই ঘোষণা শুনে সে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। তারপর একটু ফিক করে হেসে আমাকে দেখতে পেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এই যাঃ, আবার আমি হারিয়ে গেলাম।

এই বলে সে ভিড় ঠেলে মোড়ের দিকে ছুট লাগাল।

ছাব্বিশ

আচাফালায়া বনাম মর্গান সিটি

'আমি লুইসানিয়ায় দেখেছিলাম
এক জীবন্ত ওকগাছ বড় হচ্ছে,
সে একা দাঁড়িয়ে আছে
তার ডাল থেকে ঝুলছে শ্যাওলা।
সঙ্গীহীন একা সে
ঘনসবুজ আনন্দে দাঁড়িয়ে
রুক্ষ, অবিনত, বাসনা-বিধুর গাছটিকে দেখে
আমার নিজের কথা মনে হল।'...

—ওয়ালট হুইটম্যান

মার্কিনকাহিনী লিখব অথচ ওয়ালট হুইটম্যান সঙ্গে থাকবেন না, এ কখনও হতে পারে না। লুইসানিয়ার জলাভূমি আচাফালায়ার প্রসঙ্গে হুইটম্যান অবশ্যই স্মরণীয়।

আচাফালায়ার ভ্রমণকাহিনী আমেরিকা থেকে ফিরে এসে সে বছরেই এক পুজোসংখ্যায় লিখেছিলাম। এখানে প্রাসঙ্গিক বলেই আবার লিখছি। সেই কাহিনীর সঙ্গে এ কাহিনী মেলাতে বসলে নিন্দুকেরা হয়তো অনেক গরমিল পেয়ে যাবেন।

এরকম হতেই পারে। দুটি রচনাকালের মধ্যে, রচনাকারের মধ্যে অনেক ফারাক। স্মৃতি আমার বাঁধা দাসী নয়। নিন্দুকেরা মাথায় থাকুন, আমার ভ্রমণকাহিনী প্রায় হয়ে এল। আর বড় জোর দু'চার পর্ব, সেটুকু ধৈর্য ধরতেই হবে। এখন মেরে কেটে শেষ করার পালা।

সেই আমেরিকায় আসার প্রথম দিনে ভিজিটর প্রোগ্রাম সার্ভিসে বলেছিলাম একটা গ্রাম দেখতে চাই, সেই চাওয়াই আমাকে আচাফালায়ায় টেনে এনেছে।

আচাফালায়া মানে মর্গান সিটি।

নদীর নাম আচাফালায়া। নদীর নামে এলাকার নামও ছিল আচাফালায়া।

আমাদের সুন্দরবনের মতোই লুইসানিয়ার দক্ষিণাঞ্চল হল বাদা এলাকা, জলাভূমি। ওই রকমই মেছোঘেড়ি। জলাভূমির ভেতর দিয়ে, মিসিসিপি নদীর থেকে খুব দূরে নয়, একটি ছোট আঞ্চলিক নদী মেক্সিকো উপসাগরে গিয়ে পড়েছে। ওই নদী আর নদীর ও উপসাগরের মধ্যের এলাকা দুই-ই আচাফালায়া।

কবে কোন আদিম যুগে লাল মানুষেরা মাছ, কাঠ আর শিকারের সন্ধানে

দক্ষিণ আমেরিকা কিংবা অন্যত্র থেকে উপসাগর পাড়ি দিয়ে আচাফালায়ার বাদা অঞ্চলে এসেছিল। তারপর সেখানেই প্রাচীন সাইপ্রেস গাছের নীচে কুঁড়েঘর বেঁধে পাকাপাকি ভাবে থেকে গেল।

এরও বহুকাল পরে এল সাদা মানুষেরা, কলম্বাস, আমেরিগো ভেসপুচি, ভাস্কো দা গামার উত্তরসূরি, অবশ্য অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার, 'নেবুরঙা শার্টপরা একটি মানুষ এসেছিল', সেই বর্ণনার মতো ব্যাপারটা অত রোমাণ্টিক নয়। পরের সাদা ইউরোপীয়েরা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রূর, নিষ্ঠুর, হারমাদ কিংবা উপনিবেশবাদী।

আচাফালায়া উপকূলে মূলত এসেছিল ফরাসি ও স্পেনীয়রা। তাদের অত্যাচারে লাল মানুষেরা এখান থেকে হটে গেল, নির্বংশই হয়ে গেল।

কেবল রয়ে গেছে ওই প্রাচীন নাম আচাফালায়া। সেই আকাশ-ছোঁয়া সাইপ্রেস গাছগুলি, দূর সমুদ্র থেকে যার সবুজ চূড়া দেখে নাবিকেরা এসেছিল, সেই বৃক্ষকুলের রাজবংশ গত শতকের কাঠুরিয়াদের হাতে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু মহাকালের পরিহাসের মতো হঠাৎ এখানে ওখানে জনপদে ইতস্তত দু-একটি মহাকায় বৃক্ষদৈত্য আজও স্মৃতিস্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেন অত উঁচু থেকে দেখছে কি ঘটছে চারপাশে, কি ছিল, কি হল।

সাইপ্রেস গাছের ডালে হ্যাঙ্গিং মস, ঝুলন্ত ও উড়ন্ত শ্যাওলা। সবুজ আলোকলতা, মাটিতে মূল নেই, গাছেই ঝুলে থাকে, এক গাছ থেকে আরেক গাছে হাওয়ায় ভেসে যায়।

আচাফালায়াকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আগে শেষ ধ্বংসের আগে জাদুঘর করে বাঁচিয়ে রেখেছে যারা একে ধ্বংস করেছে তাদেরই উত্তর-পুরুষেরা। সাইপ্রেস গাছ, জলাভূমি, বনবাদা সমেত কয়েকটি হরিণ, জলে মেছোকুমির, গ্রাম্য কুঁড়েঘর, খালের মধ্যে কাঠের ডিঙি একশো বছরের পুরনো একটা গ্রামকে জাদুঘর বানিয়ে রক্ষা করা হয়েছে। সেই গ্রামে বিদ্যুৎ আসেনি, হ্যারিকেন রয়েছে, রয়েছে মশারি টাঙানো সাবেকি বিছানা, কোদাল, কুড়ুল এমনকি লাঙ্গল, ঢেঁকি পর্যন্ত রয়েছে। আমাদের থেকে একটু আলাদা সব দেখতে, তবে জিনিসগুলো যে কি সেটা বোঝা যায়।

মাছ ধরার জাল শুকোচ্ছে উঠোনে। দু-একটা মাছ ধরার অস্ত্র, যেমন বল্লম-জাতীয়, আমরা দেশে যাকে ফচকা বলতাম, বহুমুখী বল্লম। ধামা, কুলো এইরকম ধরনের গেরস্থালি দ্রব্য। সব কিছু মিলে সামান্য অদলবদল করে একটি ভারতীয় গ্রাম বলে অনায়াসেই চালিয়ে দেওয়া যায়। শিল্পবিপ্লবের আগের পৃথিবীর গ্রামাঞ্চলের চেহারায়, জীবনধারায় বোধহয় খুব পার্থক্য ছিল না, দেশে দেশে।

আচাফালায়া নামটুকু ধরা আছে এখন ওই টুরিস্টদের জন্যে সাজানো গ্রামের প্রচার পুস্তিকায়। একশো বছর হল জায়গার নাম বদলে হয়েছে মর্গান সিটি।

মর্গান সিটি ঠিক সিটি নয়। আমাদের বাল্যকালের হিসেব ছিল, এক লক্ষ লোক না হলে নগর হয় না, সেই হিসেবে অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশে নগর ছিল মাত্র চারটি, কলকাতা, হওড়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম। এখন তো টিটাগড়, রিষড়া বা শিলিগুড়ির লোকসংখ্যাও তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি।

মর্গান সিটির লোকসংখ্যার হিসেব নিইনি, তবে অবশ্যই এক লক্ষের কম; আমাদের পুরনো দিনের যেমন রামনগর বা শ্যামনগর, নতুন কালের শহিদ-নগর বা অশোকনগর। গৌরবার্থে সিটি, মর্গান সিটি।

সকালবেলায় প্রাতরাশ সেরে নিউ অরলিনসের হোটেল থেকে বেরিয়েছি। সকাল থেকেই টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, তবে নিউ ইয়র্ক বা বাটাভিয়ার মতো শীত বা তুষার নয়। আমাদের টাঙ্গাইলের কোনও বৃষ্টিসিক্ত শীতের দিনের মতো।

আমার সঙ্গে রয়েছেন জিম সাহেব, আমার সেই ওয়াশিংটন এসকর্ট। আমি বাটাভিয়া চলে যাওয়ার পরে তিনি নিউ অরলিনসে এসে হোটেলে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

জিম সাহেব আজ সরকারি অর্থানুকূল্যে একটি গাড়ি ভাড়া করেছেন আমাদের মর্গান সিটি যাতায়াতের জন্যে।

জিম সাহেব খুব ভালো চালক। আমরা নব্বই নম্বর হাইওয়ে দিয়ে মর্গান সিটি অভিমুখে রওনা হলাম।

নিউ অরলিনস থেকে মর্গান সিটি গাড়িতে দু ঘণ্টার পথ। মিসিসিপি নদীর ওপরে ব্রিজ রয়েছে, সেই ব্রিজ ধরে সোজা রাস্তা। ব্রিজের নাম হিউ পি লং ব্রিজ।

একটা ঘোরাপথ আছে, একটু বেশি সময় লাগে কিন্তু খুব আকর্ষণীয়, আমরা সেই পথে ফিরব। স্টিমারে মিসিসিপি নদী পাড়ি দিয়ে যেতে হয়।

আচাফালায়া তথা মর্গান শহর, মেক্সিকো উপসাগরের কোলে বসানো। শহরটার পুরো ব্যাপারটাই প্রায় সমুদ্রতীরে। রঙিন পাল তুলে সমুদ্রের জলে ঘোরাফেরা করছে যন্ত্রচালিত মাছ ধরার নৌকো। সামুদ্রিক মাছ আর চিংড়ি মাছের বিরাট উৎপন্ন-কেন্দ্র এই মর্গান সিটি। চিংড়িমাছের বহুল উৎপাদন এবং বাণিজ্যের জন্যে মর্গান সিটিকে বলা হয় 'শ্রিম্প ক্যাপিটাল অফ দি ওয়ার্লড', বাংলায় যার অর্থ হল, 'পৃথিবীর কুচো চিংড়ির রাজধানী'।

মর্গান সিটির পত্তন হয়েছিল আঠারোশো ষাট সালে। ডাঃ ওয়ালটার ব্রাশার নামে এক ইক্ষু ব্যবসায়ী গঞ্জটি চালু করেন। তাঁর নামেই জায়গার নাম হয় ব্রাশার।

পরে চার্লস মর্গান নামে এক ভাগ্যান্বেষী ব্যবসায়ী উনিশ শতকের আরও বহু ইউরোপীয়ের মতো সাত ঘাটের জল খেতে খেতে একদিন ব্রাশারে এসে পৌঁছান। তিনি অনেক আধুনিক, তাঁর ছিল রেলগাড়ি আর জাহাজের ব্যবসা। তাঁর নামেই বন্দরের নাম হয় মর্গান সিটি।

তবে আদিপুরুষ ব্রাশারের নামাঙ্কিত ফোর্ট ব্রাশার নামে একটি দুর্গ

এখনও আছে। মর্গান সিটিতে সেটা একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান।

মর্গান শহর নব্বই নম্বর হাইওয়ের ওপরে। নিউ অরলিনস এবং অন্যত্র থেকে প্রতি বছর অসংখ্য লোক আসে এখানে বেড়াতে, ঘুরতে। শৌখিন মৎস্যশিকারিরা আসে হুইলছিপ হাতে, শিকারিরা আসে এখানে বিদ্যমান জলাভূমিতে হরিণ, পাখি বা কুমিরের খোঁজে, ঝুড়ি ভর্তি খাবার-দাবার, বিয়ারের-কোকের ক্যান নিয়ে কর্তা-গিন্নি-ছেলে-মেয়ে আসে পিকনিক করতে।

তা ছাড়া আছে মৎস্য মহোৎসব। এরা বলে 'শ্রিম্প ফেস্টিভ্যাল'। বছরে একবার আনন্দে-উৎসবে হইহল্লায় মাতোয়ারা মর্গান সিটি পুরনো আচাফালায়া হয়ে যায়। মেক্সিকো উপসাগরের এই প্রাচীন উপকূল মুখরিত হয়ে ওঠে নাচে গানে, সাতরঙা পাল তুলে সাগরের জলে নৌকো ছোটে। নৌকো বাইচের প্রতিযোগিতা হয় মৎস্য মহোৎসবের দিন বিকেলে। প্রতিযোগিতার বাইরেও বহু রঙিন, সাজানো তরী এই উৎসবে যোগদান করে।

সাড়ে দশটা নাগাদ যখন মর্গান শহরে পৌঁছলাম, বৃষ্টি খুব ঝেঁপে এসেছে। সমুদ্রের ধার বলে ঠাণ্ডা তেমন না হলেও কনকনে হাওয়া এসে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

একটা গাড়িবারান্দার নীচে দাঁড়ালাম। আমরা দুজন ছাড়াও সেখানে আরও দু-চারজন দাঁড়িয়ে। তাদের কিন্তু শীতবস্ত্রের বাহুল্য নেই। তাদের দেখে ঠাণ্ডা হাওয়ায় খুব একটা অসুবিধে বা কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হল না। সবই অভ্যেস, শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়।

বৃষ্টি একটু থেমে আসতে শহরের মধ্যে ঢুকলাম। ঢুকেই এক পাশে বড় মাঠের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির দোতলা বাড়ি, অফিস ও অডিটোরিয়াম। এই বাড়িতেই মর্গান সিটি টুরিস্ট ইনফরমেশনের অফিস।

টুরিস্ট অধিকর্তার নাম মাইকেল হপকিনস। তাঁকে খবর দেওয়া ছিল। তিনি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন একগাদা রঙিন কাগজপত্র নিয়ে। আমি যে একজন ভারতীয় গ্রামের দেশের থেকে মার্কিন দেশের এই সুদূর দক্ষিণপ্রান্তে এসেছি, বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে মেক্সিকো উপসাগরের উপকূলে সোয়াম্প গার্ডেনে পুরনো আচাফালায়ায় গ্রাম দেখতে এসেছি তাতে হপকিনস সাহেব যথেষ্টই কৌতূহলী এবং আনন্দিত।

মাইকেল হপকিনস খুবই কর্মব্যস্ত, চটপটে কিন্তু আলাপি লোক। তিনি এই শহরের শুধু ভ্রমণ-অধিকর্তাই নন, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির বড়বাবু, মিউনিসিপ্যাল অডিটোরিয়ামের ম্যানেজার।

মাইকেল সাহেব নববিবাহিত। তাঁর স্ত্রী কাছেই একটা ব্যাঙ্কে কাজ করেন। আজ দুপুরে যদি আমি আর জিম সাহেব তাঁদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন করি মাইকেল দম্পতি বিশেষ গর্বিত হবেন।

জিম সাহেব আমাকে কাল রাতেই বলেছিলেন আমার মধ্যাহ্ন ভোজন আজ এখানে। এটা সরকারি আতিথেয়তা, ভিজিটর প্রোগ্রাম সার্ভিসের ব্যাপার, তবুও মাইকেল সাহেবের সবিনয় অনুরোধ শুনে আমি সম্মতি জানালাম।

সেই সঙ্গে বললাম, 'এখনও খিদে পায়নি। আসুন এর মধ্যে সোয়াম্প গার্ডেন থেকে গ্রাম দেখে আসি। আমার তো মাত্র একদিনের মেয়াদ।'

আমার বক্তব্য শুনে মাইকেল সাহেব 'লায়লা-লায়লা' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। চেঁচানো দরকার ছিল না। এক বেশরম শ্বেতাঙ্গিনী মাত্র দেড় মিটার দূরে বসে এতক্ষণ আমাকে অপাঙ্গে নিরীক্ষণ করছিলেন।

'লায়লা-লায়লা' ডাক শুনে তিনি সজাগ হলেন। একটা মাঝারি হাই তুলে তারপর একটা জোর তুড়ি দিয়ে স্বপ্ননীল চোখে বললেন, 'হাই মাইক।'

তারপর নিজের রিভলভিং চেয়ারটা আমার মুখোমুখি করে মাইকেল সাহেবের হাতে একটা টাইপ করা কাগজ এগিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন, 'ওয়েলকাম টু মর্গান সিটি।'

সামান্য প্রীতি-সম্ভাষণ বিনিময়ান্তে শ্রীমতী লায়লা আমাকে বললেন তাঁর এক কাকা আসামে চা বাগানে ছিলেন, মিস্টার জন স্মিথ। আমি তাঁকে চিনি কিনা।

আমার চেনার কথা নয়, তবু ভদ্রতা করে বললাম, 'নামটা খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে।' জানা গেল শ্রীমতী লায়লারা এডিনবরার লোক, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর তাঁরা আমেরিকায় এসেছেন। তাঁর কাকা কিছুকাল আগে আসামের চা বাগানেই দেহত্যাগ করেছেন এবং সর্বোপরি এই আশ্চর্য লায়লা নামটি তাঁর কাকারই দেওয়া।

শ্রীমতী লায়লা যে টাইপ করা কাগজটা মাইকেল সাহেবকে দিয়েছিলেন সেটা আমার সেদিনের ভ্রমণসূচি। দেখলাম প্রথমেই রয়েছে মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

মর্গান সিটির মেয়রের নাম মিস্টার ব্রাউনেল। এখানকার প্রাচীন বংশ। এদের পরিবারের নামেই এখানে রয়েছে ব্রাউনেল স্মৃতিস্তম্ভ পারলুদ হ্রদের পাশে। জলক্রীড়ার জন্যে পারলুদ হ্রদ প্রসিদ্ধ। এখানে দূর-দূরান্ত থেকে লোকে ওয়াটার স্কি করতে আসে। হ্রদের চারধারে সাইপ্রেস গাছের সমারোহ। হ্রদের জলে ছোট ছোট ডিঙি নৌকোয় লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা হাত তুলে আমাদের ডাকতে লাগল। জানে জল পেরিয়ে মধ্যহ্রদে পৌঁছাতে পারবে না।

ব্রাউনেল স্মৃতিস্তম্ভ তেমন বড় ব্যাপার কিছু নয়। কিন্তু এখানে একটা ঘণ্টা আছে হল্যান্ড থেকে আনানো, আসলে ঠিক একটা নয় একষট্টিটা ঘণ্টা যন্ত্রচালিত। সব রকম বাজনার সুর বাজে এই যন্ত্রে।

ব্রাউনেল স্মৃতিস্তম্ভ অবশ্য দর্শনীয় অন্য এক কারণে। মেয়র সাহেবের কাছে গেলেই তিনি জানতে চান ব্রাউনেল স্মৃতি সৌধ কেমন দেখলে। আমার কাছেও জানতে চেয়েছিলেন।

ব্রাউনেল সাহেব গোলমেলে লোক। নিজের বাড়ির উঠোনে কুমির পুষেছেন। একটু হামবড়াই ভাব। ষাট বছর বয়েস হয়েছে অথচ মেদহীন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। ঘণ্টা দুয়েক নিজের এবং নিজের পরিবারের সব গল্প করলেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনাক্রমে জানতে পারলাম মর্গান সিটিই পৃথিবীর

শ্রেষ্ঠ শহর, মর্গান সিটির মেয়রই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মেয়র।

আরেকটা মূল্যবান তথ্য জানা গেল। এখানেই আচাফালায়ার সাইপ্রেস অরণ্যে সিনেমা তৈরির আদি যুগে প্রথম টারজানের ছবি তোলা হয়, যে ছবি দূর বঙ্গীয় মফস্বলে একদা আমিও দেখেছি।

মেয়রের সঙ্গে কথায় কথায় প্রায় একটা বেজে গেল, মাইকেল একটু অস্থির হয়ে পড়েছেন, তাঁর স্ত্রী রেস্তোরাঁয় অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য। এ দিকে মেয়র সাহেব দুম করে বলে বসলেন, 'আজ দুপুরে তোমরা আমার এখানেই খাবে।'

মাইকেলের ফ্যাসাদ কাটাতে আমি বললাম, 'মাইকেলের স্ত্রী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন, আমাদের একসঙ্গে খাওয়ার কথা।'

শুনে মেয়র সাহেব মাইকেলকে হুকুম করলেন, 'মিসেস হপকিনসকে আমার এখানে আসতে বলো।' মিসেস হপকিনসের গাড়ি নেই। মাইকেল সাহেবকেই যেতে হল তাঁকে আনতে।

এতক্ষণ আমরা বাইরের ঘরে বসে কথা বলছিলাম। এখন মেয়র-গৃহিণী এসে আমাদের ভেতরে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গেলেন।

ড্রয়িংরুমে আবছায়া আলো। বিরাট লম্বা ঘর। দু প্রান্তে দুটি ফায়ার প্লেসে কাঠের চুল্লি থেকে লাল আভা বেরোচ্ছে। দূরে এক পাশে সেলার, তাক বরাবর কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে ছাদ পর্যন্ত। তাকে তাকে থরে থরে সাজানো দেশ-বিদেশের পানীয়। আর গেলাস যে কত রকমের, পাতলা ও মোটা কাচের, কাটগ্লাসের, তামার, কাঁসার, রুপোর এমনকি কাঠের, বাঁশের গেলাস। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের বৈচিত্র্যময় পানপাত্র।

আর এই ঘরের চার দেওয়ালে ছাদ পর্যন্ত সারি দিয়ে রাখা রয়েছে বিভিন্ন রকম অস্ত্রশস্ত্র, বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল, বল্লম, তলোয়ার, ছোরা, পাথরের তৈরি অস্ত্র, বেতের ঢাল ইত্যাদি যত রকম অস্ত্র ভাবা যায়।

মেয়র সাহেব একটি সুদৃশ্য ধনুক দেখিয়ে আমাকে বললেন, 'এটি আমার ঠাকুর্দা কিনেছিলেন এখানকার শেষ আদিবাসী পরিবারটির কাছ থেকে।'

আমি সরলভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আদিবাসীরা গেল কোথায়?' মেয়র সাহেব সংক্ষিপ্ত করে বললেন, 'কিছু চলে গেল। বাকি কিছু আমাদের সঙ্গে মিলে গেল। এখন আর তাদের আলাদা করে চেনা যাবে না।'

ভূরিভোজনান্তে মেয়রের কাছ থেকে বহু কষ্টে অব্যাহতি পেয়ে আমরা অবশেষে আচাফালায়ায় যাত্রা করলাম। মিসেস হপকিনস গেলেন না, তার কাজ আছে। তিনি মিউনিসিপ্যালিটির পাশেই একটা ব্যাঙ্কে কাজ করেন। তাঁকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে আমরা সংরক্ষিত আচাফালায়ার দিকে এগোলাম।

তবে মিসেস হপকিনস সুরসিকা, যাওয়ার সময় বলে গেলেন যে তাঁর স্বামী খুব কৃপণ। আচাফালায়ায় কুমির আছে। সেগুলোকে ভালো করে খেতে দেন না। সেগুলো ক্ষুধার্ত ও হিংস্র হয়ে আছে। সুতরাং সাবধান!

আমি বললাম, 'ম্যাডাম, আমিও জলের দেশের লোক, আমাকে কুমিরের

ভয় দেখাবেন না।' এই বলে কি মনে করে যেন বাঙাল বাংলায় কুমিরের সেই ছড়াটা শুনিয়ে দিলাম,

'ভালো কথা মনে পড়ল
আচাইতে আচাইতে।
ঠাকুরঝিরে নিয়া গেল
নাচাইতে নাচাইতে।'

ম্যাডাম থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর কি মানে?'

আমি বললাম, 'এর কোনও মানে নেই। অনেক দূরের অন্য যুগের একটা খুব করুণ কিংবা খুব মজার কাহিনী।'

অবশেষে শ্রীযুক্ত হপকিনস আমাকে নিয়ে সোয়াম্প গার্ডেনে এসে পৌঁছোলেন। বাগানের কাঠের গেট খুলে আমরা ঢুকলাম। সামনেই খাল, তার ওপরে আমাদের দেশের মতই কাঠের সাঁকো। সেই সাঁকো পেরিয়ে একটা বড় সাইপ্রেস গাছের কাছে গিয়ে মাইকেল গাছের গায়ে বসানো একটা সুইচ টিপে দিলেন, গাছের ডালে বসানো মাইকের চোঙা থেকে শোনা গেল আচাফালায়ার আত্মজীবনী। ভারী পুরুষকণ্ঠের দীর্ঘ কথিকা।

...'স্বাগতম। এই বাদা জঙ্গলে আমি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আচাফালায়ার শেষ সম্রাট। আমার বয়েস ছশো বছর। আশেপাশে আর যে সব সাইপ্রেস গাছগুলো দেখছেন সেগুলো শিশু, এই তো সেদিন একশো দেড়শো বছর আগে জন্মাল। ওই দেখুন কুটির। কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগে লাল মানুষেরা সাগর পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছিল, তারা ওই কুটির বানিয়েছিল, দেখুন ঘরের বেড়ায় কি চমৎকার বুনোলতার কারুকাজ, দেখুন ওই বেতের বাক্স—এখন আর ওর কারিগর নেই।...

...আর ওই দেখুন 'সোয়াম্পার। মাথায় টুপি, হাতে বন্দুক, গত শতাব্দীতে এসেছিল। সাপ-কুমির, পোকা-মাকড়, অসংখ মহামারীর সঙ্গে লড়াই করেও জিতেছে কিন্তু আমাদের ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। আমার বংশের সবাই যখন নিহত হল সোয়াম্পারের কুঠারের আঘাতে কি করে যেন আমি রক্ষা পেয়ে গেলাম।...

আচাফালায়ার বাদাজঙ্গলে ঘুরে ঘুরে দেখলাম আমাদের গ্রাম বাংলার মতই কুঁড়েঘর, গোয়ালঘর। পানা পুকুরের শ্যাওলাধরা কাঠের ঘাট। ঝোপ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পায়ে চলার পথ। সবই আছে, সাজানো ঠিকঠাক। শুধু কোনও মানুষ নেই। সভ্যতার অন্ধকারে তারা বিলীন হয়ে গেছে চিরদিনের মত।

যখন ভারী মনে বেরিয়ে আসছি মাইকে আচাফালায়ার প্রাচীন গান হচ্ছে করুণ রমণী কণ্ঠে, যার অর্থ হল—

'যেয়ো না যেয়ো না ফিরে।
প্রাণের মাঝারে তোমারে রাখিব
রাখিব বুকের মাঝারে।'

সাতাশ

পশ্চিম উপকূল

'তারা তারপরে এল সুদূরে পশ্চিমে, সেখানে এসে দেখল বিশাল বিশাল উপত্যকা, সাম্রাজ্যের মত বিস্তৃত, কিন্তু সে সব সাম্রাজ্যে কোনও সম্রাট নেই।'...

—আমেরিকার ভূগোলের মুখবন্ধ

আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে আমি তিনটি শহরে অল্পদিন করে ছিলাম। এগুলি হল লস এঞ্জেলস, সাণ্টা বারবারা এবং সানফ্রান্সিসকো।

নিউ অরলিনস থেকে সকালের প্লেনে হলিউড-মথিত লস এঞ্জেলস শহরে আসি। আমার যাত্রা প্রায় শেষ। পূব থেকে পশ্চিমে সূর্য-চন্দ্র যেমন যায়, আমিও প্রায় সেই রকমই বিদায়বেলায় পশ্চিমপ্রান্তে এসে পৌঁছোলাম।

নিউ অরলিনস থেকে আমি আর আমার ভ্রমণ সঙ্গী জিম সাহেব একসঙ্গেই এসেছিলাম। লস এঞ্জেলস শহরের কায়দা-কানুন, বিধি-বন্দোবস্ত অন্যরকম। এখানে একটি স্বতন্ত্র ওয়ারলড্ অ্যাফেয়ারস কাউন্সিল আছে, রীতিমত গণসংগঠন, তাঁরাই বিদেশি আমন্ত্রিত অতিথিদের দেখাশোনা করেন। আমার দেখাশোনা তাঁরা ভালই করেছিলেন বলতে হবে। মহার্ঘ হিলটন হোটেলে আমার এবং জিম সাহেবের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল। অবশ্য তার অন্য একটা কারণও ছিল, ওয়ারলড অ্যাফেয়ারস কাউন্সিলের অফিসও অবস্থিত ছিল ওই হিলটন হোটেলেরই লবিতে, একটি প্রশস্ত কক্ষে।

এবং এই কাউন্সিলের অফিস কক্ষেই আমি আরেকবার বিপদে পড়েছিলাম আমার ভাষার দোষে, বলা ভাল, ভাষা নয়, উচ্চারণের দোষে।

বহু ইংরেজি শব্দ, আর শুধু ইংরেজিই বা বলি কেন শুধু বাংলা শব্দও আমার বাঙাল জিহ্বার আড়ষ্ট উচ্চারণে সুকর্ণ কুহরে গোলমেলে শোনায়। ঠিক এই রকমই একটি শব্দ হল জু।

বাংলায় জয়ে হ্রস্ব উকার দিয়েই সেরে দিলাম, কিন্তু ইংরেজি ভাষায় দুটি আলাদা শব্দ রয়েছে—একটি হল জে-ই-ডাবলু এবং অপরটি হল জেড্-ও-ও। জনৈক শব্দবাগিশ মহাশয়ের কাছে জেনেছিলাম, এই ইংরেজি শব্দ দুটির বাংলা উচ্চারণ হতে পারে যথাক্রমে জু এবং জ্বউ।

জানি না শব্দবাগিশ মহোদয় আমার মত মূর্খের সঙ্গে রসিকতা করেছিলেন কি না, কিন্তু একথা সত্যি, রসিকতা হোক বা যাই হোক আমার জিহ্বায় এত সূক্ষ্ম তারতম্য সম্ভব নয়। পরম পূজনীয় কৈলাস শাস্ত্রী মহোদয় কলেজে আমাদের অঙ্ক কষাতেন, প্রথম যৌবনে আমার গ্রাম্য উচ্চারণ (বৃত্ত—সারকেল) শুনে তিনি বলেছিলেন, 'তারাপদ, সারকূলকে নারকেলের মত উচ্চারণ করবে না, তুমি গার্লকে গরল্ নাই বললে, তাই বলে গাড়ল বলবে কেন?'

মাননীয় অধ্যাপকের নির্দেশ মান্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি নেহাতই জাগতিক কারণে, আমার কান সেভাবে তৈরি নয়, আমার জিহ্বা সেভাবে তৈরি নয়, সর্বোপরি আমার বুদ্ধিও তেমন সজাগ নয়।

সুতরাং আবারও ভুল করেছিলাম।

এবং সে বড় মারাত্মক ভুল।

সকালবেলা লস এঞ্জেলসে পৌঁছে হোটেলে উঠে দুপুরে ওয়ারলড কাউন্সিলের অফিসে গেলাম আমার ভ্রমণসূচি চূড়ান্ত করতে।

মনে আছে, আমেরিকায় এসে আমি বলেছিলাম একটা চিড়িয়াখানা, একটা গ্রাম, একটা পাঠশালা দেখতে চাই। লুইসানিয়ায় গ্রাম দেখে এসেছি কিন্তু চিড়িয়াখানা এবং পাঠশালা এখনও বাদ আছে, সে দুটো লস এঞ্জেলসেই সারতে হবে। এর পরে বাদ্ধবাকীর্ণ ফ্রিসকোতে গিয়ে হয়তো আর সময় পাব না।

একটি সদ্য সাবালিকা মেয়ে, তার নাম দেবী রবার্টস, সে সদ্য বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে ওয়ারলড কাউন্সিলে কাজ পেয়েছে, আমার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পড়েছিল তার ওপর।

ভ্রমণসূচি প্রণয়নের সময় আমি তাকে চিড়িয়াখানা ও বিদ্যালয়ের কথা বললাম। বাচ্চাদের ইস্কুলের ব্যাপারটা সে ভালই বুঝল এবং তখনই ফোন করে শহরতলির একটা এলিমেণ্টারি স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরের দিন বন্দোবস্ত করে ফেলল।

লা ক্রিসেণ্টায় মনটে ভিসটা এলিমেণ্টারি স্কুল এবং সবচেয়ে মজার কথা, সেই স্কুলেই দেবী রবার্টসের মা একজন শিক্ষয়িত্রী। মনটে ভিসটা স্কুলটির পরিবেশ এবং পরিকল্পনা দুইই খুব সুন্দর।

বিদ্যালয়টি সাধারণ ছাত্রের জন্যে নয়। যারা সাধারণের চেয়ে বেশি মেধাবী, এবং বিভিন্ন বিষয়ে অনেক বেশি অগ্রসর এখানে বেছে বেছে তাদেরই ভর্তি করা হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুটি ভারতীয় বংশোদ্ভব নামও পেলাম, শ্রীমান প্যাটেল এবং শ্রীমতী সিং।

এই স্কুলের একটা ক্লাসের একটা ব্যাপার এখনও মনে আছে। খুব ছোট বাচ্চাদের ক্লাস। দিদিমণি ক্লাসের ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করছেন কে কোথায় যেতে চায়। একটি ছোট মেয়ে বলল যে সে চাঁদে যাবে।

দিদিমণি বললেন, 'চাঁদে গিয়ে তুমি কি করবে?'

ছোট মেয়েটি একটুও না ভেবে জবাব দিল, 'চাঁদে গিয়ে প্রথমেই আমি আমাদের দেশের পতাকা চাঁদের মাটিতে পুঁতব।' মেয়েটি অবশ্যই আমেরিকান।

আমি বিচলিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে এই কথাটা শিশুটিকে শেখানো হয়েছে, নাকি সে নিজে থেকেই বলল। তবে উত্তর খোঁজার কোনও চেষ্টা করিনি।

অতঃপর আমার সেই উচ্চারণজনিত বিপদের পুরনো গল্পটা বলি।

দেবী রবার্টস আমার ইস্কুল দেখার ব্যাপারটা সহজেই গুছিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু চিড়িয়াখানা কথাটা বুঝতে পারেনি।

যত বলি 'জু' 'জু', দেবী চোখ গোল গোল করে আমাকে বলে, 'জু?

জ়ু ?' আমি বলছি জ়ু অর্থে চিড়িয়াখানা, আর সে ভাবছে জ়ু অর্থে ইহুদি।

বহু চেষ্টা করেও যখন আমার উচ্চারণ দোষে আমার উদ্দেশ্য শ্রীমতী রবার্টসের হৃদয়ঙ্গম হল না, সে সটান উঠে দাঁড়াল। সে ভেবে নিয়েছিল আমি ভারতবর্ষের লোক, কোনও দিন কোনও ইহুদিকে দেখিনি, তাই একজন ইহুদিকে দেখতে চাইছি। উঠে দাঁড়িয়ে তার এলোমেলো পিঙ্গল কেশে ঝাঁকি দিয়ে মধুর হেসে বলল, 'দেন সি মি, আই অ্যাম এ জু', 'তাহলে আমাকে দ্যাখো, আমি একজন ইহুদি।' এই বলে অফিসঘরের মধ্যে মেয়েটা নিজেকে দেখানোর জন্য জামাকাপড় খুলে ফেলে আর কি ?

আমি সেদিকে না তাকিয়ে চোখ নামিয়ে একটা কাগজ পেন্সিল নিয়ে ইংরেজিতে জেড ও ও লিখিলাম এবং প্রাঞ্জল করার জন্য তার পাশে গরাদ এঁকে ভেতরে সাধ্যমত জীবজন্তুর ছবি এঁকে ফেললাম।

সেদিকে তাকিয়ে দেবী কিছু বুঝল এবং হেসে বলল, 'ও তাই বলো', তারপর চেয়ারে ধাতস্থ হয়ে বসে আত্মপ্রদর্শনী থেকে বিরত হল, আমিও সৌভাগ্যবশত ইহুদিনি দর্শন থেকে রক্ষা পেলাম।

আমাকে লস এঞ্জেলস জু'-তে নিয়ে গিয়েছিলেন ডাঃ দেবকুমার। কুমার হল উপাধি আর দেব হল নাম, ডেভিড থেকে দেব। কাশ্মীরের লোক, বহুকাল লস এঞ্জেলসবাসী। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সার্জন, উইলশায়ার বুলেভার্ডের মত রাস্তায় বিশাল ফ্ল্যাটে একা থাকেন। বোধ হয় বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে, তবে বন্ধুবান্ধবীর অভাব নেই। ডাঃ কুমার ওয়ারলড কাউন্সিলের সদস্য, আমি ভারতীয় বলে একটা পুরো দিনের জন্য আমার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে গভীর রাতে ডিনার-শেষে হোটেলে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত।

ক্রমাগত ভ্রমণে এমনিতেই খুব ক্লান্ত ছিলাম। তা ছাড়া সাতসকালে ঘুমচোখে লস এঞ্জেলস চিড়িয়াখানা মোটেই ঘুরে দেখা হয়নি। কিন্তু একটা কথা মনে আছে, প্রবেশপথের অদূরেই এক পাল ছোট ঘোড়া দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ঘোড়া যে এত ছোট হতে পারে মাত্র দু ফুট-আড়াই ফুট উঁচু, যেন গালিভারের ভ্রমণকাহিনীর পাতা খুলে বেরিয়ে এসেছে।

এই চিড়িয়াখানার দোকান থেকেই তিনটে খুব ছোট ওষুধের গেলাসের আকারের নীল জিরাফের ছবি আঁকা, লস এঞ্জেলস জু লেখা পানপাত্র ডাঃ কুমার আমাকে কিনে দিয়েছিলেন। গেলাসগুলি খুবই মূল্যবান, এখনও আমাদের বাড়িতে কাচের আলমারিতে রাখা আছে, কচিৎ-কদাচিৎ ব্যবহার করা হয়।

ডাঃ কুমারের ডিনারে দুজন আশ্চর্য চরিত্রের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দুজনেই প্রায় উত্তরযৌবনা মহিলা।

একজনার নাম মনে নেই। তিনি একদা হলিউডের অভিনেত্রী ছিলেন, মেরি ক্রুশো বা ওরই কাছাকাছি নাম, খুব খ্যাতনাম্নী নন, দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারির। মেমসাহেবকে মনে আছে এই কারণে যে, তিনি বলেছিলেন যে তিনি লণ্ডন থেকে একবার কি এক থিয়েটারের দলের সঙ্গে অনেকদিন আগে

কলকাতায় গিয়েছিলেন। তাঁর বর্ণনা শুনে মনে হয়েছিল খুব সম্ভব এসপ্লানেডের মোড়ে সেকালের ব্রিস্টল হোটেলে উঠেছিলেন।

ভদ্রমহিলা আমার ঠিকানা নিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে একবার কলকাতায় আসবেন, এলে আমার খোঁজ নেবেন। বোধ হয় আর আসেননি, অন্তত আমাকে খবর দেননি।

দ্বিতীয় মহিলা হলেন লিওনা কার্পেন্টার, সংক্ষেপে লিও বা লি। স্বামী পরিত্যক্তা সাত ছেলেমেয়ের মা, ক্যাথলিক জননী। আমি লস এঞ্জেলস ছেড়ে চলে আসার পরে লিওনার আবার বিয়ে হয়েছিল এক শক্তসমর্থ প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে। সাত ছেলেমেয়ে এবং নতুন স্বামীসমেত একটি গ্রুপ ফটোগ্রাফের সঙ্গে তাঁর এই বিয়ের আমন্ত্রণপত্র তিনি আমাকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন।

যতদূর মনে হয়েছিল লিওনা ছিলেন বেশ কৃপণ, বহু মার্কিন মেমই তাই, তবে খুব স্নেহশীলা। একটু আপন-আপন ভাব ছিল তাঁর আচার-আচরণে। পরিচয় হওয়ার পরদিন থেকে প্রায় আগাগোড়া লস এঞ্জেলস শহরে তিনি আমার ছায়াসঙ্গিনী ছিলেন, প্রায় সর্বত্র আমার সঙ্গে থেকেছেন। আমার এসকর্ট জিম সাহেবের কাজের ভার লাঘব হয়েছিল। লাইব্রেরিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, সাহিত্যসভায় এমনকি ভোজের আসরে লিওনা আমার সঙ্গিনী ছিলেন। একাধিক দিন দুপুরে আমরা রেস্তোরাঁয় মুখোমুখি বসে ডাচ লাঞ্চ খেয়েছি। ডাচ লাঞ্চ ব্যাপারটা খুবই দুঃখের, যার যার তার তার, একসঙ্গে বসে যে-যার মতো খাবে, যে-যার মতো দাম দেবে।

আমেরিকা থেকে চলে আসার পরেও বহুদিন আমার লিওনার সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ ছিল। সম্প্রতি বিচ্ছিন্ন হয়েছি। এ বছর বড়দিনের কার্ডও আসেনি।

লস এঞ্জেলসে ছিলাম, হলিউডের কাছাকাছি গেছি। কিন্তু কোনও চিত্রতারকার সাক্ষাৎ পাইনি, আর সেই স্বপ্নের মায়াপুরীতে প্রবেশ করাও হয়নি। এরকম দর্শনে আমার উৎসাহ যথেষ্ট নয়।

তবে ডিজনিল্যান্ডে গিয়েছিলাম। ওয়ারলড অ্যাফেয়ারস কাউন্সিল আমার এবং জিম সাহেবের জন্য দুটো কমপ্লিমেন্টারি পাসের বন্দোবস্ত করেছিল। একদিন অপরাহ্ণে একটা রেন্টাল গাড়িতে জিম সাহেব আমাকে ডিজনিল্যান্ড নিয়ে গেলেন।

একদা তাজমহল দেখে আমি যেমন মোহিত হতে পারিনি, তেমনিই এখানে ডিজনিল্যান্ড দেখে আমি মোটেই চমৎকৃত হইনি।

আসলে যা যা বিষয়ে অনেক জানাশোনা, প্রত্যক্ষদর্শনে তার কোনও চমক থাকে না। সেই কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের ইয়ারো দেখার মতো প্রত্যাশা পূরণ হয় না। শষ্পশীর্ষে একটি অলক্ষিত শিশিরবিন্দুর জন্যে বহু পথ বহু দেশ ঘুরে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছিলেন।

ডিজনিল্যান্ডে এমন কিছু নেই যা অপ্রত্যাশিত, যা অকল্পনীয়, যা ভাবা যায় না। শুধু একটা দ্রষ্টব্যের কথা বিশেষ করে মনে আছে। আলো-অন্ধকারে রহস্যময়, অশরীরী আর্তনাদে মুখর পোড়ো দ্বীপে কারখানার পাশে এক

হানাবাড়ি, লণ্ঠন হাতে এক ভৌতিক চৌকিদার আর তার বৃদ্ধ কুকুর ঝোপের আবছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেন জানি না, এতদিন পরেও হঠাৎ কোনও রাতে ঘুমের ঘোরে এই ছমছমে দৃশ্য দুঃস্বপ্নের মধ্যে ফিরে আসে। আমার অবচেতন মনে যথেষ্ট রেখাপাত করেছিল ওই হানাবাড়ি, সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

লস এঞ্জেলসে এসে আমার অন্তর্দেশীয় বিমানযাত্রা শেষ হল। এখন থেকে জিম সাহেব একটা অ্যাভিস কোম্পানির গাড়ি ভাড়া করলেন। পশ্চিম উপকূল বরাবর সাণ্টা বারবারা হয়ে সানফ্রানসিসকো পর্যন্ত যাব। সেখানে পৌঁছে সেখানকার অ্যাভিসের অন্য শাখায় গাড়িটি ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে।

প্রশান্ত মহাসাগরের পাড় ধরে চমৎকার রাস্তা, জনবসতি কদাচিৎ। একদিকে সমুদ্র, একদিকে পাহাড়শ্রেণী। দূরে দূরে খামারবাড়ি, র‍্যাঞ্চ। পাহাড়ের কোলে সাদা-কালো সতেজ সবল, গরু চরছে পালে পালে, আমেরিকার সযত্ন লালিত খাদ্য ভাণ্ডার, যথাসময়ে স্টেক হয়ে পরিবেশিত হবে যথাস্থানে।

সকাল দশটায় হিলটন থেকে রওনা হয়ে ঘণ্টা দুয়েক বাদে সাণ্টা বারবারায় পৌঁছে গেলাম। পশ্চিম উপকূলের সবচেয়ে রম্য, মনোহর শহর সাণ্টা বারবারা। ভ্রমণকারীদের মক্কা-গয়া-কাশি।

হালকা শীতের মৃদু আমেজে সাণ্টা বারবারা তখন ঝলমল করছিল। পুরনো দিনের বাড়িঘর, রাস্তায় শৌখিন ঘোড়ার গাড়ি, সমুদ্রের সহিষ্ণু ঢেউয়ে সাবলীল নরনারী, ঢেউয়ের চূড়ায় ফ্রিসবি ছুঁড়ে দিচ্ছে, ঢেউয়ের ধাক্কায় ফিরে আসছে তটে, তাই ধরার জন্যে কাড়াকাড়ি। পরে সন্ধ্যায় দেখছি ফসফরাস মাখানো ফ্রিসবিগুলো রাতের অন্ধকারে ঢেউয়ের শিখরে প্রদীপের মত জ্বলে, কলহাস্যে ভরপুর তটভূমি উদ্বেল হয়ে ওঠে।

সাণ্টা বারবারায় লস এঞ্জেলস থেকেই যোগাযোগ করা হয়েছিল। আমরা উঠেছিলাম সমুদ্র সন্নিকটে অ্যামবাসাডর বাই দি সি নামে একটি ছোট ও পরিচ্ছন্ন হোটেলে। আমাদের প্রথম গন্তব্য স্থির হয়েছিল সাণ্টা বারবারা নিউজ প্রেসে, যেখান থেকে একটি স্থানীয় দৈনিক প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের নাম শ্রীযুক্ত টেলার। টেলার সাহেব যুবক এবং কর্মঠ। তাঁর কাগজের কর্মচারীর সংখ্যা সাংবাদিক থেকে গেটম্যান পর্যন্ত সবসুদ্ধ পনেরো-বিশ জনের বেশি হবে না। তবে তিনি একাই একশো, অধিকাংশ কাজ নিজেই জানেন। পুরনো দোতলা বাড়ি, একতলায় ছাপাখানা, দোতলায় অফিস। সম্পাদক সাহেবের ঘর দোতলায় জানলার ধারে, সেখানে প্রায় শেষ রাত পর্যন্ত একটা আলোর ডুম জ্বলে, যেটা দেখে বোঝা যায় এখন কাগজের কাজ চলছে। রাতের ওই সময়ে প্রতিবেদক বা শৌখিন পত্রদাতারা, নিবন্ধকারেরা তাঁদের রচনা সম্পাদককে সরাসরি দিতে পারেন একটি সহজ উপায়ে, দোতলায় সম্পাদকের জানলার পাশে ওই নির্দেশক আলোর ডুমের ধার দিয়ে একটা দড়ি ঝোলানো আছে, সেই দড়িতে একটা বালতি রাস্তার ওপরে ঝোলে, তার মধ্যে প্রতিবেদন ফেলে দিলেই চলে, সাক্ষাৎ যোগাযোগের দরকার নেই। তবে কখনও কখনও পথ-চলতি মদ্যপেরা তাদের সদ্য শূন্য পানীয় বোতল বা ফাজিল ছেলেরা অশ্লীল কাগজপত্র ওই বালতিতে রেখে যায়।

নিউজ প্রেসে আমরা যখন গেলাম টেলার সাহেব ঘুমিয়ে ছিলেন। তাঁকে সারারাত জাগতে হয়, সুতরাং দিনের বেলায় না ঘুমিয়ে উপায় কি। আমরা একটু বসতেই অবশ্য তিনি ঘুম থেকে উঠলেন, তবে আমাদের সঙ্গে তিনি বেশি কথা বললেন না, শুধু বললেন, 'ভোর রাতে আসুন, যখন কাগজ মেকআপ হয়, ছাপা হয়। জিনিসটা দেখলে অনেক কিছু শিখতে পারবেন।' আমার কিন্তু কোনও দিনই শিক্ষার দিকে কোনও আগ্রহ নেই। ভোর রাতে আর যাওয়া হয়নি।

সান্টা বারবারার মেয়র ছিলেন তখন ডেভিড শিফম্যান নামে এক ভদ্রলোক। তিনি আমাদের মধ্যাহ্নের আহারের জন্যে আমন্ত্রণ দিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর অফিস কাছেই, সংবাদপত্র দফতর থেকে তাঁকে ফোন করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, দেড়টার মধ্যে আমার অফিসে আসুন। যেতে যেতে দুটো হয়ে গেল। তখনও তিনি আমাদের জন্যে বসে রয়েছেন।

মেয়র সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্যে বেরোনোর মুখে টেলার সাহেব একটা অনুরোধ করলেন আমাদের, জিম সাহেবকে একটা প্যাকেটে সেদিনের দশ বারোটা সংবাদপত্র দিয়ে বললেন, 'মেয়র সাহেবকে বলবেন, জন আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে।' জন কে, কি ঘটনা কিছুই বুঝলাম না।

তবে মেয়রের অফিস থেকে বেরিয়ে তাঁর বাড়ির দিকে যেতে যেতে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম।

মেয়রের বাড়ি শহরের বাইরে, সান্টা বারবারার উপকণ্ঠে। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে আঁকাবাঁকা, উঁচুনিচু, ঢেউ খেলানো সুন্দর মসৃণ রাস্তা। তার পাশে সবুজ টিলার ওপরে কটেজ, বাংলোবাড়ি। সবশেষে সবচেয়ে উঁচু টিলায় মেয়রের চমৎকার বাসস্থান। গৃহপানে যাওয়ার পথে বারবার মেয়র সাহেব তাঁর গাড়ি থামিয়ে নামলেন এবং প্যাকেট থেকে একটা একটা করে কাগজ বের করে সামনের টিলার ওপরে বাড়ির উঠোনে ছুড়ে দিলেন।

মেয়র নিজেই আমাদের ব্যাখ্যা করে বললেন যে জন নামক ভিয়েতনাম যুদ্ধের এক পঙ্গু সৈনিককে তিনি এইভাবে সাহায্য করছেন। লোকটি পঙ্গু, তার ওপরে সারা বছরই অসুখে ভোগে। তার একমাত্র বৃত্তি হল খবরের কাগজের হকারি করা, কিন্তু জন নিজে থেকে প্রায় অনেক সময়েই কাগজ বিলি করে উঠতে পারে না, মেয়র সাহেব এবং আরও অনেকে প্রয়োজনমত যে যার বাড়ির পথে জনের কাগজটা বিলি করে দেন, কমিশনটা জনই পায়।

বাড়িতে নিয়ে আদর আপ্যায়নের পর মেয়র তাঁর পৌরসভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানালেন।

অধিবেশন সেদিনই সন্ধ্যায়। তিনিই আমাদের নিয়ে গেলেন। দু-একজন কালো, অধিকাংশ সাদা, পুর প্রতিনিধি। অনেকেরই বয়েস ত্রিশের নীচে। নেহাতই মামুলি আলোচনা আলো, জল, রাস্তা নিয়ে। তবে দেখলাম পাড়াটে ঝগড়া এখানেও আছে।

আর একটা কথা মনে আছে। এক মহিলা প্রতিনিধি অভিযোগ করলেন,

বাজারে খেলনা পিস্তল বিক্রি হচ্ছে, উঠতি মাস্তানেরা সেটা কিনে লোককে ভয় দেখিয়ে ছিনতাই করছে, খেলনা পিস্তল বেচা বন্ধ করতে হবে। যে দেশে অস্ত্র-আইন রীতিমত শিথিল, সেখানে খেলনা অস্ত্র কেনাবেচা কি ভাবে বন্ধ করা যাবে জানি না, তবে দেখলাম মেয়র সাহেব ব্যাপারটা নোট করলেন।

নানা কারণে সান্টা বারবারা আমার খুবই ভাল লেগেছিল। তবে সব কথা লেখার নয়। আর আমার যাত্রাও শেষ হয়ে এসেছে, এর পরে সানফ্রানসিকো হয়ে ঘরে ফেরা। সেখানে যাওয়ার আগে সান্টা বারবারার আর দুটো কথা বলে নিই।

সান্টা বারবারায় রয়েছে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া। আমন্ত্রিত বিদেশি অতিথি, নিতান্তই সাহেবি সৌজন্যবশত সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীরা, সঙ্গে এক ভারত প্রত্যাগতা শিক্ষিকাও ছিলেন, আমাকে কবিতা পড়তে বলেছিলেন। আমার নাম তাঁরা কখনও শোনেননি, আমার প্রতিভা সম্বন্ধে কোনও ধারণা থাকাই তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, তদুপরি আমার হাস্যকর ইংরেজিতে আমার অশ্রাব্য পদ্য শুনে সবাই মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। করতালিতে মুখর হয়েছিল শ্রেণীকক্ষ। সবচেয়ে বড় কথা আমার কিছু লাভ হয়েছিল। একজন উৎসাহী উদ্যোক্তা একটা খালি জলের গ্লাস সকলের কছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রণামি তুলেছিলেন, সিকি-আধুলি ইত্যাদি, তা প্রায় কুড়ি-বাইশ ডলার হয়েছিল। আজকের ভারতীয় মুদ্রার হিসেবে সাতশো টাকার মতো হবে। বেতারে, দূরদর্শনে, মঞ্চে, সরকারি কবি সম্মেলনে, আবৃত্তিলোকের আসরে কবিতা পড়েও কখনও এত টাকা পাইনি।

সান্টা বারবারার শেষ কাহিনীটি নিতান্তই দৃষ্টি বিভ্রমের। হোটেলের দোতলায় বারন্দার এক প্রান্তে একটা ঘরে ছিলাম। ঘরটা সিঁড়ির মুখোমুখি। একটু এগিয়ে অন্য একটা ঘরে এক ইঙ্গ ভারতীয় সুন্দরী ছিলেন, সুডৌল, সুঠাম, মোহিনী, এবং সুবেশিনী। সুন্দরীটি যাতায়াতের পথে সিঁড়ির মুখে আমাকে দেখলেই বোধ হয় ভারতীয় বলেই, হালো বলে শুভেচ্ছা জানাতেন।

সুন্দরীকে প্রথমবার দেখেই আমি বুঝতে পারি, এঁকে আমি চিনি, খুব ভালোভাবে চিনি। এঁর হাবভাব চলন বলন সবই আমার চেনা। কিন্তু কিছুতেই খেয়াল করে উঠতে পারছি না, ইনি কে?

আমার সংশয় দূর করলেন অন্য এক ভারতীয়, তিনিও ওই হোটেলে উঠেছেন। সম্ভবত তিনি ওই সুন্দরীর সঙ্গী হিসেবেই এসেছেন। একদিন বারান্দায় ভদ্রলোককে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা বলতে পারেন, ইনি কে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'সেকি, এঁকে চেনেন না?' বলে যে নাম করলেন সেটা তখনকার বোম্বে সিনেমার মহালাস্যময়ী এক নম্বর নর্তকীর। নাম বলামাত্র চিনতে পারলাম, হৃদস্পন্দন দ্রুততর হল, তাই তো।

ভদ্রলোককে মুখে বললাম, 'কিছু মনে করবেন না, আমারই চেনা উচিত ছিল, কিন্তু কোনও দিন তো ওঁকে পোশাক-পরা অবস্থায় পর্দায় দেখিনি, তাই ঠাহর করে উঠতে পারিনি।'

আঠাশ

ফিরে আসার মতো কিছু নেই

'যদি একটা গাধা ভ্রমণে বেরোয়, সে কখনও ঘোড়া হয়ে ফিরবে না।'

—টমাস ফুলার

আমাদের অল্প বয়েসে 'টম ফুল' বলে একটা ইংরেজি জোড়া শব্দ চালু ছিল, অনেক সময় আমারই ওপর প্রয়োগ করা হত। আজকাল আর টম ফুল কথাটা বেশি শুনি না, কথাটার সাদাসিধে মানে হল ডাহা বোকা।

জানি না টম ফুল কথাটি টমাস ফুলারেরই সংক্ষিপ্ত অপভ্রংশ কি না, কিন্তু প্রায় চারশো বছর আগের এই ইংরেজ পণ্ডিতের উল্লিখিত মন্তব্যটি আমার ক্ষেত্রে চমৎকার প্রযোজ্য।

আমি যে গাধা ছিলাম, এত বড় একটি ভ্রমণশেষে আমি সেই গাধাই ফিরে এসেছি। এই হাস্যকর, অবাস্তব ভ্রমণকাহিনী যিনিই অল্পবিস্তর পাঠ করেছেন, সেটা টের পেয়েছেন।

তবে স্বস্তির কথা, এই ভ্রমণকাহিনী এখানেই শেষ। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, ইনিয়ে-বিনিয়ে আরও দশ-বিশ হাজার শব্দ লেখা যেত, কিন্তু এই খেলো লেখা শুধু শুধু বাড়িয়ে লাভ কি!

তার চেয়ে সোজা পথে যাই। সমুদ্রের উপকূল ধরে সাণ্টা বারবারা থেকে সানফ্রানসিসকো। পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যে এক সপ্তাহ আগের সেই একই পথ, শুধু আরেকটু পশ্চিমে, অনেকটা উত্তরে।

আমার সেই ভ্রমণসঙ্গী জিম অস্টিন সাহেব পুরো রাস্তাটা গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এলেন। পথের মধ্যে অবশ্য একবার গুরুতর বিপদে পড়েছিলাম।

ফাঁকা রাস্তায় হাইওয়ে ধরে জিম সাহেব তীব্রগতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। এমনিতেই ওখানকার হাইওয়েতে গতিসীমা যথেষ্টই ঊর্ধ্বে জিম সাহেব সে সীমাও অতিক্রম করেছিলেন। কোথাও কিছু নেই, এর মধ্যে পথের বাঁক থেকে সহসা উদয় হল পুলিশের একটি পেট্রল গাড়ি। জিম সাহেবকে ইঙ্গিত করে গাড়ি থামাল এবং তাঁকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিল। কোনও আলাপ আলোচনা প্রতিবাদের সুযোগ নেই, জিম সাহেব সুড়সুড় করে তার পিছু পিছু হাইওয়ে ছেড়ে একটা ছোট শহরের মধ্যে ঢুকলেন।

সেখানে স্থানীয় আদালতে আমাদের বিচার হল। হাইওয়েতে কোনও গাড়ি গতিসীমা অতিক্রম করলেই হাইওয়ে পুলিশের রাডারে সেটা ধরা পড়ে এবং পুলিশ তখন রাস্তা থেকে গাড়িটাকে ধরে নিয়ে আসে বিচারকের কাছে।

বিচারককে জিম সাহেব বোঝাতে গেলেন যে তাঁর সঙ্গে সম্ভ্রান্ত ভারতীয় অতিথি রয়েছে। তাঁকে নিয়ে যথাসময়ে পৌঁছানোর জন্যেই তাঁকে গাড়ির গতি বাড়াতে হয়েছিল, দীর্ঘ দিনের গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা তাঁর, কখনও

এমন হয়নি। এইসব পুরনো ছেঁদো যুক্তিতে বিচারক মোটেই বিচলিত হলেন না। তাৎক্ষণিক বিচারে জিম সাহেবের জরিমানা হল। তবে টাকাটা তখনই নগদ দিতে হল না। জিম সাহেবের আইডেনটিটি কার্ডের নম্বর ইত্যাদি রেখে দেওয়া হল। তিনি স্বস্থানে ফিরে টাকাটা দিয়ে দেবেন।

পথে এই রকম একটু দেরি হয়ে গেল। দুপুর গড়িয়ে একটু পড়ন্ত বেলায় এই বিখ্যাত নগরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশপথের নাম সেন্ট্রাল ফ্রিওয়ে, এই রাস্তার জন্যে কোনও পথকর নেই, তাই নাম ফ্রিওয়ে অর্থাৎ মুক্ত সড়ক। ফ্রিওয়ের পাশেই স্কাইওয়ে, আকাশপথ। ভূতল থেকে বহু উঁচুতে উঠে গেছে সেই রাস্তা। এতদিন পরে দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ, বিদ্যাসাগর সেতুতে উঠবার রাস্তা দেখে সেই স্কাইওয়ের কথা মনে পড়ল।

মহামান্য রুডইয়ার্ড কিপলিংকে কেউ ভোলেনি। পূর্ব পূর্ববৎ থাকবে। পশ্চিম পশ্চিমেই—এই অবিস্মরণীয় উক্তি তিনি করেছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নিয়ে। মার্কিন প্রতীক নগরী সানফ্রানসিসকো সম্পর্কেও কিপলিং একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন, 'এই শহরের একটাই দোষ, এখানে এলে ফেরা কঠিন হয়ে পড়ে।'

আমার ক্ষেত্রে অবশ্য তা হয়নি। আমার বাঁধা ধরা নিয়তি-নির্দিষ্ট ভ্রমণ। মাত্র আটদিনের মেয়াদ এই মহানগরীতে। অবশ্য ইচ্ছে করলে এই নিয়েই পাতার পর পাতা লিখে যাওয়া যায়। কিন্তু মার্কিন প্রবাসের এই শেষ পর্ব লিখতে বসে আর ভাল লাগছে না, নিজেকে একটু ক্লান্ত লাগছে। নতুনত্বেরও একটা একঘেয়েমি আছে। ঘুরতে ঘুরতে, ঘোরার কথা লিখতে লিখতে শেষ পর্যন্ত আহ্লাদ আর থাকে না, দায়সারা গোছের হয়ে ওঠে।

তার আগেই, সানফ্রানসিসকো কাহিনী একটু সংক্ষিপ্ত করে বলে বিদায় নিচ্ছি।

সানফ্রানসিসকো শহর ওই একই নামের উপসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী সমতল এলাকায় কয়েকটি ছোট বড় টিলার চড়াই উতরাইয়ের মধ্যে ছড়ানো। কোনও কোনও এলাকায় রাস্তা সমতল হলেও অন্যান্য পাহাড়ি শহরগুলোর মতো এ শহরেও রাজপথের ওঠানামা রয়েছে।

ছবির মতো সুন্দর গোল্ডেন গেটের শহর ওই গেটের মাধ্যমে মহাসাগরকে উপসাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। না শীত, না গ্রীষ্ম চির বসন্তের দেশ, কাছে দূরে প্রকৃতির অপার ঐশ্বর্য, সোনার খনি থেকে প্রবীণ মহাদ্রুম।

বলা হয় রূপকথার গল্পের শহর, কিন্তু শহরটি যে খুব পুরনো তাও নয়। আমাদের কলকাতার চেয়েও অর্বাচীন, প্রধানত গড়ে উঠেছিল গত শতকে। কিন্তু তাও প্রায় পুরো নগরটাই বিধ্বস্ত হয়ে যায় উনিশশো ছয় সালের ভূগোল-বিদিত মারাত্মক ভূমিকম্পে। লণ্ডন শহর যেমন গড়ে উঠেছিল আগুনে পুড়ে, নতুন ফ্রানসিসকো গড়ে উঠেছে ভূমিকম্পে ভেঙে।

আমাদের থাকার জায়গা হয়েছিল কাটরাইট হোটেলে। একেবারে শহরের মধ্যখানে পাওয়েল স্ট্রিট আর সাটের স্ট্রিটের মোড়ে। পাওয়েল স্ট্রিট দিয়ে কেব্‌ল কারের রাস্তা, কেব্‌ল কার হল আমাদেরই ট্রামগাড়ির একটা সংস্করণ, বিদ্যুৎচালিত।

নিউ ইয়র্কের পরে ওই শহরেই সবচেয়ে বেশি লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সবচেয়ে বেশি নিমন্ত্রণ খেয়েছিলাম, তবে এর মধ্যে ভারতীয় তেমন ছিল না।

আমাকে প্রথমদিন নিমন্ত্রণ করেছিলেন শ্রীমতী কনস্ট্যান্স কেসি নাম্নী এক সাহিত্যিকা। তিনি সানফ্রানসিসকো রিভিউ অফ বুকসের সমালোচকদের একজন। অ্যালবেরি স্ট্রিটে তাঁরই বাড়ির কাছে একটি ছোট রেস্তোরাঁয় তিনি আমাকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করেন। কিন্তু তিনি কেন যেন জানতেন না যে আমি ইংরেজিতে লিখি না। আমি একথা জানানোর পর আমার ওপরে তাঁর ভক্তি চটে যায় এবং যে সব আহার্য এবং অর্ডার দেবেন বলে আমার সঙ্গে আলোচনাক্রমে স্থির করেছিলেন তার শেষের দিকের পদগুলো খারিজ করে দেন। মাছভাজার পর্বেই ভোজন শেষ হয়, প্রায় খালিপেটে ফিরে আসি। হোটেলে ফেরার পথে রাস্তায় একটা হট ডগ কিনে খাই।

দ্বিতীয় নিমন্ত্রণটি অবশ্য পূর্ণাহারের ছিল না। সে ছিল বৈকালিক চা-জলখাবারের আয়োজন। বিখ্যাত পারনাসাস প্রেসের প্রকাশক, প্রৌঢ় দম্পতি, শ্রী ও শ্রীমতী হারমান শেইন তাঁদের ওকল্যাণ্ডের রিজেণ্ট স্ট্রিটের সুন্দর বাড়িতে আমাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন।

বোধহয় আমার নিউ ইয়র্কের কোনও বন্ধু টেলিফোনযোগে তাঁদের আমার কথা বলেছিলেন, তাই এই আপ্যায়ন। পারনাসাস প্রেস মূলত শিশুসাহিত্য প্রকাশক। প্রকাশিত বইগুলি সুদৃশ্য, সুমুদ্রিত। দেখলাম মহাত্মা গান্ধীর ওপরেও একটা বই আছে, সেটার লেখক অবশ্য অভারতীয়। হারমান সাহেব তাঁদের প্রকাশিত বেশ কয়েকটি বই আমাকে উপহার দিলেন এবং অতীব ভদ্রতা করে আমাকে অনুরোধ করলেন যে আমি যদি কখনও ইংরেজিতে শিশুদের জন্য কিছু লিখি তাঁদের যেন জানাই।

এই প্রসঙ্গে অকপটে স্বীকার করি, লোভে পড়ে কলকাতায় ফিরে এসেই বিরাট একটা রুলটানা খাতা কিনে ইংরেজিতে একটা শিশু উপন্যাসের সূচনা করি। ওই সূচনা পর্যন্তই। যতদূর মনে পড়ে বহু কষ্টে ইংরেজি-ইংরেজি, ইংরেজি-বাংলা, বাংলা-ইংরেজি তিনটে অভিধান এবং গোটা দুয়েক স্কুলপাঠ্য ইংরেজি গ্রামার বই তুলোধোনা করে মোটমাট পাতা দেড়েক লিখেছিলাম। আমার ধারণা ছিল সেই রুলটানা খাতাটা আমেরিকার পুরনো ব্যাগেই রয়েছে কিন্তু এখন দেখছি সেটা এই ব্যাগে নেই। আমার সেই হতদরিদ্র প্রয়াস কোথায় যে হারিয়ে গেছে।

অন্য একদিন সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন সানফ্রানসিসকো নাগরিক-মণ্ডলীর আন্তর্জাতিক আতিথেয়তা পরিমণ্ডলের ডাঃ এবং শ্রীমতী একারম্যান। এমিরিভিলে ক্যাপটেনস ড্রাইভে একারম্যানদের বাড়ি। কিন্তু তিনি বাড়িতে আমাকে খাওয়াননি, আমাকে নিয়ে কিছুক্ষণ বাড়িতে বসে তারপরে একটি মহার্ঘ রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি একটা পার্টি দিয়েছিলেন।

মনে আছে, সেটা ছিল শনিবারের সন্ধ্যা। একে একে একারম্যানদের ছেলেমেয়েরা সেজেগুজে বাবা মাকে উইশ করে আমাকে হ্যালো করে ডেট

করতে চলে গেল। একটি মেয়ের বয়েস তো নিতান্ত এগারো বারো।

একারম্যান সাহেবের প্রশস্ত বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে চা খাচ্ছিলাম। প্লেটে কয়েকটা বিস্কুট জাতীয় দ্রব্য ছিল। একটা কুকুর অদূরে বসে লেজ নাড়ছিল, আমার বিস্কুট খাওয়া দেখে তার জিব দিয়ে লালা পড়ছিল। কুকুর চোখ লাগালে পেট ব্যথা হতে পারে এই ভয়ে কুকুরটাকে এক টুকরো বিস্কুট ছুঁড়ে দিলাম, সে শূন্য থেকেই মুখ দিয়ে লুফে নিয়ে সেটা গলাধঃকরণ করল। আমার এই আচরণে সাহেব খুব ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন, ওকে খাবার দেবেন না, ওর আলাদা খাবার আছে। বুঝতে পারবেন না, বা বোঝাতে পারব না ওই ভয়ে চোখ লাগানোর ব্যাপারটা আমি আর সাহেবকে বলতে গেলাম না।

আরেকটা ঝামেলায় পড়েছিলাম ওই দিন নৈশভোজের শেষে।

নৈশভোজের স্থানটি ছিল চমৎকার। সমুদ্রের কোল ঘেঁষে কলমি বিলের ধারে নাবাল জমিতে কাঠের পাটাতনের ওপরে অভিজাত ভোজনালয়। সম্ভ্রান্ত অতিথি অভ্যাগত অনেক।

ভোজের অবসানে যখন সবাই ব্রান্ডি, কফি এই সব খাচ্ছে, এক বৃদ্ধ মাতাল গুটি গুটি আমার চেয়ারের কাছে এসে হঠাৎ পায়ের কাছে বসে হুঁহুঁ করে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। অনেকে মিলে অনেক তত্ত্বতালাশ করে তাঁর কাছ থেকে জানা গেল, বহুকাল আগে করাচি শহরে চাঁদসুখানি না কি যেন নামের এক সিন্ধি যুবকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল, আমাকে দেখে তাঁর সেই যুবকের কথা মনে পড়ছে। ওঃ! তাঁর সে কি কান্না সেই রাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে।

এর চেয়ে অবশ্য অধিকতর বিপদে আমি এর আগে পড়েছি, সে কথা লিখেওছি আগে। সেই যে এক অপরিচিত ব্যক্তি আমাকে বাজারে জাপটে ধরেছিল, জাপটে ধরে তার সে কি উচ্ছ্বাস, 'কত রোগা ছিলি মোটা হয়ে গেছিস, তোর গায়ের রং এত কালো হয়ে গেছে, তোর মাথায় অত বড় টাক ছিল, সেই টাকটাই বা কোথায় গেল, তুই এত পালটে গেলি, এতটা বদলে গেলি কি করে ভোম্বল?' আমি তো হতভম্ব, ভদ্রলোকের হাত ছাড়াতে ছাড়াতে বললাম, 'আপনি বোধ হয় ভুল করেছেন, আমার নাম ভোম্বল নয়।' আমার এই কথায় ভোম্বলের সেই বন্ধু আঁতকে উঠে বললেন, 'সে কি নামটাও পালটে ফেলেছিস।'

আজকের বৃদ্ধ মদ্যপের হাত থেকে অবশ্য তখনই পরিত্রাণ পেলাম। তিনি ওই পার্টিতেই এসেছিলেন, তাঁর এহেন আবেগ আকুলতার সঙ্গে মনে হল সবাই পরিচিত, অল্প পরেই তাঁর প্রতিবেশী এক দম্পতি তাঁকে পট মানে গাঁজা খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে চলে গেল।

এই রকম আরও দুয়েকটা নিমন্ত্রণ ছাড়া একদিন গিয়েছিলাম বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে। সানফ্রানসিসকো আর বার্কলে হাওড়া-কলকাতার মত এপার-ওপার যমজ শহর। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ও গরিমা জগৎ-জোড়া। বর্ষে বর্ষে দলে দলে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে সোনার টুকরো ছেলেমেয়েরা ওই বিদ্যাপীঠে জ্ঞানার্জন করতে আসে।

বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় ও তার ক্যাম্পাস, অনেক আন্দোলন, অনেক প্রগতিচিন্তার জন্মভূমি। অনেক সময় ছাত্রদের সঙ্গে প্রশাসনের এখানে হাতাহাতি লড়াই হয়েছে। এই শতকের সেই দ্বিতীয় দশকের গোড়ায় মার্কিন ভূখণ্ডে সাম্যবাদী চিন্তার সূত্রপাতও হয়েছিল এখানে।

বার্কলে এবং বিভিন্ন দ্রষ্টব্যস্থল ছাড়া সানফ্রানসিসকোতে আমার নিজের যাওয়ার দরকার ছিল দুটো জায়গায়।

এক নম্বর হল লরেন্স ফারলিঙ্গেত্তির সিটি লাইটস বুক স্টোর। লরেন্স ফারলিঙ্গেত্তি হলেন বিট প্রজন্মের আদি পুরুষদের একজন। জ্যাক কেরুয়াক বাগিনসবার্গের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়। তবে তিনি নিজে তেমন বড় মাপের কোনও লেখক বা কবি নন। তেমন কিছু লেখেনওনি।

কিন্তু বিট আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর বইয়ের দোকান সিটি লাইটসের অবদান অনেকখানি। প্রথম যুগের এবং পরবর্তী কালেরও বিট প্রজন্মের পুস্তক-পুস্তিকা, পত্রিকাদি এখান থেকেই প্রকাশিত হয়।

ফিরে আসার আগের দিন সকালে সিটি লাইটসে গেলাম। সন্ধ্যার দিকে ভবঘুরে বাউণ্ডুলেদের ভিড় হয় ওখানে, একথা শুনে, সকালে যাই। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। সেই ভোরের বেলাতেই ফারলিঙ্গেত্তি নেশায় চুরচুর হয়ে ছিলেন। প্রথমে আমাকে মোটেই পাত্তা দিতে চাননি। কিন্তু কিছু পরে সুদূর কলকাতা থেকে এসেছি শুনে এবং অ্যালেন গিনসবার্গের নাম শুনে তিনি সহসা পার্টির সেই বুড়োর মত আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, বিনা বাক্যব্যয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন, হাতের কাছে বিভিন্ন তাকে যেখানে যা বই পেলেন কম্পিত হস্তাক্ষরে সই করে একের পর এক আমাকে উপহার দিলেন।

আমার দ্বিতীয় গন্তব্য ছিল লাডলো লাইব্রেরি। লাডলো লাইব্রেরি একটি আশ্চর্য জায়গা। সারা পৃথিবীতে সব রকম ভাষায় নেশা বা ড্রাগ নিয়ে বইপত্র, কাগজ, সরকারি আইন, নোটিশ, নিষিদ্ধ গ্রন্থ সব কিছু সংগ্রহ করা হয় এখানে। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি গাঁজার কলকে থেকে আফিমের নল, অর্থাৎ নেশা সম্পর্কিত সব কিছুর সংগ্রহশালা এই লাডলো লাইব্রেরি।

লাডলো লাইব্রেরির পরিচালক হলেন মাইকেল অলড্রিচ। একবার কলকাতায় বেশ কিছুকাল ছিলেন, গিনসবার্গের সূত্রে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করেন।

মাইকেল বা মাইকের সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা বা বন্ধুত্ব হয়েছিল। সরল, হাসিখুশি, দিলখোলা, শিক্ষিত যুবক। সুরসিক, সুপুরুষ এবং হৃদয়বান। ক্যামেরার ট্রিগারে তাঁর আঙুল ছিল অকৃপণ। শত সহস্র ছবি তিনি তুলেছিলেন সেবার আমাদের সকলের। বাড়ির কুকুর-বিড়ালের পর্যন্ত।

মাইকেল এবারেও অসংখ্য ছবি তুলেছিলেন, এবং পরে আমাকে কলকাতায় পাঠিয়েও দিয়েছিলেন।

কলকাতায় যখন মাইকেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি ছিলেন অবিবাহিত। এবার গিয়ে তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁর নাম মিশেল।

মাইকেলের সঙ্গে নামের মিল রয়েছে। মিশেলও হাসিখুশি, সুলক্ষণা।

মাইকেলের বাড়িতে মিশেল একদিন রান্না করে খাওয়াল। সেই ভোজন পর্ব ছিল খুবই আন্তরিক। আমারই অনুরোধে মার্কিন ঘরোয়া রান্না করেছিল মিশেল। ভালো লেগেছিল মনে পড়ছে। মিশেল মিনতির জন্যে একটা মার্কিন কটনের শাড়ি (পাঁচ মিটার ফুলছাপ কাপড়) আর আমার জন্যে একটা গানের রেকর্ড উপহার দিয়েছিল, এবং তাতাইয়ের জন্যে একটা জিনস। সাইজে একটু বড় হয়েছিল, তবে পরে সেটা বহুকাল তাতাই হেসেখেলে পরেছে।

আর নয়, এবার শেষের দিনে যাই। বেলা আড়াইটায় আমার বিমান ছাড়বে। হোটেল থেকে বেরোতে জিম সাহেব অনাবশ্যক দেরি করে ফেললেন। ছুটতে ছুটতে যখন বিমানবন্দরে পৌঁছিলাম তখন সোয়া দুটো বাজে। ধরেই নিয়েছিলাম প্লেন ফেল করব। কিন্তু কোনও ঝামেলাই হল না। অভিবাসন, শুল্ক সব কিছু কয়েক মিনিটে মিটে গেল।

প্লেনে উঠবার পথে ডিউটি ফ্রি শপ। হাতে কয়েক মিনিট সময়, ব্যাগ ভরতি জিনিস কিছু, তার মধ্যে কোনও পারফিউম নেই। বিদেশ থেকে ফিরব একটা পারফিউম থাকবে না, তা হতে পারে না। পকেট হাতড়ে দেখলাম সাকুল্যে চৌদ্দ ডলার অবশিষ্ট রয়েছে। এর মধ্যে বাড়ি ফেরার জন্যে চার ডলার থাকলেই চলবে। দশ ডলারের ভরসায় ডিউটি ফ্রি শপে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু কোনওটারই দাম পনেরো ডলারের কম নয়। দাম শুনে হতাশ হয়ে বেরিয়ে এলাম।

প্লেনে উঠে সিটে সবে বসেছি দেখি ডিউটি ফ্রি শপের বিক্রয় বালিকাটি একটা প্যাকেট নিয়ে প্লেনের মধ্যে চলে এসেছে। আমাকে খুঁজে বার করে সে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি দশ ডলারই দাও।' পারফিউমটা নিয়ে নিলাম। তবে ধরতে পারলাম না, দাম বাড়ানো ছিল, নাকি নেহাতই সৌজন্য।

* * * *

ভ্রমণকাহিনী নামে আমার অন্তত আট-দশটি কবিতা আছে। সময়ে-অসময়ে একটু কল্পনার সুযোগ পেলেই কোথাও না গিয়েই পদ্যের কাঠামোয় আমার যে সব ভ্রমণপ্রতিমা আমি নির্মাণ করেছিলাম, কাঁচা হাতের অসচ্ছল কাজ, বিশেষ কারও নজরে পড়েনি।

সেই সব পদ্যে কখনও আমি মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফিরছি, কখনও হিমালয় বেয়ে উঠছি অলৌকিক ফুলের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, আবার কখনও নিউ ইয়র্কে জাতিপুঞ্জে চাঁদের বিষয়ে বক্তৃতা করছি কিংবা ভ্যাটিকানের প্রাসাদে গিয়ে মহামান্য পোপকে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনার বাগান থেকে পাতাবাহার গাছগুলো কেটে ফেলবেন না।

এক গরিব দেশের এক সামান্য কবি-কেরানির এই রকম সব অবান্তর কল্পনার কিছুটা একদা বাস্তব হয়েছিল। উড়োজাহাজে করে আমি সারা পৃথিবী ঘুরে এসেছিলাম, স্পর্শ করেছিলাম তিন মহাদেশের জলবায়ু মাটি।

একেক সময় কেমন সংশয় হয়, সন্দেহ হয়। এই এতকাল বাদে এই দেড়

দশক পরে প্রায় খেলাচ্ছলে সে সব কথা লিখতে গিয়ে, তারপর লেখার শেষে এখন কেমন খটকা লাগছে, সত্যি কথাই লিখলাম তো, নাকি এও সেই পোপের বাগান, জাতিপুঞ্জে চাঁদের বিষয়।

কিন্তু তা তো নয়। লিখতে গিয়ে দেখলাম, কিছুই ভুলিনি, কাউকেই ভুলিনি। সময়ের ব্যবধানে একটু আবছা হয়ে গেছে স্মৃতি, মনের মধ্যে একটু ঝেড়ে নিলেই আবার পরিষ্কার হচ্ছে। আর একটু আধটু ভুলশুদ্ধে কারই বা কি যায় আসে।

বরং শেষবারের মতো ফিরে যাই সানফ্রানসিসকো বিমান বন্দরে। কোমরবন্ধ এঁটে বিমানের আসনে বসে আছি, এখনই বিমান ছাড়বে। ঘরে ফেরার মুহূর্ত। বিলেত বা আমেরিকার কোনও মধুর স্মৃতি নয়, কোনও মনোরম বেদনা নয়। বাড়ি ফেরার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে আমার মন। মহাসাগরের অপর পারে, জগৎসংসারের অন্য প্রান্তে অভাবী, দরিদ্র পৃথিবীর এক ঘিঞ্জি শহরে ধূলিধূসর, ভগ্নগবাক্ষ আমার আড়াই কোঠার বাসাবাড়ি, সেখানে অপেক্ষা করছে আমার প্রিয়জনেরা।

প্লেন ছেড়ে দিল। আর আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদেই সকলের সঙ্গে দেখা হবে।

কোমরবন্ধ খুলে হাত পা ছড়িয়ে বিমানের আসনে শরীর এলিয়ে দিলাম।

বাড়ি ফেরার মতো কিছু নেই। মনে পড়ে গেল কোথাও না গিয়ে অনেককাল আগে লেখা আমার নিজেরই একটা কবিতা, মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফিরে, যার কিছুটা এই রকম ঃ—

'ফিরে আসার মতো কিছু নেই।
পুরনো পর্দা, ময়লা বিছানা,
দরজার সামনে পাপোশে নীল পদ্মফুল,
ফিরে আসার মতো কিছু নেই।…
কিছুই ফেলা যাবে না, কিছুই ভোলা যাবে না,
কিন্তু ফিরে আসার মতো কিছু নেই।
পুরনো পর্দা, ময়লা বিছানা,
বালিশ তেমন নরম নয়,
বালিশ তেমন শক্ত নয়
ফিরে আসার মতো কিছু নেই।'